বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

ঠাকুরগাঁও

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

ঠাকুরগাঁও

প্রধান সম্পাদক
শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক
আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী
মো. জাহাঙ্গীর হোসেন

সমন্বয়কারী
মো. ওসমান গণি

সংগ্রাহক
মো. তাজুল ইসলাম
দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
ঠাকুরগাঁও

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২০/জুন ২০১৪

বাএ ৫০৯৭

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
দুইশত পঁয়ষট্টি টাকা

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA : THAKURGAON (Present state of Folklore in Thakurgaon District) Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managing Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan. Publication : *Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014 Price : Tk. 265.00 only. US$: 10

ISBN-984-07-5116-6

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান

www.pathagar.com

সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য

www.pathagar.com

ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থপাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যে-সব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

www.pathagar.com

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩. জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখী খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।
   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।

ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল

www.pathagar.com

আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা,

www.pathagar.com

বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Roger D Abrahams জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়। জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. **নামকরণের ইতিহাস :** কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারীপুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড়ো দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরশ, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. **বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ :** আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান

www.pathagar.com

(সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া মানিকগঞ্জ আটপাড়া, নেত্রকোনা) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমরদের মেলা (ঠাকুরগাঁও), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর উপজেলা, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়োলেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁও, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব

www.pathagar.com

(রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ (নড়াইল), বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি.), বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহরমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. **উপাদানের বিন্যাস :** একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. **তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. **ছবি।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. **সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।**

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছেদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও

www.pathagar.com

মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরশ, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।
২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।
৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরশ ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬.

www.pathagar.com

খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে ক্ষীর খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত),
২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছডি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)
ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)
১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোক পেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)
১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)
ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য
১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)
১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা

www.pathagar.com

হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বাংলা একাডেমির পরিচালকবৃন্দ, প্রধান গ্রন্থাগারিক ও ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান, পাণ্ডুলিপি সম্পাদক মো. কামরুল হাসান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান ঠাকুরগাঁও জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে ঠাকুরগাঁও সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩-৭৭

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল
খ. ভৌগোলিক অবস্থান
গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ঘ. জনবসতির পরিচয়
ঙ. নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়
চ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা ও স্থান
জ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তি
ঝ. মুক্তিযুদ্ধ
ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

লোকসাহিত্য (folk literature) ৭৮-১০৭

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা
খ. কিংবদন্তি
গ. ভাট কবিতা
ঘ. লোকছড়া
ঙ. লোককবিতা

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ১০৮-১২৫

লোকশিল্প

১. মৃৎশিল্প
২. প্রতিমাশিল্প
৩. চুনশিল্প
৪. নকশীকাঁথা
৫. শোলাশিল্প
৬. কারুশিল্প
৭. দারুশিল্প

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume & folk ornaments) ১২৬-১২৭

লোকসংগীত (folk song) ও গাথা/গীতিকা (ballad) ১২৮-১৭৩

১. বারোমাইস্যা
২. ধুয়া গান

www.pathagar.com

৩. জারিগান
৪. পল্লিগীতি
৫. বিয়ের গান
৬. সংগৃহীত গান
৭. রাধামনি রায়ের গান
৮. আদিবাসীদের গান
৯. গায়ে হলুদের গান
১০. বিয়েতে যাওয়ার গান
১১. মেয়েলী গীত
১২. মরমি গান
১৩. বাউল সংগীত
১৪. নটুয়া গান
১৫. লোটোর গান
১৬. মখার গান

লোকবাদ্যযন্ত্র (folk Instruments) ১৭৪-১৮০
১. একতাঁরা
২. বেনা

লোকউৎসব (folk festival) ১৮০-১৮৬
১. বৈশাখী উৎসব
২. নবান্ন
৩. ওরস
৪. আশুরা
৫. রথযাত্রা

লোকমেলা (folk fair) ১৮৭-১৯০
১. নেকমরদ মেলা
২. রুহিয়া আজাদ মেলা
৩. রুহিয়া বৈশাখী মেলা
৪. ধর্মপুর চড়ক পূজার মেলা
৫. লাহিড়ী দুর্গা পূজার মেলা

লোকাচার (ritual) ১৯১-১৯২
ব্রত পার্বণ
মুসলমানদের ব্রত, আঠুরা বা অস্টমঙ্গল, ভাদর কাটানি, স্বাদ খাওয়া, হালখাতা, খতনা অনুষ্ঠান, নাক ফুরানি, অলিমা অনুষ্ঠান

লোকখাদ্য (folk food) ১৯৩-১৯৪

লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance) ১৯৫-২২০
দাইঘুরা গান, ধামের গান

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া (folk games) ২২১-২৩৪

১. টোকর-টোক খেলা
২. যই-যই/ গাদল/ দাড়িয়াবান্দা খেলা
৩. ডাণ্ডাগুলি খেলা
৪. বৌ বৌ বা বুড়িতোলা খেলা
৫. গোল্লাছুট খেলা
৬. কুত কুত খেলা
৭. বাঘ-বকরী খেলা
৮. এক্কা দোক্কা খেলা
৯. জলক্রীড়া খেলা
১০. ঢোল ঢোল খেলা
১১. খোঁচা কাঠির খেলা
১২. মার্বেল খেলা
১৩. ফুলোনা খেলা
১৪. কুকুর-শকুনি খেলা
১৫. আগডুম বাগডুম খেলা
১৬. আঙুল ভাজা খেলা
১৭. বৌছি খেলা
১৮. বুড়িতোলা খেলা

লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant) ২৩৫-২৬১

ক. জিন চিকিৎসা
খ. পীর চিকিৎসা
গ. সাপে কাটা চিকিৎসা

ধাঁধা (riddle) ২৬২-২৭১

প্রবাদ-প্রবচন (folk saying & proverb) ২৭২-২৭৬

লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (superstitution) ২৭৭-২৯৩

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ২৯৪-৩০৭

ক. কৃষিতে ব্যবহৃত লোকপ্রযুক্তি
খ. মৎস্য শিকারে লোকপ্রযুক্তি
গ. মৃৎপাত্র নির্মাণে লোকপ্রযুক্তি
ঘ. দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস তৈরিতে লোকপ্রযুক্তি
ঙ. অস্ত্র তৈরিতে লোকপ্রযুক্তি
চ. যানবাহনে লোকপ্রযুক্তি
ছ. বস্ত্র বুননে লোকপ্রযুক্তি
জ. সরিষা ভাঙার গাছ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল

দেশের প্রায় সর্ব উত্তরের জনপদ ঠাকুরগাঁও জেলা। হিমালয়ের হিম শীতল পরশে লালিত এই জেলা দেশের প্রাচীন জনপদগুলোর মধ্যে অন্যতম। ঠাকুরগাঁওয়ের প্রাচীন নাম বা পূর্ব নাম নিশ্চিন্তপুর। এ অঞ্চল ছিল শালবাড়ি পরগনার অন্তর্গত। ১৮৬০ সালে দিনাজপুর জেলার গোড়া পত্তন হলে এ অঞ্চল চাকলা হিসেবে জেলার নামে আসে। কিন্তু কীভাবে ঠাকুরগাঁওয়ের নামকরণ হলো সে সম্পর্কে জনশ্রুতি ছাড়া উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি।

জনশ্রুতি আছে পুরাতন ঠাকুরগাঁও এলাকায় দুই সহদোর ভাই ছিলেন। তাঁরা দুজনই ঠাকুর ছিলেন। তাঁদের সাথে বর্তমান ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার ব্রিটিশ কোম্পানির বড়ো সাহেবের সু-সম্পর্ক ছিল। জলপাইগুড়ি মহকুমার তৎকালীন বড়ো সাহেব তাদের দুই ভাই ঠাকুর পদবির নাম অনুসারে এই জায়গার নাম দেন ঠাকুরগাঁও। সেই ঠাকুরগাঁও নামটি সময়ের আবর্তে স্থায়ী রূপ লাভ করে।

অন্য জনশ্রুতি মতে, গোবিন্দ নারায়ণ ঠাকুর নামে এক প্রভাবশালী ব্যক্তি টাঙ্গন নদীর তীরে বর্তমান গোবিন্দনগরে আস্তানা গড়ে তোলেন। তিনি পুণ্ড্রনগর হতে এসেছিলেন বলে জানা যায়। একাদশ শতাব্দীর শেষ অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের ঘটনা হিসাবে তা অনুমিত। তিনি ধর্ম চর্চার প্রয়োজনে এখানে মঠ, মন্দির, ধর্মশালা নির্মাণ করেন। প্রভাবশালী হওয়ায় ঠাকুর থেকে এক সময় রাজা হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেন। হয়ে যান রাজা গোবিন্দ নারায়ণ বা গোবিন্দ রায়। তার নামের সাথে মিশে ঐ এলাকা হয়ে যায় গোবিন্দনগর। ধর্মচর্চার কারণে তার এই এলাকা পুরোহিত, সন্ন্যাসী ও ঠাকুরদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। গড়ে ওঠে ঠাকুরদের পাড়া বা গাঁ। ঠাকুরদের এই পাড়া বা গাঁ থেকে এই ঠাকুরগাঁও নামকরণ হয়েছে।

আর এক জনশ্রুতি মতে, বর্তমান যেখানে জেলা প্রশাসন অফিস ও আদালত অবস্থিত সেখান থেকে ০৮ (আট) কি.মি. দূরে উত্তরে অবস্থিত আকচা ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নে নারায়ণ চক্রবর্তী ও সতীস চক্রবর্তী নামে দুই ভাই বাস করতেন। সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে দুই ভাই এলাকায় খুবই পরিচিত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাই তাদের বসতবাড়ি এলাকার মানুষের কাছে ঠাকুরবাড়ি হিসেবে পরিচিত ছিল। চক্রবর্তী ভাইদের প্রয়োজনে জলপাইগুড়ির জমিদার সেখানে একটি থানা স্থাপনের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে রাজি করান। ব্রিটিশ সরকার রাজি হলে এখানে একটি থানা স্থাপিত হয়। ঐ ঠাকুরবাড়ি থেকেই থানার নাম ঠাকরগাঁও থানা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। নামকরণ যেভাবেই হোক না কেন, ঠাকুরগাঁও থানার প্রতিষ্ঠা ১৮ শতকের গোড়ায়। বর্তমানে পুরাতন ঠাকুরগাঁও অঞ্চলে এই থানা স্থাপিত হয়। থানার কাছেই ছিল খরস্রোতা নদী, যা শুক নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

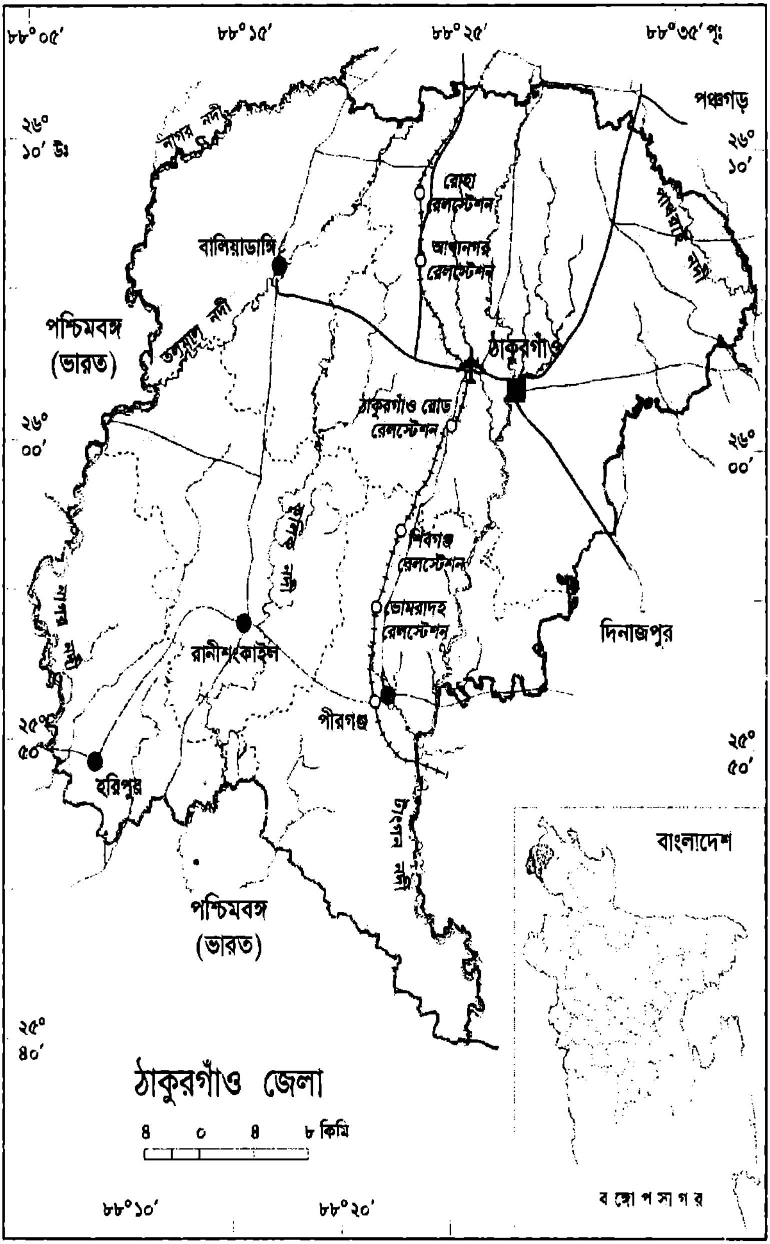

মানচিত্রে ঠাকুরগাঁও জেলা

www.pathagar.com

এক সময় ঐ নদী নাব্যতা হারালে টাঙ্গন নদীর তীরে নিশ্চিন্তপুর মৌজায় ঠাকুরগাঁও থানা স্থানান্তরিত হয়। পরে ঐ থানা মহকুমা ও জেলার নাম ধারণ করে। বর্তমানে মৌজা হিসেবে নিশ্চিন্তপুরের নাম লেখা হয়। এই নামে ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় একটি গ্রাম আছে। এই থানা ১৯৮৩ সালে উপজেলায় রূপ লাভ করে। এখানে ঠাকুরগাঁও পৌরসভা নামে একটি পৌরসভা রয়েছে। এই উপজেলায় বর্তমানে ইউনিয়নের সংখ্যা ১৯টি। যথা— রুহিয়া, আখানগর, আকচা, রাজাগাঁও, বড়গাঁও, দেবীপুর, বালিয়া, আউলিয়াপুর, শুখানপুকুরী, গড়েয়া, জনন্নাথপুর, বেগুনবাড়ী, মোহাম্মদপুর, জামালপুর, চিলারং, রহিমানপুর, রায়পুর, সালন্দর, নারগুণ।

মনুষ্য জীবনের জটিল আঁকাবাঁকা পঙ্কিল পথ এ অঞ্চলের মানুষের অনেকেরই অজানা। নৈসর্গিক সৌন্দর্যমণ্ডিত অপরূপ রূপে সজ্জিত ঠাকুরগাঁওয়ের গ্রামগুলো ছবির মতো। সহজ সরল মানুষগুলো যেন প্রকৃতিরই প্রতিভূ।

ঠাকুরগাঁওবাসীর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। ব্রিটিশ–বিরোধী আন্দোলন, ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে ঠাকুরগাঁওবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও বলিষ্ঠ ভূমিকার গৌরবগাঁথা ইতিহাস এলাকাবাসী আজও গর্বভরে স্মরণ করে। শ্রদ্ধার সাথে মনে করে ঠাকুরগাঁওয়ের সেই সব বরেণ্য ও খ্যাতিমান ব্যক্তিদের নাম যারা ঠাকুরগাঁওয়ের ইতিহাসে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে।

ঠাকুরগাঁওয়ের সাংস্কৃতিক অঙ্গন এক সময় উৎসবমুখর ছিল। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গ্রাম-গঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গ্রামে গ্রামে পালা গান, কবি গান, যাত্রা, ভাওয়াইয়া, বাউল ও ধামের গানের জমজমাট আসর বসত। গ্রাম-গঞ্জে আয়োজিত মেলাগুলোতে সার্কাস, পুতুল নাচ, যাত্রাপালাসহ বিভিন্নরকম জিনিসপত্রের পসরা বসতো। গ্রামীণ লোকাচার, লোকনাট্য ও লোকগীতির বিচিত্র উপাদান চিরায়িত গ্রাম বাংলার বিচিত্র উপাদানে সংস্কৃতির বহুত্ববাদিতা গ্রামের মানুষকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতো। কিন্তু ঠাকুরগাঁওয়ের সাংস্কৃতিক অঙ্গন এখন কিছুটা স্পন্দনহীন হয়ে পড়েছে। তবে দেশের অন্যান্য এলাকার মতো আকাশ সংস্কৃতির অশুভ প্রভাব এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে স্পর্শ করলেও তেমন একটা প্রভাবিত করতে পারেনি। সম্প্রতি এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে এলাকার সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ পুরোনো ঐতিহ্যকে নবায়নের মাধ্যমে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে। নাট্য চর্চায় অগ্রণী শাপলা নাট্য গোষ্ঠী প্রতি বছর স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দমুখর পরিবেশে ১লা বৈশাখ উদ্‌যাপিত করে, গ্রামে-গঞ্জে আয়োজন করা হয় মেলার। ধামের গান, বাউল ও আধ্যাত্মিক গানের আসর বসে গ্রামে গ্রামে।

ঠাকুরগাঁওয়ের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও মানসম্মত পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগতমান উন্নয়নের চেষ্টা চলছে। বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল এলাকাবাসীকে আশান্বিত করলেও তাদের গ্রন্থপাঠে উৎসাহী করা প্রয়োজন।

তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা তেমন একটা হয় না বললেই চলে। শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সংস্কৃতির চর্চার আবশ্যিকতা রয়েছে, ইদানিং শিক্ষক ও অভিভাবকগণ এ ব্যাপারে সচেতন হতে শুরু করেছেন।

শিক্ষাসহ মৌলিক সুবিধা বঞ্চিত এ অঞ্চলের অনেকেই দারিদ্র্য সীমার নিচে গতানুগতিক জীবন যাপন করছে। বিস্তীর্ণ ভূ-সম্পদে সমৃদ্ধ এ এলাকার কৃষকগণ ভূমির

www.pathagar.com

প্রকৃত ব্যবহার সম্পর্কে দীর্ঘকাল অজ্ঞাত ছিল। অধিকাংশ ভূমি অনাবাদী অবস্থায় পতিত পড়ে থাকতো। কৃষি নির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভূমির বিজ্ঞানসম্মত বহুবিধ ব্যবহার তাঁরা জানত না। ষাটের দশকের পর থেকে অত্যন্ত ধীর গতিতে এর কিছুটা পরিবর্তন আসতে থাকে। ভূমির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পঞ্চগড়ের আটোয়ারী, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, ভারতের মালদহ থেকে প্রচুর লোক নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের অন্বেষায় ঠাকুরগাঁওয়ের বিভিন্ন এলাকায় বসতি স্থাপন করে। ধীরে ধীরে ভূমির ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দারিদ্র্যপিড়ীত অনগ্রসর এ অঞ্চলে আজও প্রচুর আবাদযোগ্য ভূমি পতিত পড়ে আছে।

রংপুর বিভাগে অবস্থিত যার আয়তন ১৮০৯.৫২ বর্গ কি.মি.। উত্তরে পঞ্চগড় জেলা, পূর্বে পঞ্চগড় ও দিনাজপুর জেলা, পশ্চিম ও দক্ষিণে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩.৫° সে. এবং সর্বনিম্ন ১০.৫° সে.। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৫৩৬ মি.মি.।

প্রশাসন : ১৮৬০ সালে দিনাজপুর জেলার অধীনে ঠাকুরগাঁও মহকুমা সৃষ্টি হয়। মহকুমাকে ১৯৮৪ সালে জেলায় রূপান্তর করা হয়। পৌরসভা ৩, উপজেলা ৫, ইউনিয়ন ৫১, গ্রাম ৬৪৩, ওয়ার্ড ১৮, মহল্লা ৩২। উপজেলাসমূহ যথাক্রমে—বালিয়াডাঙ্গি, হরিপুর, পীরগঞ্জ, রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও সদর। ঠাকুরগাঁও সদর, পীরগঞ্জ ও রানীশংকৈল এই তিনটি পৌরসভা।

প্রধান নদী : টাংগন, পুনর্ভবা, নাগর, পাথরী, কুলীক, তলমা, ঢেপা।

রানীশংকৈল নামকরণ

অনেক বছর আগের কথা। এই ঠাকুরগাঁও জেলা শহরে তখন জনপদ গড়ে উঠেনি। বহতা টাঙ্গন নদীর দু'পাশ জুড়ে ছিল বিশাল শালবন। সবুজ অরণ্য ঘেরা এই এলাকার নাম ছিল শালবাড়ি পরগণা। অন্যান্য উপজেলায় জনবসতি ছিল আরও কম। নামও ছিল ভিন্ন।

ধরা যাক রানীশংকৈল উপজেলার কথা। উনিশ শতকের খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে এ জনপদটি ছিল মালদুয়ার পরগনার অন্তর্গত। পরে জমিদার বুদ্ধিনাথের ছেলে টংকনাথ ব্রিটিশ সরকারের আস্থা লাভ করতে 'মালদুয়ার স্টেট' গঠন করেন। কথিত আছে, টাকার নোট পুড়িয়ে জনৈক ব্রিটিশ রাজ কর্মচারীকে চা বানিয়ে খাইয়ে টংকনাথ 'চৌধুরী' উপাধি লাভ করেন। এরপর দিনাজপুরের মহারাজা গিরিজানাথ রায়ের বশ্যতা স্বীকার করে 'রাজা' উপাধি পান। তখন থেকে তিনি রাজা টংকনাথ চৌধুরী। রাজা টংকনাথ চৌধুরীর স্ত্রীর নাম জয়রামা শঙ্করী দেবী। 'রানীশঙ্করী দেবী'র নামানুসারে মালদুয়ার স্টেট হয়ে যায় 'রানীশংকৈল'। রাজা টংকনাথ চৌধুরীর মালদুয়ার স্টেটের ভগ্নপ্রায় রাজবাড়িটি এখনও বিদ্যমান।

রানীশংকৈল নামকরণের আরও একটি তথ্য পাওয়া যায়। আঠারোশত খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে মালদুয়ারের নাম ছিল 'রামগঞ্জ'। সে সময় এলাকার জমিদারি ছিল দুই সহোদরার হাতে। নাথপন্থী এই সহোদরাযুগল ছিলেন চিরকুমারী। তাদের পূর্ণ নাম জানা না গেলেও তাঁরা পরিচিত ছিলেন 'বড় রানি' 'ছোট রানি' হিসেবে। রানীশংকৈল

www.pathagar.com

উপজেলা পরিষদের প্রায় ৩ কি.মি. উত্তর-পশ্চিম দিকে এখনো রানি ভগ্নীদ্বয়ের নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম রানীশংকৈল হয়েছে বলেও অনেকে মনে করেন। এই রানিরা ছিলেন প্রজাবৎসল। প্রজাদের পানীয় জলের কষ্ট নিবারণের জন্য ৩৬০টি পুকুর খনন করেন। তাঁরা ছিলেন বেশ ধর্মপরায়ণ। ধর্মানুষ্ঠান ও বিভিন্ন পূজা পার্বনের মতো সহস্র প্রজাকুল আপ্যায়িত হতো প্রতিনিয়ত। কথিত আছে, তাঁরা ধর্ম-কর্ম ও জমিদারি দেখাশোনার জন্য মিথিলা রাজ্য থেকে পুরোহিত আনতেন। শেষাবধি পুরোহিত বুদ্ধিনাথ সপরিবারে থেকে যান রানির আশ্রয়ে। বড়ো রানি আর ছোটো রানি সিদ্ধান্ত নিলেন কাশিধামে যাবার জন্য। কাঁশি যাবার সময় তাঁরা তাম্র পাত্রে (তামার পাত্রে) জমিদারির তাবৎ লিখে দেন পুরোহিত বুদ্ধিনাথের নামে। কথা ছিল তাঁরা ফিরে না এলে জমিদারি পুরোহিতের হয়ে যাবে। তাই হলো। রানিরা আর ফিরলেন না।

পুরোহিত থেকে বুদ্ধিনাথ হলেন জমিদার। রানিদের কথামত জমিদারি দেখাশোনার পাশাপাশি পূজা অর্চনার যাবতীয় কর্ম চলতো নিয়ম মাফিক। শোনা যায়, রানিদের খনন করা এক-একটি পুকুরে এক-একদিন পূজা অর্চনা হতো। এভাবে বছর ঘুরে আসত পুকুর সংলগ্ন বেদিতে পূজা করতে করতে। বুদ্ধিনাথের ছিল তিন ছেলে। রামনাথ, টংকনাথ আর গৌরাঙ্গনাথ। রামনাথের অকাল মৃত্যু হয়। গৌরাঙ্গ ছিল হাবা-গোবা। টংকনাথ ছিল খুব চতুর। বুদ্ধিনাথের মৃত্যু হলে টংকনাথ সমস্ত জমিদারি হাতিয়ে নেন।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারতবর্ষ ব্রিটিশদের শাসন থেকে মুক্ত হলে রাজা টংকনাথ চৌধুরী ১৭ই আগস্ট স্বপরিবারে ভারতে চলে যান। রাজা টংকনাথের বাড়ির অদূরে নির্মিত সুরম্য জয়কালি মন্দির, মন্দিরের সামনে কুলিক নদীতে সান বাধানো ঘাট। পাশেই ছিল বিশাল অট্টালিকা। দাতব্য চিকিৎসালয়, বিশাল বাগানবাড়ি। এগুলো মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ধ্বংস হয়ে যায়। তবে স্মৃতির স্বাক্ষর বহন করতে এখনো বিদ্যমান রামগঞ্জ বি.এন. (বুদ্ধিনাথ) ইনস্টিটিউট। যার বর্তমান নাম রানীশংকৈল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়। তবে এ বিদ্যাপীঠের পাশে নির্মিত ছাত্রাবাসটির লেশ চিহ্নও আর নেই।

মালদুয়ারের আগে এ অঞ্চল ছিল ভাতুরিয়া পরগনার অর্ন্তগত। ১৮৯৩ সালে এখানে থানা প্রতিষ্টিত হয়। এই থানা ১৯৮৩ সালে উপজেলায় রূপ লাভ করে। বর্তমানে এই উপজেলায় ইউনিয়নের সংখ্যা ৮টি। যথা : ধর্মগড়, নেকমরদ, হোসেনগাঁও, লেহেম্বা, বাচোর, কাশিপুর, রাতোর ও নান্দুয়ার।

পীরগঞ্জ নামকরণ

ঠাকুরগাঁও জেলার পাঁচটি উপজেলার মধ্যে পীরগঞ্জ একটি। অতিপ্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চলটি সামাজিকভাবে বেশ সচেতন। রাজনীতি বিষয়ে এই এলাকার মানুষের মাঝে গভীর ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলটি শালবাড়ি/শালগড়া পরগনার অন্তর্গত ছিল। সম্ভবত ১৮৫৯ সালে এখানে একটি থানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

থানার নামকরণ সম্পর্কে জনশ্রুতি ছাড়া অন্য কোনো দালিলিক পত্র পাওয়া যায়নি। এই অঞ্চলটি এক সময় সরকার তাজপুরের অধীনে ছিল। সেটি মুঘল আমলের

www.pathagar.com

কথা। তখন বা আগে পরে এখানে বেশ ক'জন বজুর্গ পীর আউলিয়া দ্বারা ইসলাম প্রচার লাভ করে বলে জানা যায়। তাদের মধ্যে অন্যতম দুর্লভপুর গ্রামের পীর বাহরানা সৈয়দ, সাটিয়া গ্রামের পীর শাহজাহী, ভেলাতৈড় গ্রামের পীর দরবার গামী, পীরগঞ্জ উপজেলা সদরের পীর সিরাজউদ্দিন আউলিয়া, পীরগঞ্জ থানা সংলগ্ন গোগর গ্রামের বনপীর উল্লেখযোগ্য। অনেক পীরের সমাদৃত অঞ্চল বলেই নামকরণ হয়েছে পীরগঞ্জ। যা অনেকে মনে করেন। তবে পীরগঞ্জ নামের জন্য অনেকে পীর সিরাজউদ্দিন আউলিয়ার কথাই বলেন। পীরগঞ্জ সরকারি কলেজের দক্ষিণ পার্শ্বের গোরস্তান সংলগ্ন স্থানে এই বুজুর্গ পীরের মাজার বিদ্যমান। এলাকার মানুষের মধ্যে প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে, এই পীরের আস্তানা সূত্রে এই স্থানটির নাম পীরগঞ্জ হয়েছে। পীরগঞ্জ থানা সংলগ্ন ভেলাতৈড় ভদ্রপাড়া গ্রামের পশ্চিমদিক সংলগ্ন বিশাল গোরস্তান যা আমাদের দেশে লক্ষণীয়। এই থানা ১৯৮৩ সালে উপজেলায় রূপলাভ করে। এখানে পীরগঞ্জ পৌরসভা নামে একটি পৌরসভা রয়েছে। এই উপজেলার বর্তমান ইউনিয়নের সংখ্যা ১০টি। যথা : ভোমরাদহ, কোষারাণীগঞ্জ, খনগাঁও, হাজীপুর, সৈয়দপুর, পীরগঞ্জ, দৌলতপুর, সেনগাঁও, জাবরহাট ও বৈরচুনা।

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, বগুড়া ও পাবনা জেলা এবং ভারতের মালদহ জেলা বরেন্দ্র ও পুরাতন হিমালয় পাদভূমির অন্তর্ভুক্ত। এ অঞ্চলের ভূমিকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন- লালমাটি দ্বারা গঠিত প্রাচীন ভূমি, পলিমাটি দ্বারা গঠিত প্রাচীন ও উঁচু ভূমি, বিভিন্ন নদী বাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত নিম্নভূমি।

লালমাটি দ্বারা গঠিত প্রাচীন ভূমি : এ ধরনের ভূমির গঠন নিয়ে বেশ বিতর্ক থাকলেও অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে প্রায় ১৮ লক্ষ বছর আগে প্লিস্টোসিন (Plistocene) যুগে শুরু হয়ে প্রায় ১০ হাজার বছর আগেকার হলোসিন যুগে ভূ-গাঠনিক আন্দোলনজনিত কারণে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কিছু কিছু অংশ উত্তোলিত হওয়ার ফলে এই ভূমির সৃষ্টি হয়েছে। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি, তানোর, নাচোল, নিয়ামতপুর, পোরশা, সাপাহার, পত্নীতলা, ধামইরহাট, মহাদেবপুর প্রভৃতি থানার সম্পূর্ণ অংশ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, মান্দা, সিংড়া, বাগাতিপাড়া প্রভৃতি থানার অংশ বিশেষে এ ধরনের প্রাচীন ভূমি রয়েছে। এ অঞ্চলের ঘোড়াঘাট হাকিমপুর, নবাবগঞ্জ, বিরামপুর, ফুলবাড়ি, পার্বতীপুর, চিরির বন্দর, দিনাজপুর সদর, বিরল, কাহারোল, বোচাগঞ্জ, পীরগঞ্জ, রানীশংকৈল, হরিপুর, বালিয়াডাঙ্গী প্রভৃতি থানার প্রায় সম্পূর্ণ অংশ এবং বীরগঞ্জ, খানসামা, ঠাকুরগাঁও সদর ও আটোয়ারী থানার অংশে এ ধরনের ভূমির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বাংলাদেশের অন্য সব অঞ্চল থেকে বরেন্দ্র ভূমি অপেক্ষাকৃত উঁচু। বর্ষাকালে এ ধরনের ভূমি পানির নিচে তলিয়ে যায় না। বর্ষাকালে ভূমির চারদিকে উঁচু আল বেঁধে পানি সঞ্চয় করে কৃষকেরা এসব জমিতে রোপা ধানের চাষ করে। এতে খুব ভালো ফলন হয়।

পলিমাটি দ্বারা গঠিত প্রাচীন ও উঁচু ভূমি : প্রাচীন উঁচু ভূমি ছাড়াও বরেন্দ্র অঞ্চলে অর্থাৎ রাজশাহী বিভাগের আরও কিছু উঁচু ভূমির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পলিমাটিতে

www.pathagar.com

গঠিত এসব ভূমি মোটামুটি প্রাচীন। বর্ষাকালে এ ধরনের ভূমি পানির নিচে তলিয়ে যায় না। বরেন্দ্র ভূমির মতো এসব ভূমিতে ধান ছাড়াও বিভিন্ন প্রকারের রবি শস্যের চাষ হয়। এ অঞ্চলে তিস্তা, করতোয়া, আত্রাই, পুনর্ভবা, টাঙ্গন, নাগর, মহানন্দার মতো বড়ো বড়ো নদী এবং এগুলোর অসংখ্য শাখা ও উপশাখা রয়েছে। পলিমাটিতে গঠিত বলে এ ধরনের ভূমিতে পলি (Silt) ও বালির (Sand) সঙ্গে কাদার সংমিশ্রণের তারতম্যের কারণে এ ভূমির মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম রকমভেদ আছে। পলিজ বালি, পলিজ সিল্ট ও কাদা, বিলজাত পলল অবক্ষেপ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে এ ভূমিকে ভাগ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এ ভূমিকে পলিমাটিতে গঠিত উঁচু ভূমি বলা যেতে পারে।

পঞ্চগড় জেলার তেতুলিয়া, পঞ্চগড় সদর, দেবীগঞ্জ, বোদা ও আটোয়ারী থানা সমূহের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ এবং ঠাকুরগাঁও সদর, বালিয়াডাঙ্গী, পীরগঞ্জ, রানীশংকৈল, হরিপুর, বীরগঞ্জ, খানসামা, দিনাজপুর সদর, চিরির বন্দর থানার অংশ বিশেষে এ ভূমির অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

নবগঠিত নিম্ন প্লাবন ভূমি : নবগঠিত নিম্ন প্লাবন ভূমি ঠাকুরগাঁও এলাকায় নেই। শুধুমাত্র দু'ধরনের উঁচু শ্রেণির ভূমি এ অঞ্চলে রয়েছে। যার কারণে ঠাকুরগাঁও জেলায় বন্যা হয় না বললেই চলে। খুব ভারি বর্ষণ হলে স্বল্প সময়ের জন্য অধিকতর নিম্ন এলাকায় সাময়িকভাবে পানি জমে ফসলের কিছুটা ক্ষতি সাধন করে।

দৈনিক পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী বিলুপ্ত দৈনিক পত্রিকা : কথাকলি, সংগ্রামী বাংলা, গ্রামবাংলা, দৈনিক বাংলাদেশ, জনরব। বিলুপ্ত সাহিত্য পত্রিকা : এসো চেয়ে দেখি পৃথিবী, উষসী, চালচিত্র।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান : শিল্পকলা একাডেমী ১, ক্লাব ২৭২, পাবলিক লাইব্রেরি ৩, অফিসার্স ক্লাব ১, টাউন হল ১, সিনেমা হল ১৯, নাট্যদল ১৩, নাট্যমঞ্চ ১, যাত্রাদল ২, সমবায় সমিতি ৪৫৫, মহিলা সংগঠন ১৯৮, খেলার মাঠ ১২৩ ও মিলনায়তন ৪।

এক নজরে ঠাকুরগাঁও জেলা ও জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান :

জেলার আয়তন	: ১৮০৯.৫২ বর্গ কি.মি.।
জেলার জনসংখ্যা	: ১২,৯৫,৯২২ জন
পুরুষ (৫১.০৪%)	: ৬,৬১,৪৩৯ জন
মহিলা (৪৮.৯৬%)	: ৬,৩৪,৪৮৩ জন
ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার হার	: মুসলমান-৭৪.৯৭%, হিন্দু ২৪.০৫% খ্রীস্টান-০.৫৪% অন্যান্য ০.৪৩%।
উপজেলার সংখ্যা ও নাম	: ৫টি : ঠাকুরগাঁও সদর, পীরগঞ্জ, রানীশংকৈল, বালিয়াডাঙ্গী ও হরিপুর।
ইউনিয়নের সংখ্যা ও উপজেলা ভিত্তিক নাম	: ৫১টি : সদর উপজেলা-রুহিয়া, আকানগর, চিলারং, আকচা, রাজাগাঁও, দেবীপুর, বড়োগাঁও, বালিয়া, আউলিয়াপুর, শুখানপুকুরী, সালন্দর, গড়েয়া, জগন্নাথপুর, নারগুন, বেগুনবাড়ী, মোহাম্মদপুর, রহিমানপুর, জামালপুর ও রায়পুর।

www.pathagar.com

		পীরগঞ্জ উপাজেলা—খনগাঁও, ভোমরাদহ, কোষারাণীগঞ্জ, সৈয়দপুর, পীরগঞ্জ, হাজীপুর, দৌলতপুর, সেনগাঁও, জাবরহাট ও বৈরচুনা। রানীশংকৈল উপজেলা—লেহেম্বা, বাচোর, হোসেনগাঁও, নন্দুয়ার, ধর্মগড়, কাশিপুর, নেকমরদ ও রাতোর। বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা- বড়োবাড়ী দুওসুও, ভানোর, বড়ো পলাশবাড়ী, আমজানখোর, পাড়িয়া, চাড়োল ও ধনতলা। হরিপুর উপজেলা- হরিপুর, বকুয়া, আমগাঁও, গেদুড়া, ডাঙ্গীপাড়া ও ভাতুরিয়া।
পৌরসভার সংখ্যা ও নাম	:	৩টি— ঠাকুরগাঁও, পীরগঞ্জ ও রানীশংকৈল।
মৌজার সংখ্যা	:	৬৬৮
গ্রামের সংখ্যা	:	১০১৬
তাপমাত্রা	:	বার্ষিক সর্বোচ্চ গড় ৩৪° সে. ও সর্বনিম্ন গড় ১০.০৫° সে.
গড় বৃষ্টিপাত	:	২৫৩৬ মি.মি.
সমুদ্র সমতল হতে উচ্চতা	:	৫২ মিটার

এক নজরে ঠাকুরগাঁও জেলা ও জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান :

মোট বনভূমি	:	৮১৮.৫৩ হেক্টর
মোট আবাদি জমি	:	১৪২৩৩০ হেক্টর
মসজিদ সংখ্যা	:	২৫২৬
মন্দির	:	১১
গীর্জা	:	২টি (ঠাকুরগাঁও ও পীরগঞ্জ)
ফায়ার সার্ভিস স্টেশন	:	১টি
সুগার মিল	:	৬টি
হিমাগার	:	১৩২টি
হাট বাজার	:	৬৪৪টি
জল মহাল	:	৬টি
রেল স্টেশন	:	৩টি
অটো রাইস মিল	:	৮টি
রাইস মিল (বড়ো)	:	১২৯৪টি
রাইস মিল (সাধারণ)	:	১২টি
খাদ্য সরবরাহ কেন্দ্র	:	৩৮টি ও ধারণ ক্ষমতা-২৮০০০ মে: টন
খাদ্য গুদাম ও ধারণ ক্ষমতা	:	২১টি
বিওপি সংখ্যা	:	৮৫টি
ভারতের সাথে জেলার সীমান্ত	:	৯৪টি

www.pathagar.com

হাস মুগরি খামার	:	০১টি
ক) সরকারি খামার	:	৯৩টি
খ) রেজিস্ট্রিশনপ্রাপ্ত বে-সরকারি খামার	:	৪১টি
ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা	:	০১
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র	:	০১
টেলিভিশন উপকেন্দ্র	:	০১
ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র	:	০১
কৃষি গবেষণা কেন্দ্র	:	০১
১০০ শয্যার হাসপাতাল	:	০১
৩১ শয্যার হাসপাতাল	:	০৪
টিবি ক্লিনিক	:	০১
ডায়াবেটিক হাসপাতাল	:	০১
নার্সিং ইন্সটিটিউট	:	০১
রেডিও বাংলাদেশ আঞ্চলিক কেন্দ্র	:	০১
মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র	:	০১
রেশম কারখানা	:	০১ (বন্ধ)
বিমান বন্দর	:	০১ (অবলুপ্ত)
মৎস্য পোনা উৎপাদন খামার	:	০১
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	:	০১
যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	:	০১
সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ	:	০১
পিটিআই	:	০১ সমাপ্ত-১৯
নুতন ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স	:	নির্মানাধীন-১৩
আধুনিক মাংস প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র	:	০১
জেলখানা ও বন্দী ধারণ ক্ষমতা	:	১টি, পুরুষ-১৬৫ জন, মহিলা-০৩ জন।

দর্শনীয় স্থান

ক) ঠাকুরগাঁও বিমান বন্দর	:	জেলা সদর থেকে ৮ কি.মি. দূরে পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত (বর্তমানে পরিত্যক্ত)।
খ) সুগার মিল	:	জেলা সদর থেকে ৫ কি.মি. পশ্চিমে অবস্থিত।
গ) ফান সিটি শিশু পার্ক	:	পীরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্নে অবস্থিত।
ঘ) রানীশংকৈলজমিদার বাড়ি	:	রানীশংকৈল উপজেলা সদর থেকে ১ কি.মি. দূরে অবস্থিত।
ঙ) হরিপুর জমিদার বাড়ি	:	হরিপুর উপজেলা সদরে অবস্থিত ব্রিটিশ আমলের জমিদার বাড়ি।
চ) রাণী সাগর	:	রানীশংকৈল উপজেলা সদর থেকে ৪ কি.মি. দূরে অবস্থিত। অপর নাম রামরাই দিঘী।
ছ) নাথ মন্দির	:	রানীশংকৈল উপজেলার নেকমরদ ইউনিয়নে

www.pathagar.com

		অবস্থিত।
জ) বলাকা উদ্যান	:	জেলা সদর থেকে ৮ কি.মি. দক্ষিণে মহাসড়কের পাশে অবস্থিত।
ঝ) টাঙ্গন ব্যারেজ	:	জেলা সদর থেকে ১৪ কি.মি. উত্তরে পঞ্চগড়-ঠাকুরগাঁও সীমান্তে অবস্থিত।
ঞ) সাশলা-পিয়ালা দিঘি	:	সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নে অবস্থিত।
ট) খুররম খাঁ দিঘি	:	সদর উপজেলার দেবীপুর ইউনিয়নে অবস্থিত।
ঠ) নেকমরদ	:	এই জেলায় সবচেয়ে পুরোনো নাগরিক সভ্যতার স্মৃতিচিহ্নবাহী এলাকা। এর আশেপাশে কয়েকটি গড় অবস্থিত।
ড) জেলার গ্রোথ সেন্টারসমূহ	:	ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা- রুহিয়া, ভুল্লী, গড়েয়া, শিবগঞ্জ ও খোচাবাড়ী। পীরগঞ্জ উপজেলা-ভোমরাদহ, জাবরহাট, নসীবগঞ্জ হাট ও লোহাগাড়া। রানীশংকৈল উপজেলা- নেকমরদ, কাতিহার ও ধর্মগড়। বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা- লাহিড়ী, হরিণমারী ও বড়ো পলাশবাড়ী। হরিপুর উপজেলা- যাদুরাণী হাট, চৌরঙ্গী ও কাঁঠালডাঙ্গী।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ : কৃষি ৫২.২৯%, কৃষি শ্রমিক ২৫.৪৪%, অকৃষি শ্রমিক ৩.০৬, ব্যবসা ৭.৬৬%, চাকরি ৪.৪৩%, অন্যান্য ৭.১২%। ভূমি ব্যবহার, চাষযোগ্য জমি ১৪১০৩৯.৯০ হেক্টর, পতিত জমি ৩৭৬৯৮.৭৪ হেক্টর। এক ফসলি ৩১%, দো ফসলি ৫৫%, তিন ফসলি ১৪%। সেচের আওতায় আবাদি জমি ৫২%।

ভূমি নিয়ন্ত্রণ : ভূমিহীন ৯%, প্রান্তিক চাষি ১৩%, ক্ষুদ্র চাষি ১৫%, মধ্যম চাষি ৫৮%, বড়ো চাষি ৫%। মাথাপিছু আবাদি জমি ০.১৪ হেক্টর।

কৃষি

কৃষি খাতে জেলার সবচেয়ে বড়ো সাফল্য এসেছে সেচ কাজে। পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং বিএডিসি পরিচালিত টিউবওয়েলগুলো বরেন্দ্র বহুমুখী কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমে সবগুলো টিউবওয়েল চালু করেছে। এতে কৃষি কাজের উপর ভালো প্রভাব পড়েছে। প্রতি টিউবওয়েলের কমান্ড এলাকায় ২০০ ফুট পাকা লাইন নির্মাণের কাজ পর্যায়ক্রমে চলছে। জেলার ৩১,২৮২ হে. জমিতে সেচ প্রদত্ত হচ্ছে এবং এতে ৬৮,৪৯৮ টি কৃষক পরিবার উপকৃত হচ্ছে। এর বাইরেও ব্যক্তিগত উদ্যোগে শ্যালো-টিউবওয়েলের মাধ্যমে কৃষকেরা জমি চাষ করে। ঠাকুরগাঁও জেলার কৃষকেরা প্রথাগত ফসলের বাইরে আলু, ভুট্টা, গম, তরমুজ ও অন্যান্য রবি শস্য আবাদ করে ভালো অর্থ উপার্জন করছে। জেলায় উন্নত জাতের লিচু ও আম উৎপাদিত হয়ে থাকে। সংক্ষেপে ঠাকুরগাঁও জেলার কৃষি সংক্রান্ত তথ্যাবলী নিম্নরূপ :-

www.pathagar.com

মোট জমির পরিমাণ	:	১,৮০,৯৫৪ হেক্টর
মোট আবাদি জমির পরিমাণ	:	১,৪২,৩৩০ হেক্টর
সেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ (শতকরা ৬৯%)	:	৯৯,১১৬ হেক্টর
এক ফসলি জমির পরিমাণ	:	১৬,৩৬০ হেক্টর
দুই ফসলি জমির পরিমাণ	:	৯৬,৫০২ হেক্টর
তিন ফসলি জমির পরিমাণ	:	২,৯৬৮ হেক্টর
স্থায়ী ফল বাগান	:	২,৬৯০ হেক্টর
কৃষি পরিবারের সংখ্যা	:	১,৬২,৩৯৭
চালু ডিপ টিউবওয়েলের সংখ্যা	:	৯৬৩
শ্যালো টিউবওয়েলের সংখ্যা	:	৩০,৯৩৫
খাদ্যশস্যের চাহিদা	:	২,১২,০০০ মে. টন
মোট খাদ্য উৎপাদন	:	৫,১২,০০০ মে. টন

প্রধান প্রধান কৃষি ফসল : ধান, গম, আখ, আলু, ভুট্টা, পটল, বেগুন, ডাল ও শাকসবজি। বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি আউশ ধান, যব, কাউন, অড়হর, কলাই, পাট। প্রধান ফল- আম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, পেপে, তরমুজ। প্রধান রপ্তানি দ্রব্য- ধান, চাল, আম, কাঁঠাল, তরমুজ, চিনি, আলু ও শাকসবজি।

শিল্প ও কলকারখানা : চিনিকল, রেশম কারখানা, টেক্সটাইল মিল, কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল, তেলকল, বরফকল, ময়দাকল, আটাকল, অটো রাইসমিল, চিড়াকল, পিভিসি পাইপ, স-মিল, কারিগরি কারখানা, অটোমোবাইল সার্ভিসিং অ্যান্ড রিপিয়ারিং।

কুটিরশিল্প : তাঁত, বাঁশের কাজ, পাটের কাজ, মাদুর তৈরি, মৃৎশিল্প, কামার, সেলাই কাজ, স্বর্ণকার, খাদ্যজাত শিল্প, চামড়া ও রাবারজাত শিল্প এবং বিড়ি।

হাট-বাজার : মেলা, হাটবাজার ১৭৪টি। উল্লেখযোগ্য হাটবাজার : বালিয়াডাঙ্গি, কালীগঞ্জ ভুল্লীহাট, গড়েয়া, শিবগঞ্জ, রামনাথ, লাহিড়ী, কালমেঘ, নেকমরদ, কাতিহার, রানীশংকৈল কলেজ হাট, নসীবগঞ্জ, পীরগঞ্জ কলেজ হাট ও হরিপুর বাজার।

এনজিও কার্যক্রম : ব্রাক, আশা, আরডিআরএস, কেয়ার, হ্যাডস, গ্রামীণ ব্যাংক, গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশন, মানবকল্যাণ, সিডিএ, বায়ু ঐক্যস, জননী, পল্লী গণসংহতি পরিষদ, উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগাম।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র : জেলা সদর হাসপাতাল ১, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৪, ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ১৩, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৫২, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ১, ডায়াবেটিস হাসপাতাল ১, টিবি কিনিক ১, নার্সিং ইন্সটিটিউট ১, মাতৃসদন ৩১, কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্র ১।

গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রাগৈতিহাসিককালে সমুদ্রগর্ভে ছিল বঙ্গ নামের এই ব-দ্বীপটি। বিপুল জলরাশিতে নিমজ্জিত এই ভূখণ্ডটি কালপ্রবাহে জেগে ওঠে। তবে এর যে এলাকাটি সমুদ্রের

www.pathagar.com

তলদেশ থেকে সবার আগে উঠে আসে সেটি হলো হিমালয়ের পাদদেশ ও তার সংশ্লিষ্ট অঞ্চল। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল বিশেষ করে বৃহত্তর দিনাজপুরের পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা সমুদ্র গর্ভের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে তার অনেক আগে। আর এ জন্যই এই এলাকার মানুষ সভ্যতার পথে হাঁটতে শুরু করেছে অপেক্ষাকৃত আগে থেকেই। তাই প্রাচীন সভ্যতার কোনো নিদর্শন যদি খুঁজে পেতে চাই তাহলে তার সন্ধান করতে হবে প্রাচীন জনপদ ঠাকুরগাঁও ও এর সংলগ্ন এলাকাতেই। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয়েছে ঠাকুরগাঁওয়ের কাছাকাছি নেপালের রাজদরবার থেকে। নিশ্চয়ই নেপালীরা চর্যাপদের পদ রচনা করেন নি, রচনা করেছেন বাংলা ভাষাভাষী মানুষ এবং সেটি অবশ্যই সংলগ্ন এলাকার কোনো মানুষ। কেননা সে সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ছিল না বলে দূরের কোনো কিছু পাওয়া বা সংগ্রহ করা দুষ্কর ছিল। তাই চর্যাপদ যে নেপালেরই কাছাকাছি কোনো বাংলা ভাষাভাষী এলাকার সম্পদ তাতে সন্দেহ থাকার কথা নয়। আবার দেখা যায় যে, ঠাকুরগাঁও ও সংলগ্ন এলাকার মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে চর্যাপদের ভাষার যথেষ্ট মিল রয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। তবে বর্তমান নিবন্ধে সে সুযোগ নেই বলে তা উপস্থিত করা সম্ভব হলো না। চর্যাপদে বর্ণিত সমাজচিত্র থেকে এবং এলাকার বর্ণনা থেকে অনেক কিছুই পাওয়া যায় যার কারণে একে ঠাকুরগাঁও ও আশে-পাশের অঞ্চলের পদকারদের সৃষ্টি বলে ধরে নিতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। এছাড়া গোরক্ষনাথ বলে চর্যাপদের যে পদকর্তা রয়েছেন তাঁর সঙ্গে ঠাকুরগাঁওয়ের সংশ্লিষ্টতা অনেকেই সমর্থন করেছেন। তবুও বলবো তথ্য প্রমাণের স্বল্পতার কারণে চর্যাপদের সঙ্গে ঠাকুরগাঁও ও সংলগ্ন এলাকার সম্পর্কটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধান করা সম্ভব হলে অনেক তথ্য প্রমাণ সংগৃহীত হবে এবং তখনই এ ব্যাপারে যে সংশয় রয়েছে তা দূর হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তবে বলে রাখা ভালো যে, ঠাকুরগাঁও ও সন্নিহিত এলাকাকে চর্যাপদ রচনার এলাকা বলে রাষ্ট্রীয়ভাবেও উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন ঠাকুরগাঁও সম্প্রচার কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে তদানীন্তন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যরূপের প্রথম প্রকাশও ঘটে ঠাকুরগাঁও এবং এর সন্নিহিত অঞ্চলে। এই ভূমিতেই রচিত হয়েছিল চর্যাপদের কয়েকটি পদ"।[১] কাজেই ঠাকুরগাঁও যে সুপ্রাচীন ইতিহাসে সমৃদ্ধ একটি জনপদ তা বলতে কোনো দ্বিধা নেই।

ইতিহাস সমৃদ্ধ এই জনপদটিতে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন সভ্যতার বড়ো মূল্যবান সম্পদ। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম সভ্যতার অসংখ্য প্রাচীন নিদর্শনে পরিপূর্ণ ঠাকুরগাঁওয়ের বিভিন্ন অঞ্চল। এখানে বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে আছে অজস্র প্রত্নসম্পদ। মাটি খুঁড়লেই এখানে এখনো পাওয়া যায় প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ ও বহু মূল্যবান পুরাকীর্তি। কিন্তু পরিকল্পিত সংরক্ষণ, অধ্যয়ণ ও গবেষণা কাজের অভাবে বাংলার প্রাচীনতম জনপদ পুণ্ড্র পূর্বে বরেন্দ্রর কেন্দ্রস্থল ঠাকুরগাঁওয়ের ইতিহাস আজো অনাবিষ্কৃত আছে। আর্য আগমনের পূর্বে বহু আগে থেকেই এই ঠাকুরগাঁও অঞ্চলসহ সমগ্র বৃহত্তর দিনাজপুর জেলায় ছিল সভ্য মানুষের বসবাস। আর এই অনুমান যে

www.pathagar.com

অযৌক্তিক নয় তার প্রমাণ হলো, অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে বা কোটিবর্ষে (বর্তমানে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের গঙ্গারামপুরে) প্রস্তর যুগের বস্ত্র নিদর্শন প্রাপ্তি। এছাড়া অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার অংশ এবং ঠাকুরগাঁওয়ের কাছাকাছি অবস্থিত কোটিবর্ষের সঙ্গে ভূমিগত দিক থেকে এ এলাকার কোনো তফাৎ নেই। সেখানে যদি প্রস্তর যুগের নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে তবে স্বাভাবিকভাবে ঠাকুরগাঁওয়েও এ ধরনের প্রত্নবস্তু পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এখনো ঠাকুরগাঁওয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে পুকুর-দিঘি খননের সময় অসংখ্য প্রাচীন প্রতিমা পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে পাথরের বুদ্ধ প্রতিমা ও বিষ্ণু প্রতিমার সংখ্যাই বেশি। ১৯৮৪ সালে ঠাকুরগাঁও সদর থানার রাজাগাঁও গ্রাম থেকে কিছু প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে ২১টি প্রাচীন মুদ্রা স্থানীয় ট্রেজারিতে জমা করা হয়। মুদ্রাগুলোতে যে লিপি খোদিত আছে তার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব না হলেও অনেকে অনুমান করছেন, মুদ্রাগুলো বৌদ্ধ কিংবা সুলতান আমলের। কিন্তু দুঃখের বিষয় মূল্যবান এই প্রাচীন মুদ্রাগুলো সম্পর্কে পরবর্তীতে আর কিছু জানা যায়নি। উদ্ধার করার চেষ্টা করা হয়নি এর গর্ভে লুকিয়ে থাকা ইতিহাসকে। তাই বলা যেতে পারে যে ছড়িয়ে থাকা ও লুকিয়ে থাকা প্রত্ন সম্পদের উদ্ধার কাজের অভাবে এবং প্রত্নকীর্তির সংরক্ষণ, অধ্যয়ন ও গবেষণা কাজের অভাবে ঠাকুরগাঁওয়ের সাংস্কৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদের সঠিক তথ্য আজো পুরোপুরি উদ্‌ঘাটিত হয়নি। ফলে ঠাকুরগাঁওয়ের ইতিহাস আজো রয়েছে অন্ধকারের গহ্বরে। তবুও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিক্ষিপ্তভাবে ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজ কিছু হয়েছে বলেই ঠাকুরগাঁওয়ের নিকট অতীতের বিক্ষিপ্ত ইতিহাসের কথা শোণা যায় মানুষের মুখে মুখে। তবে তার সবই অসম্পূর্ণ, বিচ্ছিন্ন ও জনশ্রুতি নির্ভর।

আনুমানিক চার হাজার বছর আগে এই উপমহাদেশে আর্যদের আগমন ঘটে। তবে বাংলাদেশে আর্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় মাত্র ২২০০ বছর আগে। আর এটি ঘটেছিল সম্রাট অশোকের মাধ্যমে। সম্রাট অশোকের আগে কোনো আর্য শক্তি বাংলাদেশ অধিকারে সক্ষম হয়নি। কিন্তু যদি অশোককে আর্য বলে না ধরা হয় তবে বাংলার মাটিতে আর্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকে গুপ্ত আমলের। সম্রাট অশোক যে পুণ্ড্ররাজ্য অধিকার করেছিলেন মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ব্রাহ্মিক্ষিলিপিতে খোদিত শিলাখণ্ডলিপি, ছাঁচে ঢালা ও ছাপযুক্ত মুদ্রা (Punch marked and cast coin) এবং এন.বি.পি পাত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়। ঠাকুরগাঁওসহ বৃহত্তর দিনাজপুর জেলায় অশোকের আমলের কোনো প্রত্নকীর্তির চিহ্ন আজো পাওয়া যায়নি। তবে ঠাকুরগাঁও যে তদানীন্তন পুণ্ড্ররাজ্যের অংশ ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অশোকের পরে বেশ কয়েক'শত বছরের ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় না।

গুপ্তদের ইতিহাস সুস্পষ্ট। খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকে পুণ্ড্ররাজ্য তথা বাংলাদেশ গুপ্তদের অধিকারে আসে। সে সময়ে দিনাজপুরের কোটি বর্ষ ছিল পুণ্ড্ররাজ্য তথা বাংলাদেশের একটি বিষয়ের সদর দপ্তর। আর এ বিষয়ের কেন্দ্রস্থল ছিল পঞ্চনগরী। এই পঞ্চনগরীর অবস্থান বর্তমান দিনাজপুর জেলার চরকাই, বিরামপুর, চন্ডিপুর ও গড় পিঙ্গলাই এলাকায় বলে ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন। গুপ্ত আমলের বেশ কিছু তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে বর্তমান দিনাজপুর জেলা থেকে। ফুলবাড়ি থানার

www.pathagar.com

দামোদরপুরে পাঁচটি এবং হিলির বৈগ্রামে একটি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বৈগ্রামের তাম্রলিপিটি বেশ প্রাচীন। এটি সম্রাট কুমার গুপ্তের সময়ের (৪৪৭-৪৮ খ্রি:)। ঐতিহাসিক আ. কা. মো যাকারিয়া দিনাজপুর জেলায় গুপ্ত আমলের প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন সমৃদ্ধ এলাকার নাম উল্লেখ করতে গিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈলথানার নেকমরদের নামও উল্লেখ করেছেন।[২] এ থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, বর্তমান ঠাকুরগাঁও জেলায় গুপ্ত আমলের ইতিহাস ছড়িয়ে আছে।

শুধু তাই নয়, ঠাকুরগাঁওয়ের অনেক স্থানে ছড়িয়ে আছে পীর, দরবেশ ও আউলিয়াসহ বিভিন্ন ধর্মগুরুর পবিত্র স্মৃতি। অতীতে তাঁদের আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাস এখানে বেশ কিছু অঞ্চলের নামের মধ্যে আজো ধ্বনিত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে নেকমরদ, গোরকই ও পীরগঞ্জ অন্যতম।

ঘ. জনবসতির পরিচয়

ইতিহাসের ধারায় ঠাকুরগাঁওয়ের জনপরিচয় তুলে ধরা খুবই কষ্টসাধ্য এবং দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়। তাই এই নিবন্ধে তার সুযোগ খুবই সামান্য। তবুও সংক্ষিপ্তভাবে এ অঞ্চলের মানুষের পরিচয় দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলার জনতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা যেতে পারে। বাংলা ভাষাভাষী যে জনগোষ্ঠী, যাদেরকে সাধারণভাবে বাঙালি বলা হয় এবং যাদের বাস বৃহত্তর বাংলা নামের ভূখণ্ডে তাঁরা মূলত বহু জাতির সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ঐতিহাসিকের অভিমত 'বাঙালি এক সংকর জাতি'।[৩] এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানব সমাজের বিশুদ্ধ নরগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বলতে কিছু নেই। সে কারণেই পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির মধ্যে মিশে আছে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর রক্ত। বাঙালিও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে নানা জনগোষ্ঠীর নানা জনস্রোত এসেছে বারবার। অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, শামীয়, নিগ্রো, আর্য, তাতার, শক, গুন, কুশান, গ্রীক মোঙ্গল, ভোটচীনা প্রভৃতি জনধারা এক মিছিলের মতো এসে মিশেছে এ দেশে। নগণ্য হলেও তুর্কী বিজয়ের পর আরবি মুসলমানদের রক্ত এসে মিলিত হয়েছে বাঙালির রক্তে। পণ্ডিতেরা মনে করেন, বেদে যে নিষাদের বর্ণনা পাওয়া যায় সেই নিষাদরাই ছিল বাংলাদেশের আদিবাসী। এদেরকে আদি অস্ট্রেলিয় বা অস্ট্রিকও বলা হতো। নৃতাত্ত্বিক পরিভাষায় বাঙালির এই পূর্ব পুরুষদের নাম হলো "Dravido-Munda Longheads" বা দ্রাবিড় মুন্ড্রা দীর্ঘমুন্ড্র জনধারা। দ্রাবিড় ভাষী ও মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর প্রভাব বাংলার মানুষের মাঝে খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর প্রভাব বেশি করে আছে বাংলার উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মগ ও চাকমাদের কথা বাদ দিলেও উত্তর ও পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এই গড়ন খাঁটি মঙ্গোলীয়। চ্যাপ্টা নাক, গালের উঁচু হাড়, গোঁফ-দাড়ি অপেক্ষাকৃত কম, গোল বা মাঝারি বৈশিষ্ট্যের। বাঙালির চেহারায় বিশেষ করে উত্তর বাংলায় মঙ্গোল জনগোষ্ঠীর একটি বিশেষ শাখার ছাপ সবচেয়ে বেশি। সেটি হলো 'প্যারোইয়ান'। সংক্ষিপ্ত এই আলোচনার সূত্র ধরেই বলা যায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর রক্তধারা এসে মিশেছে এই দেশে। একের বিশিষ্টতার সাথে অপরের বৈশিষ্ট্য মিলে মিশে সৃষ্টি হয়েছে নতুন গড়ন। বাঙালির চেহারার এই

www.pathagar.com

নতুন গড়ন হলো, মাঝারি গোছের চেহারা, অর্থাৎ মাথার গড়ন লম্বাও নয় গোলও নয়, নাক অতিরিক্ত লম্বা বা একেবারে মাঝামাঝি চ্যাপ্টা, উচ্চতায়ও মাঝারি। এক কথায় সবই মাঝারি ধরনের।

বাঙালির এই মাঝারি ধরনের দৈহিক বৈশিষ্ট্য সামগ্রিকভাবে বাঙালির জনপরিচয় হলেও ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের অধিবাসীদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য এর থেকে কিছুটা ভিন্ন। মঙ্গোলীয় প্রভাবের কারণে দেশের উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য এলাকার মতো ঠাকুরগাঁওয়ের মানুষের আকৃতিগত ভিন্নতা স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। বিশেষ করে কোচ, রাজবংশী, ক্ষত্রিয় ও পলিয়া বলে পরিচিত জেলার আদি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের চেহারা খাঁটি মঙ্গোলীয় ধরনের। সুতরাং ঠাকুরগাঁওয়ের জন পরিচয়ের বিষয়টি তুলে ধরতে গিয়ে বলা যায় যে, এখানকার অধিবাসীরা বাঙালির সাধারণ দৈহিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েও কিছুটা বেশি পরিমাণে মঙ্গোলীয় জনধারার দ্বারা প্রভাবিত। চ্যাপ্টা নাক, গোঁফ-দাড়ি অপেক্ষাকৃত কম, গোল বা মাঝারি মাথা ইত্যাদি মঙ্গোলীয় দৈহিক বৈশিষ্ট্য ঠাকুরগাঁওয়ের জনপরিচয়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো বিষয়। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের যে লোকজনদের মাঝে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর প্রভাব বেশি ঠাকুরগাঁওবাসী তাদের মধ্যে অন্যতম।

মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী প্রভাবিত এই ঠাকুরগাঁওবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ছাড়াও হিন্দু ও বেশ কিছু খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীও রয়েছেন। হিন্দুদের মধ্যে ক্ষত্রিয়, রাজবংশী ও পলিয়া বলে পরিচিত লোকের সংখ্যা বেশি। এছাড়া আদিবাসী হিসেবে পরিচিত সাঁওতাল, ওরাঁও ও মুন্ডা সম্প্রদায়ের কিছু লোক বাস করে এই ঠাকুরগাঁও জেলায়।

জনসংখ্যা : ১১৯৬৪২৯; পুরুষ ৫১.০৪%, মহিলা ৪৮.৯৬%। মুসলমান ৭৪.৯৭%, হিন্দু ২৪.০৫%, খ্রিস্টান ০.৫৪%, বৌদ্ধ ০.০৫%, অন্যান্য ০.৩৯%। মোট জনসংখ্যার ০.৮৭% আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠী।

জেলা শহর : ৯টি ওয়ার্ড ও ২৩টি মহল্লা নিয়ে গঠিত। আয়তন ১০.৭০ বর্গকি.মি.। জনসংখ্যাা ৪০৩৩৬। পুরুষ ৫১.৬২%, মহিলা ৪৮.৩৮%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকি.মি. ৩৭৭০ জন। শিক্ষার হার ৫৮.৫%।

ঙ. নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়

বাংলাদেশের প্রায় সব নদীই হয় সর্পিল (Meandering) অথবা বিনুনী (Braided) ধরনের যা ছোটো, বড়ো, সাধারণ বা সহসা প্রবাহী, উপকূলীয় বা সমতলীয় সব নদীতেই দেখতে পাওয়া যায়। তবে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোর ধরনের মধ্যে সর্পিল ধরনটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চলের নদীগুলো সর্পিল ধরন লক্ষণীয়। তবে প্লাইস্টোসিন যুগের সোপান এলাকায় অবস্থিত নদীর ধারা পার্শ্বক্ষয়ের মাধ্যমে ধাপে ধাপে ক্রমশঃ নদীর তলদেশে নেমে গিয়ে সোপান ভূমির রূপ লাভ করেছে। সর্পিল নদীর এরূপ সর্পিল কর্তিত নদী খাত বা Incised meander বলে। সর্পিল নদীর বক্রতার আকৃতির উপর ভিত্তি করে আমাদের

www.pathagar.com

নদীগুলোকে ছয়টি ধরনে অন্তর্ভূক্ত করা যায়। ধরনগুলো হলো : নাগর ধরন, করতোয়া ধরন, ইছামতি ধরন, গড়াই ধরন, কপোতাক্ষ ধরন, জলঙ্গী ধরন, ঠাকুরগাঁওয়ের নদ-নদীগুলো নাগর ধরনের। টাঙ্গন, কুলিক ও নাগর নদী বিধৌত এ জনপদের নদীসমূহ সাধারণত উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহমান। সম্পূর্ণ বছরে না হলেও বর্ষাকালে নদীগুলো যৌবন ফিরে পায়। প্রবল বন্যা সচরাচর দেখা যায় না। তবে অঞ্চল বিশেষে অতি বর্ষায় বন্যা হয়। পীরগঞ্জ, হরিপুর ও সদর উপজেলায় নিম্ন জলাশয় রয়েছে। তবে শুষ্ক মৌসুমে এগুলো সম্পূর্ণ শুকনো থাকে। পলি জমে নদীর গতিপথসমূহ ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এ এলাকায় নদ-নদী ছাড়াও অনেক খাল বিল রয়েছে। বর্ষা মৌসুমে খাল বিলে যথেষ্ট পানি থাকে। তবে শুষ্ক মৌসুমে অধিকাংশ খালই শুকিয়ে যায়। শুধুমাত্র বড়ো বিলগুলোর কিছু অংশ জুড়ে পানি জমে থাকে।

টাঙ্গন নদী

টাঙ্গন নদী ভারত বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলার নিম্ন জলাভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ দিকে দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এরপর নদীটি ভারতের বালুরঘাটে প্রবেশ করে পুনরায় বাংলাদেশের প্রবেশ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জের পুনর্ভবা নদীতে মিলিত হয়েছে। অবশেষে রোহনপুরের নিকট মহানন্দা নদীতে এই মিলিত স্রোতধারা মিশে গেছে। ঠাকুরগাঁও সদর এই নদীর বাম তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। টাঙ্গন ও অন্যান্য বড়ো নদী হতে শুক, সেনুয়া, মরা পাথরাজ ও ছারালবন নামে শাখা নদী ও উপনদীর উৎপত্তি হয়েছে।

নাগর নদী

নাগর নদী ভারত হতে উৎপন্ন হয়ে পঞ্চগড় জেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলা থেকে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় প্রবেশ করে ঠাকুরগাঁওয়ের পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে হরিপুর উপজেলা হয়ে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করেছে। তীরনই নদী এবং নোনাখাল, যমুনা খাল ও জালুই খাল নামে কিছু উল্লেখযোগ্য খাল এই নদীতে মিশেছে। এদের মিলিত স্রোতধারা জেলার পশ্চিমাংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়।

কুলিক নদী

কুলিক নদী হচ্ছে নাগর নদীর উপনদী। এ নদীর স্রোতধারা বালিয়াডাঙ্গী, রানীশংকৈলও হরিপুর উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।

তীরনই নদী

নাগর নদীর আরেকটি শাখানদী হচ্ছে তীরনই নদী। নদীটি বালিয়াডাঙ্গীর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এ নদীর উৎস হতে ৪২ কি.মি. দূরে গিয়ে নাগর নদীর সাথে মিলিত হয়ে প্রবাহিত হয়।

অন্যান্য নদীসমূহ

পাথরাজ, ভুল্লী, দীপা, জুলেই এবং চুরামাটি ইত্যাদি ছোটো নদী রয়েছে। যদিও স্থানীয়ভাবে এদের গুরুত্ব কম নয়।

www.pathagar.com

চ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গড় হার ২৭.৩%, পুরুষ ৩৬.৮০%, মহিলা ১৭.২%। কলেজ ২৭, উচ্চ বিদ্যালয় ২৪১, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪৩, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৯৫, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩৪৫, মাদ্রাসা ৭৪, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ১, ভকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ১, ভকেশনাল টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট ১, ইক্ষু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১, মটর ড্রাইভিং ইন্সটিটিউট ১, কমিউনিটি স্কুল ১২, স্যাটেলাইট স্কুল ২, কিন্ডারগার্টেন স্কুল ২। সুখ্যাত প্রতিষ্ঠান : ঠাকুরগাঁও জেলা স্কুল (১৯০৪), মাদারগঞ্জ এম.বি হাই স্কুল (১৯৪৫), লাহিড়ী হাট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩২) রুহিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩৯), পীরগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯০৭), রানীশংকৈল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৩), নেকমরদ উচ্চ বিদ্যালয় (১৯০২), চরতা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯২৮), কালমেঘ আর আলী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ (১৯৪০)।

ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা ও স্থান

কালের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন মানুষের সংস্কৃতির নিদর্শন হলো পুরাকীর্তি। বিভিন্ন জনপদে বিস্তৃত মানুষ স্বাভাবিক নিয়মে কিছু স্মৃতিচিহ্ন রেখে যায়। এই মানুষগুলোর স্মৃতিচিহ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কালের স্মৃতিচিহ্নগুলো বিশেষ সময়ে বিশেষ ভূখণ্ডে বসবাসকারী মানুষের চিন্তা চেতনাকে উন্মোচিত করে। তাদের প্রযুক্তি, কর্মপদ্ধতি, বাসস্থানের ধরন, ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর উপকরণ ইত্যাদিকে জানার সুযোগ করে দেয়। বোঝা যায় তাদের জীবনের গতি প্রকৃতি। যুগে যুগে বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন ধরনের শাসন আমলে মানুষ যে পরিবেশে বসবাস করতো কালের প্রবাহে তা বিবর্তন ঘটে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অনেক স্থানের ব্যাপক পরিবর্তন হয়। অন্যদিকে রাজনৈতিক উত্থান পতনের কারণেও গড়ে উঠে নতুন জনপদ কিংবা বিলুপ্ত হয় লোকালয়। এসবের পরিচয় বহন করে প্রত্ননিদর্শনগুলো। বর্তমানের মানুষকে প্রত্ননিদর্শনগুলো নিয়ে যায় ইতিহাসের কাছে। এ জন্য প্রত্ননিদর্শন হলো ইতিহাস ঐতিহ্যের শিকড়।

বরেন্দ্র অঞ্চলের উত্তরে অবস্থিত ঠাকুরগাঁও জেলা। পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র উপকূল কিংবা মরুপ্রান্তর কোনোটাই এখানে নেই। এই জেলার বুক জুড়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। সমতল ভূমির উপর দিয়ে একসময় প্রবাহিত ছিল বেশকিছু নদী, যার বেশির ভাগ আজ বিলুপ্ত অথবা ক্ষীণকায়। বিল, জলাশয়, সবুজ মোহনীয় বন-জঙ্গল ছিল। এর মাঝেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছে মানুষের বসতি। ঠাকুরগাঁও জেলার সমতল ভূমি, নদী আর প্রকৃতি জনপদে সৃষ্টি এবং সমৃদ্ধির সমান উপযোগী। তাই এই জেলায় পাওয়া যায় যুগে যুগে গড়ে উঠা মানুষের বসতির বিচিত্র ইতিহাস, আর প্রাচীন কীর্তি। প্রত্ননিদর্শনগুলো আজও ঠাকুরগাঁও জেলার গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে।

বাংলাদেশের মাটি নমনীয়, পাথরের প্রাচুর্যতা এখানে কখনই ছিল না। নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হতো পোড়া মাটির তৈরি ইট দিয়ে। ঠাকুরগাঁও জেলার প্রাচীন স্থাপত্যশৈলীও এর ব্যতিক্রম নয়। পোড়ামাটির ইটের তৈরি স্থাপত্য পাথরের মতো কালজয়ী হতে পারেনি। তাই জেলার অতি প্রাচীন কীর্তিগুলো আজ ধুলায় মিশে গেছে।

www.pathagar.com

শুধু ইটের টুকরো, দূরদেশ থেকে নিয়ে আসা কিছু পাথর, বসতির ঢিবি, পোড়ামাটির কোনো ফলক সুদূর অতীতের ইঙ্গিত দিয়ে যায়। ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপত্য রাজভিটা, মহালবাড়ি মসজিদ, বাংলাগড়, গড় ভাতুরিয়া, গড়খাঁড়ি, গড়গ্রাম দুর্গ, গোরক্ষনাথ মন্দির, মালদুয়ার দুর্গ, কোরমখাঁন গড়, নেকমরদের ইতিহাস ঠাকুরগাঁও জনপদের অতিক্রান্ত কালের উজ্জ্বল স্মরণিকা।

রাজভিটা

পীরগঞ্জ উপজেলার জাবরহাট ইউনিয়নের হাটপাড়া নামক স্থানে টাঙ্গন নদীর বাঁকে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে যে রাজবাড়ির অস্তিত্ব অনুভব করা যায় তা রাজভিটা নামে বর্তমান মানুষের নিকট পরিচিত। এর সঠিক ইতিহাস পাওয়া কঠিন। তবে অনুমান করা হয় এটি শেরশাহের সময়ে নির্মিত হয়েছিল। এখানে শেরশাহ্ আমলের মুদ্রা পাওয়া যায়। একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে যার বর্ণগুলো অপরিচিত এবং শিলালিপিতে একটি উট, একটি ঘোড়া ও একটি শুকরের প্রতিকৃতি আছে। সাংবাদিক কাজী নুরল ইসলাম তাঁর 'পীরগঞ্জের ঐতিহাসিক রাজভিটা' নিবন্ধে এ সমস্ত তথ্য প্রদান করে বলেছেন-'এগুলোর সূত্র বিশ্লেষণ করা হলে ঐ স্থানে কোন আমলে কোন রাজার রাজভিটা ছিল এর সঠিক তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হবে'। রাজভিটায় দাঁড়িয়ে থাকা রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ নেই সবই মাটির গর্ভে। মাটি খুড়লেই ইট পাথর বের হয়ে আসে। বিভিন্ন ভবনের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। আবার নদীর ভাঙনেও নানা আকৃতির প্রচুর ইট ও পাথর বেরিয়ে আসে। নদীর উপত্যকায় পড়ে আছে বহু পাথর ও প্রাচীন ইট। রাজ পরিবারবর্গ টাঙ্গন নদীকেই পৌপথ হিসেবে ব্যবহার করতো যা সহজে বোঝা যায়। রাজভিটা প্রায় ৫০০ মিটার দীর্ঘ এবং ২৫০ মিটার প্রস্থ। রাজভিটা থেকে তিন কিলোমিটার দক্ষিণে শেরশাহ আমলের পূর্ণিয়া সড়কের নিদর্শন আছে।

রাজা টংকনাথের রাজবাড়ি

রানীশংকৈল উপজেলার পূর্বপ্রান্তে কুলিক নদীর তীরে মালদুয়ার জমিদার রাজা টংকনাথের রাজবাড়ি। টংকনাথের পিতার নাম বুদ্ধিনাথ চৌধুরী। তিনি ছিলেন মৈথিলি ব্রাহ্মণ এবং কাতিহারের ঘোষ বা গোয়ালা বংশীয় জমিদারের শ্যামরাই মন্দিরের সেবায়েত। নিঃসন্তান বৃদ্ধ গোয়ালা জমিদার কাশীবাসে যাওয়ার সময় সমস্ত জমিদারি সেবায়েতের তত্ত্বাবধানে রেখে যান এবং তাম্রপাতে দলিল করে যান যে তিনি কাশী থেকে ফিরে না এলে শ্রামরাই মন্দিরের সেবায়েত এই জমিদারির মালিক হবেন। পরে বৃদ্ধ জমিদার ফিরে না আসার কারণে বুদ্ধিনাথ চৌধুরী জমিদারি পেয়ে যান। তবে অনেকে মনে করেন এই ঘটনা বুদ্ধিনাথের দু এক পুরুষ পূর্বেও হতে পারে।

রাজবাড়ি নির্মাণের কাজ বুদ্ধিনাথ চৌধুরী শুরু করেন ও সমাপ্ত করেন রাজা টংকনাথ। ব্রিটিশ সরকারের কাছে টংকনাথ রাজা পদবি পান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজবাড়িটি নির্মিত হয়। বর্তমানে রাজবাড়িটির অনেক অংশই নষ্ট হয়ে গেছে। রাজবাড়ির পশ্চিমদিকে সিংহদরজা। দরজার চূড়ায় দিক নির্দেশক হিসেবে লৌহদণ্ডে S.N.E.W চিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে। রাজবাড়ি সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব কোণে কাছারিবাড়ি। পূর্বদিকে দুটি পুকুর। রাজবাড়ি থেকে প্রায় দু'শ মিটার দক্ষিণে কুলিক নদীর তীরে রাস্তার পূর্বপ্রান্তে রামচন্দ্র (জয়কালী) মন্দির। এই মন্দিরটি রাজবাড়ির

www.pathagar.com

চেয়ে প্রাচীন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক সেনারা মন্দিরটির ক্ষতি সাধন করে। এখন এটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

রাজা টংকনাথ চৌধুরীর রাজবাড়ি

হরিপুর রাজবাড়ি

হরিপুর উপজেলার কেন্দ্রস্থলে হরিপুর রাজবাড়ি। এই রাজবাড়ি ঘনশ্যাম কুণ্ডুর বংশধরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। মুসলিম শাসন আমলে আনুমানিক ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে ঘনশ্যাম কুণ্ডু নামক একজন ব্যবসায়ী এণ্ডি কাপড়ের ব্যবসা করতে হরিপুরে আসেন। তখন মেহেরুন্নেসা নামে এক বিধবা মুসলিম মহিলা এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। তাঁর বাড়ি মেদিনীসাগর গ্রামে। জমিদারির খাজনা দিতে হতো তাজপুর পরগনার ফৌজদারের নিকট। খাজনা অনাদায়ের কারণে মেহেরুন্নেসার জমিদারির কিছু অংশ নিলাম হয়ে গেলে ঘনশ্যাম কুণ্ডু কিনে নেন।

ঘনশ্যামের পরবর্তী বংশধরদের একজন রাঘবেন্দ্র রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশ আমলে হরিপুর রাজবাড়ির কাজ শুরু করেন। কিন্তু তাঁর সময়ে রাজবাড়ির কাজ শেষ হয়নি। রাঘবেন্দ্র রায়ের পুত্র জগেন্দ্র নারায়ণ রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে রাজবাড়ির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। এ সময় তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক রাজর্ষি উপাধিতে ভূষিত হন। জগেন্দ্র নারায়ণ রায়ের সমাপ্তকৃত রাজবাড়ির দ্বিতল ভবনে লতাপাতার নকশা এবং পূর্ব দেয়ালের শীর্ষে রাজর্ষি জগেন্দ্র নারায়ণের চৌদ্দটি আবক্ষ প্রতিমা আছে। তাছাড়া ভবনটির পূর্বপাশে একটি শিব মন্দির এবং মন্দিরের সামনে নাট মন্দির রয়েছে। রাজবাড়িতে ছিল একটি বড়ো

www.pathagar.com

পাঠাগার যার অস্তিত্ব এখন নেই। রাজবাড়িটির যে সিংহদরজা ছিল তাও নিশ্চিহ্ন হয়েছে। ১৯০০ সালের দিকে ঘনশ্যামের বংশধরেরা বিভক্ত হলে হরিপুর রাজবাড়িও দু'টি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। রাঘবেন্দ্র-জগেন্দ্র নারায়ণ রায় কর্তৃক নির্মিত রাজবাড়িটি বড়ো তরফের রাজবাড়ি নামে পরিচিত। এই রাজবাড়ির পশ্চিমদিকে নগেন্দ্র বিহারী রায় চৌধুরী ও গিরিজা বল্লভ রায় চৌধুরী ১৯০৩ সালে আরেকটি রাজবাড়ি নির্মাণ করেন যার নাম ছোটো তরফ।

জগদল রাজবাড়ি

রানীশংকৈল উপজেলার নেকমরদ থেকে প্রায় আট কিলোমিটার পশ্চিমে জগদল নামক স্থানে নাগর ও তীরনই নদীর মিলনস্থলে ছোটো একটি রাজবাড়ি রয়েছে। রাজবাড়িটির সম্ভাব্য নির্মাণকাল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। বর্তমানে রাজবাড়িটি প্রায় ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। রাজবাড়ি থেকে প্রায় একশত মিটার পশ্চিমে নাগর নদীর পাড়ে মন্দির ছিল যার আজ সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই নেই। জগদলের রাজকুমার ছিলেন শ্রী বীরেন্দ্র কুমার। তাঁর সঙ্গে বাকীপুরের জমিদার রায় পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহের পুত্র শ্রী নলিনী রঞ্জনের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতি আশালতা দেবীর বিয়ে হয়। শ্রী বীরেন্দ্র কুমার সুশিক্ষিত ছিলেন। বইয়ের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল অনুরাগ। এ কারণে তিনি গড়ে তুলেছিলেন সমৃদ্ধ পাঠাগার। তৎকালীন সুরেন্দ্রনাথ কলেজ বর্তমান দিনাজপুর সরকারি কলেজে ১৯৪৮ সালে তাঁর পাঠাগারের বইগুলো দান করেন, যার মূল্যমান ধরা হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা।

প্রাচীন রাজধানীর চিহ্ন নেকমরদ

রানীশংকৈল উপজেলার ভবানন্দপুর আজকের নেকমরদে ছিল খরস্রোতা কাইচা নদী। নদীর তীরে গড়ে ওঠে জনপদ। এই জনপদের সভ্যতা কতখানি প্রাচীন তা নির্ণয় করা দুষ্কর। খরস্রোতা কাইচা নদীও আজ বিলুপ্ত প্রায়। নেকমরদ ও তার নিকটবর্তী এলাকাগুলোতে মাটির নিচে পাওয়া যায় প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন। দুর্গ, দিঘি, মন্দির-মণ্ডপ, পাথর-ব্রোঞ্জের প্রতিমাসহ অসংখ্য ছোটো বড়ো পাথরের নিদর্শন প্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদের স্মৃতিই বহন করছে।

ড. দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর বৃহৎ বঙ্গ গ্রন্থে করবর্তন রাজী বা কর্মবাটন নামক প্রাচীন উত্তরবঙ্গের একটি স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। অনেকের ধারণা করবর্তন রাজী বা করবর্তন রাজ্যের রাজধানী ছিল নেকমরদেই। নেকমরদের মাজারকে কেন্দ্র করে প্রায় কুড়ি বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এবং মাজারের দেড় কিলোমিটার উত্তরে গড় গ্রামের প্রাচীন দুর্গ রাজধানীর ধারণাটিকে সমর্থন করে। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙালির ইতিহাস (আদি পর্ব) গ্রন্থেও করবর্তন বা করপর্তন বা করমবর্তন নামক একটি জায়গার কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে প্রতিদিন সকাল বেলা ১৫০০ টাঙ্গন (টাট্টু) ঘোড়া বিক্রয় হতো। তিনি বলেছেন কেউ কেউ মনে করেন এটি দিনাজপুর জেলার অর্থাৎ বর্তমানে ঠাকুরগাঁও জেলার নেকমরদ হাট। এখান থেকেই লক্ষ্ণণাবতীর ঘোড়া কেনা হতো।

www.pathagar.com

প্রত্ন উপকরণ হিসেবে ১৯৬৭ সালে নেকমরদ আলিমউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণকালে দশটি প্রাচীন ব্রোঞ্জ প্রতিমা পাওয়া যায়। এগুলো পাল বা সেন যুগের হতে পারে। সম্ভবত মোহাম্মদ বখতিয়ারের লখ্‌নৌতি বঙ্গ বিজয়ের সময় নেকমরদ এলাকাটি মুসলমানদের অধিকারে আসে। তখন হিন্দুরা এই এলাকা ছেড়ে যাওয়ারকালে পাথর ও ব্রোঞ্জের প্রতিমাগুলো মাটির নিচে ও পুকুরে ফেলে রাখে। পুকুরটির ঘাটে দুটি বেলে পাথর রয়েছে। সেখানে তার একটিতে নৃত্যরতা রমণীপ্রতিমা উৎকীর্ণ পাথরের নির্মিত বৃষের ভাঙা প্রতিমার অংশও দেখা যায়। কোনো এক সময় পুকুরটি সংস্কার করতে গিয়ে প্রস্তরের তৈরি অনেকগুলো প্রতিমা পাওয়া গিয়েছিল। পুকুরটির পূর্ব পাড়ে ৮′×৩′×৫′ আয়তনের একটি গ্রানাইট পাথর পড়ে আছে। এ ধরনের বহু গ্রানাইট পাথর নেকমরদের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে রয়েছে। পাল-সেন যুগে কালো পাথরের ব্যবহার বেশি হতো এবং গুপ্ত যুগে গ্রানাইট ও বেলে পাথরের প্রচলন বেশি ছিল। তাই ধারণা করা হয় গুপ্ত যুগেই নেকমরদে সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে উঠেছিল।

পীর শাহ নেকমরদের মাজার

রানীশংকৈল উপজেলা থেকে প্রায় নয় কিলোমিটার উত্তরে নেকমরদ এলাকাটি। এলাকাটির মূল নাম হচ্ছে ভবানন্দপুর। আজও নেকমরদকে মৌজা হিসেবে ভবানন্দপুর লেখা হয়। শেখ নাসির-উদ-দীন নামক এক পুণ্যবান ব্যক্তি ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভবানন্দপুর আসেন। তিনিই পীর শাহ নেকমরদ নামে খ্যাতিমান এবং এই খ্যাতিমান পুণ্যাত্মা পুরুষের কারণেই ভবানন্দপুর পরবর্তীকালে নেকমরদ নামে পরিচিতি লাভ করে।

নেকমরদ বাজারের পূর্বদিকে পীর শেখ নাসির-উদ-দীন নেকমরদের মাজার। তাঁর সম্পর্কে জনশ্রুতি ছাড়া সঠিক ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে অনুমান করা হয় সুলতানি আমলে তাঁর আগমন ঘটে। পীর শাহ নেকমরদ সম্পর্কে আছে বিভিন্ন ধরনের চমকপ্রদ কিংবদন্তি। নেকমরদ এলাকাটি প্রত্ন উপকরণে সমৃদ্ধ। পীর শাহ নেকমরদের মাজার প্রত্ন উপকরণের মাঝে প্রতিষ্ঠিত বলে কিংবদন্তির কাহিনি আরো জোরালো যেমন হিন্দু রাজত্বের শেষ যুগে ভীমরাজ ও পীতরাজ নামে দুভাই এই অঞ্চলের শাসক ছিলেন। তাদের শাসনামলে প্রজাসাধারণ ছিল নির্যাতিত। অনাচার, দুর্নীতি আর অরাজকতায় মানুষ ছিল অতিষ্ঠ। এমন দুঃসময়ে শেখ নাসির-উদ-দীন নেকমরদ এই রাজ্যে প্রবেশ করেন। ভীমরাজ ও পীতরাজ কৌশলে তাঁকে বাধা দিলে তিনি অলৌকিক ক্ষমতাবলে সেই বাধা ছিন্ন করেন। বিরক্ত হয়ে অত্যাচারী দু'ভাইকে অভিশাপ দিলে তাঁরা ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত হয় পীর শাহ নেকমরদের আস্তানা। বিধ্বস্ত রাজধানীর উপর শুরু হয় নতুন জনপদের যাত্রা। পীর শাহ নেকমরদ পহেলা বৈশাখে ইন্তেকাল করেন। তাঁর পুণ্য স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতে এই তারিখে পবিত্র ওরস উদযাপন ও বার্ষিক মেলার প্রবর্তন হয়। এই মেলাই হচ্ছে বিখ্যাত নেকমরদ মেলা। মেলাটি বাংলাদেশের প্রাচীন মেলাগুলোর

www.pathagar.com

অন্যতম। পীর শাহ নেকমরদের মাজার সম্পূর্ণ কাঁচা (মাটির তৈরি) ছিল। মাজারের কারুকার্য খচিত চাঁদোয়া এবং জামে মসজিদটি প্রায় আশি বছর পূর্বে নির্মিত হয়।

ঠাকুরগাঁও জেলার প্রাচীনতম মহালবাড়ি মসজিদ

ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলা হতে উত্তরে মীরডাঙ্গী থেকে তিন কিলোমিটার পূর্বে মহেশপুর গ্রামে মহালবাড়ি মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান হোসেন শাহের আমলে এটি প্রতিষ্ঠিত। দিনাজপুর জাদুঘরে শিলালিপিটি সংরক্ষিত ছিল। শিলালিপি সূত্রে জানা যায় মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মিয়া মারিক ইবনে মজুমদার। এটি ছিল তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। মসজিদের ভূমি থেকে প্রায় চার ফুট উঁচু চারদিকে শিলা প্রাচীরযুক্ত। যে শিলাগুলো থাম হিসেবে ব্যবহৃত সেগুলো নকশা করা। শিলা-প্রাচীরের উপরে নির্মিত ইটের দেয়াল। ছাদেও শিলাখণ্ডের ব্যবহার ছিল। ছাদ থেকে পানি বের করে দেওয়ার জন্য খোদিত শিলার ব্যবহার দেখা যায়। ১৯৭১ সালের পূর্বেই মূল মসজিদটি ধ্বংস হয় এবং সেখানে নির্মিত হয় নতুন মসজিদ। নবনির্মিত মসজিদটির ভিত ও মেঝেতে প্রাচীন মসজিদের পাথর এবং দেয়ালে ইট ব্যবহার করা হয়েছে। তবে মসজিদের কাছে নকশা করা ও নকশাবিহীন বেশকিছু শিলাখণ্ড পড়ে রয়েছে। প্রাচীন মসজিদের নকশা করা প্রায় ৩৫ × ৩০ ইঞ্চি আয়তনের শিলাখণ্ড নতুন মসজিদের মিহরাবে আটকানো আছে। এছাড়া প্রাচীন মসজিদের তিন তাকের নকশা করা শিলাখণ্ডের মিম্বারটি এখনো নতুন মসজিদের সামনে পড়ে রয়েছে।

মসজিদের পূর্বপার্শ্বে আছে একটি ছোটো দিঘি। দিঘিটির উত্তর পাড়ে ঘাটের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পাথরে বাঁধানো। মসজিদের দুইশত মিটার পূর্বে জঙ্গলের মধ্যে দুটি কবর। কবর দুটি একসঙ্গে ইট দিয়ে বাঁধানো। কবরের উত্তর-পশ্চিমের কোণে নকশা করা একটি পাথরের থাম রয়েছে। হয়তো কবরের চার কোণেই এ ধরনের থাম ছিল। কবর দুটির মধ্যে একটি 'বিশ্বাস পীরের' মাজার বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিমত। সম্ভবত বিশ্বাস শব্দটি ক্রমান্বয়ে বিশওয়াশ থেকে বিশবাইশ শব্দে বিকৃত হয়েছে ফলে এলাকাটিকে বলা হয় বিশবাইশ মহাল।

ঠাকুরগাঁওয়ের দৃষ্টিনন্দন জামালপুর জমিদারবাড়ি জামে মসজিদ

ঠাকুরগাঁও শহর থেকে পীরগঞ্জ যাওয়ার পথে বিমান বন্দর পেরিয়ে শিবগঞ্জ হাট। হাটের তিন কিলোমিটার পশ্চিমে জামালপুর জমিদারবাড়ি জামে মসজিদ। মসজিদ অঙ্গনে প্রবেশমুখে বেশ বড়ো সুন্দর একটি তোরণ রয়েছে। তাজপুর পরগনার জমিদার বাড়ি থেকে রওশন আলী নামক এক ব্যক্তি এ অঞ্চলে আসেন। তাঁর বংশধরেরা পরবর্তীতে এখানে জমিদারি পান। ১৮৬২ সালে জমিদারবাড়ির ভিত্তি স্থাপন করা হয়। বাড়িটির নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার আগেই ১৮৬৭ সালে মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ফলে মসজিদের ব্যয়বহুল নির্মাণ কাজ শেষ হলেও জমিদারবাড়িটির নির্মাণ অসমাপ্ত থেকে যায়।

মসজিদটির শিল্পকলা দৃষ্টিনন্দিত, মনোমুগ্ধকর ও প্রশংসাযোগ্য। মসজিদে বড়ো আকৃতির তিনটি গম্বুজ আছে। গম্বুজের শীর্ষদেশ কাচ পাথরের কাজ করা। এই

www.pathagar.com

মসজিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো মিনারগুলো। মসজিদের ছাদে আটাশটি মিনার আছে। একেকটি মিনার ৩৫ ফুট উঁচু এবং প্রতিটিতে নকশা করা রয়েছে। গম্বুজ ও মিনারের মিলনে সৃষ্টি হয়েছে অপূর্ব সৌন্দর্য। এত মিনার সচরাচর কোনো মসজিদে দেখা যায় না। মসজিদটির চারটি অংশ হলো— মূল কক্ষ, মূল কক্ষের সঙ্গে ছাদসহ বারান্দা, ছাদবিহীন বারান্দা এবং ছাদবিহীন বারান্দাটির অর্ধ প্রাচীরে বেষ্টিত হয়ে পূর্বাংশের মাঝখানে চার থামের উপর ছাদ বিশিষ্ট মূল দরজা। খোলা বারান্দার প্রাচীরে এবং মূল দরজার ছাদে ছোটো ছোটো মিনারের অলংকার রয়েছে। মূল কক্ষের বাইরের দিকের পরিমাপ ২৯×৪৭ ফুট এবং ছাদবিহীন বারান্দার পরিমাপ ২১×৪৭ ফুট। মূল কক্ষের কোণগুলো তিন থাম বিশিষ্ট। এর জানালা দুটি, দরজা তিনটি, কুলুঙ্গি দুটি। মসজিদটির ভিতরের দরজায়, বারান্দায় এবং বাইরের দেয়ালগুলোতে প্রচুর লতাপাতা ও ফুলের সুদৃশ্য নকশা রয়েছে। ভারতের উত্তর প্রদেশের হংসরাজ এবং পুত্র রামহিৎ মসজিদটির মূল কারিগর। দ্বারাভাঙা এলাকার কারিগরেরাও নির্মাণ কাজে অংশ নেয়।

শালবাড়ি মসজিদ ও ইমামবাড়া

ঠাকুরগাঁও জেলার পশ্চিমে ভাউলারহাটের নিকটে শালবনে শালবাড়ি মসজিদটি অবস্থিত। একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় মসজিদটি বাংলা ১২১৫ সালে তৈরি হয়েছে। সংস্কারের কারণে মসজিদটির মূল নকশা নষ্ট হয়ে গেছে। শালবাড়ি মসজিদটির অদূরে ভগ্নদশার একটি ইমামবাড়া আছে। এটাও মসজিদটির সমসাময়িক বলে অনুমান করা হয়। ইমামবাড়াটির পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে দুটি করে চারটি এবং উত্তরে ও দক্ষিণে একটি করে দুটি দরজা আছে। এর বাইরের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে উনিশ ফুট ছয় ইঞ্চি এবং প্রস্থে তের ফুট। এখানে মহরমের অনুষ্ঠানাদি হতো।

সনগাঁ শাহী মসজিদ

বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার কালমেঘ হাট থেকে দুই কিলোমিটার উত্তরে সনগাঁ নামক গ্রামে সনগাঁ মসজিদটি নির্মিত। মোঘল সম্রাট শাহ আলমের সময় এই মসজিদ নির্মাণ হয়েছিল বলে ধরণা করা হয়। মসজিদে তিনটি গম্বুজ ও তিনটি দরজা আছে। দক্ষিণে একটি পাকা কূপ আছে। কূপের গায়ে পোড়ামাটির বাংলালিপি রয়েছে। তবে লিপিটি অস্পষ্ট হওয়ায় পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। মসজিদের পূর্বপার্শ্বে প্রাচীন কবর আছে। এখানেই শুয়ে রয়েছেন "সুধিবাদ পীর' নামক এক পূণ্যাত্মা।

রাজা টংকনাথের বাসভবন (মালদুয়ার), রাজা জগেন্দ্র নারায়ণের রাজবাড়ি, রাজা গণেশের রাজবাড়ি, জগদল রাজবাড়ি, বাংলাগড়, সনগাঁও শাহী মসজিদ, ফতেহপুর মসজিদ, জামালপুর মসজিদ, সৈয়দ নাসিরউদ্দীনের মাজার, পীর শেখ সিরাজউদ্দীনের মাজার, হরিপুর হাটের শিব মন্দির, গোরক্ষনাথের মন্দির, কাতিহার হাট শ্যামরাই মন্দির, রামরাই দিঘি, খুনিয়া দিঘি, আধার দিঘি, শাসলা-পিয়ালা দিঘি, খোররস খাঁ গড় ও দিঘি, রানিদিঘি। হযরত আদম (রঃ)-এর মাজার, গোবিন্দ জিউ মন্দির, হরিপুর রাজবাড়ির শিব মন্দির, হরিণমারী।

বাংলাগড়

পীরগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে ৯ কি. মি. উত্তর-পশ্চিমে কাতিহার বাজার থেকে ৫ কি. মি. পূর্বে পাকা সড়কেই বাংলাগড় অবস্থিত।

www.pathagar.com

মাটির দূর্গ

বাংলাগড় নামক একটি অতি প্রাচীন মাটির দূর্গের ধ্বংশাবশেষ আজও বর্তমান। দূর্গের আয়তন ১.৫×১ কি.মি.। মাটি দিয়ে নির্মিত মাটির প্রাচীরগুলি ৬ মিটার উঁচু ৪ মিটার প্রশস্ত। দূর্গটি এতই প্রাচীন যে, আজও ঐতিহাসিকগণও তা আবিষ্কার করতে পারেননি। মোহাম্মদ জাকারিয়া ও ড. শরিফুদ্দিন আহাম্মদ সম্পাদিত দিনাজপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন পাল অথবা গুপ্ত যুগেই বাংলাগড়সহ অন্যান্য মাটির দূর্গগুলো এ ভূখণ্ডে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

গড় গ্রাম দূর্গ

উপজেলা সদর থেকে নেকমরদ বাজার, নেকমরদ বাজার থেকে ১ কি. মি. উত্তর-পূর্বে ৫০০×৩০০ মিটার বিশিষ্ট একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দূর্গের ধ্বংশাবশেষ দেখা যায়। দূর্গের বিশেষ স্বাতন্ত্রতা হলো দূর্গের মধ্যে আরো একটি ক্ষুদ্র দূর্গের অবস্থান। প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রী থেকে ধারণা করা হয়, সুরক্ষিত দূর্গে ধনভাণ্ডার সঞ্চিত থাকতো। বর্তমান নেকমরদ সরকারি হাই স্কুলের সর্ব পূর্বের বিল্ডিং খননকালে (১৯৬৯ সালে) কয়েকটি ব্রোঞ্জ প্রতিমা পাওয়া যায়। যা দিনাজপুর মিউজিয়ামে প্রথমে ও পরে জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত আছে। প্রতিমা ১০টি বেলে, কালো পাথর ও ব্রোঞ্জ দিয়ে নির্মিত। উক্ত ধাতব সামগ্রী প্রমাণ করে প্রতিমাগুলো গুপ্ত অথবা পাল যুগের কোনো এক সময়ের।

রানীশংকৈলদূর্গ

প্রাচীন কাইছা নদী ও কুলিক নদীর মিলন স্থলে এবং কুলিক নদীর পশ্চিম পার্শ্বে বর্তমানে রানীশংকৈল বন্দরের মাঝখানে পাকা রাস্তার সম্পূর্ণ পশ্চিম অংশটি মাটির দূর্গটির বর্তমান অবস্থান। যার আয়তন ১ কি.মি. ×০.৫ কি.মি.। এখনও দূর্গের মধ্যে পুরনো ঝামা ইটের সন্ধান পাওয়া যায়।

টীকা : কাইছা নদী বলতে বর্তমান কলেজ হাট সংলগ্ন ঈদগাহ থেকে যে নালাটি জুই ফিলিং স্টেশন হয়ে নেকমরদ পর্যন্ত বর্তমান। এই নালাটিই একসময় কাইছা নদী বলে পরিচিত ছিল।

ধর্মগড় মাটির দূর্গ

উপজেলা সদর হয়ে নেকমরদ। সেখান থেকে ৯ কি.মি. পশ্চিমে নাগর নদীর তীর ঘেষে একটি ক্ষুদ্র মাটির দূর্গের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। যার আয়তন ১০০×১৫০ মিটার। এই গড়ের নামই ইউনিয়নের নাম। এই দূর্গের মধ্যে এখনও কূপ, ঘরের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। এ সকল মাটির দূর্গগুলোই প্রমাণ করে এক সময় অরণ্যঘেরা জনপদটি ছিল সামরিক শক্তি-সুরক্ষার অন্যতম সমৃদ্ধশালী ও গুরুত্বপূর্ণ জনপদ।

গোরকই কূপ

রানীশংকৈল উপজেলার নেকমরদ ডাক বাংলো থেকে ৫ কি.মি. পশ্চিমে বয়ে যাওয়া নোনা নদীর পূর্বে সম্পূর্ণ বেলে পাথর দিয়ে নির্মিত কূপ। যা বাংলাদেশের আর কোথাও পাওয়া যায়নি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর আবু তালিবের মতে, বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাচর্য বিনিশ্চিয় অর্থাৎ চর্যাপদ যে কয়জন

www.pathagar.com

পদকর্তা চর্যাপদ রচনা করেছিলেন তাঁরা সকলেই নাথ সহজিয়া মতের অনুসারী এবং তাদের গুরু্র নাম গৌরাক্ষনাথ। ধারণা করা হয় নাথ গুরু গৌবাক্ষনাথের নামানুসারে কূপের নাম গোরকই কূপ। পরবর্তীতে ছোটো আকারের আরো মন্দির নির্মিত হয়। যা আজও বর্তমান। মন্দিরগুলি শিব মন্দির। মোহাম্মদ জাকারিয়া কর্তৃক প্রাপ্ত শিলালিপিতে উল্লেখ আছে একটি অশ্বপ্রতিমা ও একটি বরাহের মস্তকদেশ। তারিখ ৯২০ শতাব্দ, ১৭ মাঘ। গবেষকদের ধারণা এই স্থানটি ছিল বাংলা সাহিত্যের আদি গুরু গোরাক্ষনাথের অনুসারীদের একটি অন্যতম আস্তানা। ঃ

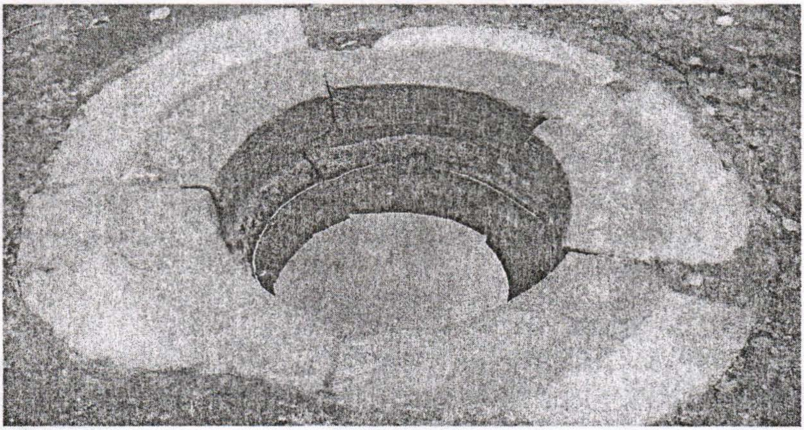

গোরকই কূপ

পীর শাহ নাসির উদ্দিন

আরব থেকে যে সূফি সাধক (৩ জন) উত্তর বাংলায় শান্তির ললিত বাণী প্রচারে এসেছিলেন তাদের মধ্যে সৈয়দ নাসির উদ্দীন অন্যতম। আস্তানা গড়েছিলেন জনপদ ভবানন্দপুর গ্রামে। তাঁর নেক স্বভাবের গুণমুগ্ধতায় অনুসারীর দল স্থানটির নাম কালক্রমে নেকমরদ নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে মুঘল সম্রাট খানকাহ উন্নয়নের জন্য ৭০০ বিঘা জমি দান করেন।

উল্লেখ্য যে, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে রেঁনেলে তাঁর দিনাজপুর মানচিত্রে উল্লেখ করেছেন নেকমরদ মেলাটি অনুমান হয় শত বছরের পুরনো। পূর্ব থেকেই এ মেলা ১লা বৈশাখ থেকে আরম্ভ করে মাসাধিককাল পর্যন্ত স্থায়ী থাকতো। মেলা হিসেবে এর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। ঐতিহাসিকবিদদের ধারণা নেক বাবার নেকমরদের আগমন ১৪ শতকের মধ্যে কোনো এক সময়।

পাথর নির্মিত মসজিদ মহেশপুর

রানীশংকৈল উপজেলা সদর থেকে ৩ কি.মি. দূরে মীরডাঙ্গী বাজার থেকে দেড় কি.মি. পূর্বে কাঁচা রাস্তার পাশে মহেশপুর গ্রামে মসজিদটি অবস্থিত। মোহাম্মদ জাকারিয়া কর্তৃক প্রাপ্ত শিলালিপিতে জানা যায় আলাউদ্দিন হুসেন শাহীর আমলে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণ পাথর দিয়ে মসজিদটি নির্মিত। মসজিদ থেকে সামনেই পুকুরের ঘাট পর্যন্ত

www.pathagar.com

পাথর দিয়ে রাস্তা বাঁধানো। মসজিদের অনতি দূরেই পূর্বদিকে পাথর দিয়ে বাঁধানো দুটি জোড়া কবর আজও অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান।

রামরাই দিঘি

রানীশংকৈল উপজেলা সদর থেকে ৪ কি. মি. দূরত্বে ঠাকুত্তরগাঁও গ্রামের নিকটে এবং নব নির্মিত ৩ নং হোসেনগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স সংলগ্ন বরেন্দ্র অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম জলাশয় রামরাই দিঘি অধুনা রাণীসাগর। যার আয়তন ৯০০×৪৫০ মিটার, গভীরতা ৮/৯ মিটার। পাড়গুলো অনেক উঁচু ও প্রশস্ত। বর্তমানে জলাশয়টি জেলা পরিষদের আওতাভূক্ত এবং পাড়গুলোতে ১২০০ লিচু গাছ রোপন করা হয়েছে। বৃহত্তম জলাশয়টিকে বিনোদন পার্ক এবং পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জেলা পরিষদের উদ্যোগ চলছে।

এই বিশাল জলাশয় কবে কখন খনন করা হয়েছিল তার সঠিক তথ্য প্রমাণ এখনো অজানাই রয়ে গেছে। ধারণা করা হয়, দিনাজপুর মাহারাজা রামনাত অথবা তার পূর্বে পাল, সেন অথবা মুসলিম শাসনামলেও নির্মিত হতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, রামরাই দিঘিকে রানিসাগরে নামকরণ ও আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রথম বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করেন জেলা প্রশাসক মো: জালাল উদ্দিন।

মালদুয়ার জমিদার বাড়ি

রানীশংকৈল উপজেলা সদর থেকে পূর্ব দিকে কুলীক নদীর তীরে অবস্থিত মালদুয়ার পরগণার সর্বশেষ জমিদার রাজা টংকনাথ চৌধুরীর আধুনিক স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত রাজবাড়ি। রাজবাড়িতে প্রাপ্ত তাম্রলিপি থেকে জানা যায় "ঈশ্বর ঘোষ" নামক একজন নৃপতি ছিলেন। যেকোনোভাবেই উক্ত নৃপতির কাছ থেকে বুদ্ধিনাথ ও তার পূর্ব পুরুষগণ পরগণার কর্তৃত্ব হাতে নেন। টংকনাথ চৌধুরী দিনাজপুর মিউনিসিপালটির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং ১৯২৫ সালের ১৮ নভেম্বর কলকাতার ন্যাশনাল হলে ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন।

জগদল জমিদার বাড়ি

রানীশংকৈল উপজেলা সদরের উত্তরে নেকমরদ বাজার থেকে ১২ কি.মি. পশ্চিমে নাগর-তীরনই নদীর মোহনায় সুদৃশ্য অট্টালিকার ভগ্নাবেশটি জমিদার বীরেন্দ্র কুমারের রাজ প্রাসাদ। এখানে আরও দুটি রাজ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বর্তমান। জমিদার বীরেন্দ্র কুমার ছিলেন সুশিক্ষিত এবং বই প্রেমিক। তাঁর ছিল একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। দেশ ভাগের পরে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে লাইব্রেরির মূল্যবান গ্রন্থগুলো তৎকালীন দিনাজপুর S.N College-এ দান করেন। যার মূল্য নির্ধারণ করা হয় তৎকালীন ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা।

খুনিয়া দিঘি

রানীশংকৈল উপজেলা সদর থেকে মাত্র সিকি মাইল দক্ষিণে পাকা রাস্তা সংলগ্ন আমাদের আলোচিত খুনিয়া দিঘি। মহান মুক্তিযুদ্ধে ঠাকুরগাঁও জেলার সবচেয়ে বড়ো আকারের "বদ্ধ ভূমি" খুনিয়া দিঘি। ৬ একর আয়তন নিয়ে কবে কখন খনন করা

www.pathagar.com

হয়েছিল তা অজানাই থেকে গেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক গণহত্যায় নিরীহ মানুষের রক্ত পান করে তার নামের সার্থকতা। তালিকা সংগ্রহ থেকে জানা যায় বিভিন্ন এলাকা, উপজেলা থেকে ২০০০ জনেরও অধিক নিরীহ জনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক জনতাকে ধরে এনে ক্যাম্পে নির্যাতনের পরে খুনিয়া দিঘিতে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়াও শিবদিঘির শিব মন্দির (যা এখন অস্তিত্বহীন) মালদুয়ারের রামচন্দ্র মঠ, কাতিহার শ্যামরাই মন্দির, ক্ষুদ্র বাঁশ বাড়িতে মোঘল আমলের মসজিদ, যদুয়ার মসজিদ।

জলাশয়

নল দিঘি, চামার দিঘি, শিবদিঘি, ছোটো রানি, বড়ো রানি এরকম অসংখ্য প্রাচীন মাটির দূর্গ, বিহার মঠ, মন্দির, জলাশয় প্রমাণ করে যে, জনপদটি ঐতিহাসিক কালের সৃষ্টি। ইতিহাসের পাঠক মাত্রই জানেন দিনাজপুর নামের সৃষ্টির পূর্বে বৃহত্তর অঞ্চলটি বিখ্যাত কয়েকটি সরকারের বিভক্ত ছিল। উল্লেখযোগ্য ঘোড়াঘাট সরকার, তাজপুর সরকার ও পূর্ণিমা সরকার। আমাদের আলোচ্য জনপদটি ঘোড়াঘাট সরকারের পশ্চিম-উত্তর, তাজপুর সরকারের সর্ব উত্তর এবং পুর্ণিয়া সরকারের পূর্ব প্রান্তে।

বহতা নাগর নদী পূর্ণিয়া সরকারের প্রান্ত, টাঙ্গন নদী পর্যন্ত ঘোড়াঘাট সরকার এবং তাজপুর সরকার ভারতের রায়গঞ্জে নাগর কুলিক মৃত হওয়ায় সরকারের পরিচালনা করা সহজ ছিল। আমাদের জানা আছে প্রাচীন রাজধানী কোটি বর্ষ, বাণগড় এবং প্রথম মুসলমান বঙ্গ বিজেতা ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর প্রথম রাজধানী দেবকোট। বর্তমান রায়গঞ্জের একটি থানা গঙ্গরামপুর আমাদের জনপদ থেকে মাত্র ৬০-৭০ কি.মি. সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত। সঙ্গত কারণে এ এলাকাটি ছিল উত্তর জনপদের জন্য একমাত্র সহজ এবং স্বল্প দৈর্ঘ্যের দূরত্ব এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। সুরক্ষার জন্য এর চেয়ে সুবিধা কোথায় পাওয়া যাবে?

পুনশ্চ আমাদের আজকের এই প্রিয় রানীশংকৈলঅনাদিকালেও অনেক রাজ্য জয়ী নৃপতির কাছে ভৌগোলিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলেই বিভিন্ন মাটির দূর্গ অপরিহার্যভাবেই নির্মিত হয়েছিল। মন্দির মসজিদ এর স্থাপনায় প্রমাণ করে লোকালয়ে ধর্ম প্রচার প্রসার ও নিবিড়ভাবে ধর্ম পালনের জন্যই এই উপাসনায়লগুলো নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ব্রিটিশ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে জমিদারি ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় মালদুয়ার পরগণায় জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চৌধুরী টংকনাথের বাবা বুদ্ধিনাথ অথবা তার পূর্বসূরীগণ।

উল্লেখ্য যে, আমাদের সকলের জন্য জেনে রাখা ভালো টংকনাথ চৌধুরীর অনেক পূর্বেই মালদুয়ার পরগণা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। একইভাবে দিনাজপুর মহারাজার কথিত আত্মীয় জগদলের জমিদার বীরেন্দ্র কুমার রায়ও জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে জমিদার বীরেন্দ্র কুমার ছিলেন শখের হোমিও চিকৎসক সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক এবং একজন মুগ্ধ পাঠক।

সবশেষে বলা যায়, আমরা সৌভাগ্যবান। আমাদের সামনে আমাদের সুদূঢ় অতীত স্পষ্ট ও জীবন্ত । কিন্তু আমরা হতভাগ্য, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের সেই সকল গর্বিত স্মৃতি সাক্ষ্যগুলো রক্ষা করতে পারছি না।

www.pathagar.com

জ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তি

প্রাচুর্যময় উর্বর সমতল ভূমির উদারতায়, নৈসর্গিক সৌন্দর্যে সহজ সরলতার এক মোহনীয় রূপ রয়েছে ঠাকুরগাঁও জেলার। সমতল ভূমির সহজ সরলতার পবিত্র ছাপ এই জনপদের সাধারণ মানুষের চরিত্রেও সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। তাই যুগে যুগে দেখা যায় ঠাকুরগাঁও জেলার মানুষ শান্তিপ্রিয়। প্রত্যেক শতাব্দীতে কিছু মানুষ পাওয়া যায় যারা মানুষের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। ঠাকুরগাঁও জনপদের শান্তিপ্রিয় মানুষের মধ্যেও নিঃসন্দেহে বিভিন্ন শতাব্দীতে অনেক ব্যক্তিই এসেছেন যারা নিজ এলাকার, নিজ সম্প্রদায়ের-সমাজের, জাতির বা দেশের সংস্কার কাজ, বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন ও জনকল্যাণ কাজকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন শতাব্দীর কীর্তিমান মানুষগুলোর বর্তমানে পরিচিতি পাওয়া বিলুপ্ত প্রত্নসম্পদের মতোই দুরূহ। সময়ের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের অন্তরালেই তাঁরা থেকে গেলেন। আমরা আমাদের নিকটতম বিগত ও বর্তমান সময়ের এক শতাব্দীর মধ্যে বরেণ্য ব্যক্তিত্বকে ধারণ করার চেষ্টা করেছি। এই এলাকার জন্য আরো অনেক কর্মী পুরুষের অবদান রয়েছে যারা সময়ের স্বল্পতার কারণে এর বাইরে থেকে গেলেন। তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ ভালোবাসা রইলো। যাদের লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেখানেও তথ্যের অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে এটাই স্বাভাবিক। আমরা শুধু পথের সূচনা করেছি এই প্রত্যাশায় যে, অন্যেরা আগামীতে গবেষণা দ্বারা তা সমৃদ্ধ করবে।

হাজী মোহাম্মদ দানেশ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ ১৯০০ সালে বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার সুলতানপুর গ্রামে জোতদার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৩১ সালে ইতিহাসে এম.এ. ও ১৯৩২ সালে এল.এল.বি. পাস করে দিনাজপুর আদালতে আইন ব্যবসায় যোগদান করেন। ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গ সংগঠন কৃষক সমিতির কর্মসূচির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেকে কৃষক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি টোল আদায় বন্ধ ও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবিতে দিনাজপুর জেলায় ব্যাপক সংগ্রাম পরিচালনা করেন। ১৯৪২ সালে রংপুরের ডোমারে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় কৃষক সম্মেলনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে ১৯৩৮ ও ১৯৪২ সালে কারাভোগ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বর্গা চাষিদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি জেলায় তথা উত্তরবঙ্গে তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং পরে ১৯৪৫ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। তেভাগা আন্দোলনের জন্য মুসলিম লীগ দলীয় বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক গ্রেফতার হন এবং ১৯৪৭ সালে মুক্তিলাভ করেন। ঐ বছরেই তিনি দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ইতিহাসে অধ্যাপনায় যোগাদান করেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৫২ সালে ২৭ এপ্রিল গণতন্ত্রী দল গঠন করে দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালের ৩ ডিসেম্বর গণতন্ত্রী দলের যুক্তফ্রন্টে যোগদানের প্রধান উদ্যোক্তা ও ফ্রন্টের মনোনয়নে ১৯৫৪ সালের মার্চে দিনাজপুর জেলা থেকে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ৯২-ক ধারা জারি করে পূর্ববঙ্গের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেওয়া হলে গ্রেফতার হন।

www.pathagar.com

গণতন্ত্রী দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেন। তিনি ন্যাপের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করা হলে তিনি কারারুদ্ধ হন। কারামুক্তির পর তিনি ১৯৬৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারিতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পূর্ব-পাকিস্তান কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং প্রায় দেড় বছর এ পদে দায়িত্ব পালনের পর পুনরায় ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে ন্যাপের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচির বিরোধিতা করে ১৯৬৬-১৯৭০ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে দিনাজপুর-৩ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। ১৯৭১ সালের ৫ জানুয়ারি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানীপন্থি) থেকে পদত্যাগের পর একই বছর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর গমন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কর্ম সম্পাদন করেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার বছর দুয়েক পর জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন (জাগমুই) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন এবং এর সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। জাগমুই বিলুপ্ত করে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক গঠিত বাকশাল-এ ১৯৭৫ ২৪ ফেব্রুয়ারিতে যোগদান করেন ও এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্যের হাতে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর বাকশাল সরকারের পতন ঘটলে তৎকর্তৃক রাজনৈতিক দলবিধির আওতায় গণমুক্তি ইউনিয়ন (জাগমুই) পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৯৮০ সালে এই দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে কয়েকজন বামপন্থি নেতার সহযোগিতায় গণতান্ত্রিক পার্টি গঠন ও এর সভাপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তিতে দলটি ১৯৮৬ সালে ১ জানুয়ারি সামরিক শাসক লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় পার্টির সঙ্গে একীভূত হলে জাতীয় পার্টির অঙ্গ সংগঠন জাতীয় কৃষক পার্টির প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। কৃষক, সাধারণ ও মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য আজীবন সংগ্রাম পরিচালনা করেন। তিনি তেভাগা আন্দোলনের নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৮৬ সালের ২৮ জুন তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আলহাজ নূরুল হক চৌধুরী

ঠাকুরগাঁও জেলার উচ্চ শিক্ষিত, বিশিষ্ট আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, সমাজ হিতৈষী জনদরদী ব্যক্তি ছিলেন আলহাজ নূরুল হক চৌধুরী। ১৯০২ সালে ছোটো বালিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হেকমতুল্লা চৌধুরী।

দেবীগঞ্জ হাইস্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে আই.এ পাস করার পর তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ডিস্টিংশনে বি.এ পাস করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ল' পাস করার পরে কলকাতাতেই কিছুদিন আইন ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন। এর পরে ঠাকুরগাঁওয়ে এসে আইন পেশায় মনোনিবেশ করেন। ঠাকুরগাঁও আইন পেশায় পাশাপাশি তিনি

www.pathagar.com

রাজনীতিতে সক্রিয় হন। তিনি কংগ্রেস পার্টিতে যোগ দেন এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তীতে মুসলিম লীগে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির সময় ঠাকুরগাঁও মহকুমার পঞ্চগড়, বোদা, তেঁতুলিয়া, দেবীগঞ্জ ও আটোয়ারী থানা যাদের নেতৃত্বে পাকিস্তান অংশে আসে, তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় তিনি ঠাকুরগাঁও মহকুমার মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬২ সালে আলহাজ নুরুল হক চৌধুরী ঠাকুরগাঁও মহকুমা থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তী জাতীয় পরিষদে দ্বিতীয়বারের জন্য এম.এন.এ নির্বাচিত হন। প্রথমবারে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের এবং পরবর্তী নির্বাচনের পর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি থাকা অবস্থায় ঠাকুরগাঁওয়ের বিভিন্ন থানা ও ইউনিয়নে অনেকগুলো পোষ্ট অফিস স্থাপন করেন। ঠাকুরগাঁও সুগার মিল ও ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া সড়ক নির্মাণে অবদান রেখেছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় এক সময় চালু হয়েছিল ঠাকুরগাঁও বিমানবন্দর।

আলহাজ নুরুল হক চৌধুরী দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়ে পাঁচ বছর কাজ করেছেন। এ সময়ে তিনি ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় এলাকায় প্রচুর দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ঠাকুরগাঁও পৌরসভার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। কাচারী জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছেন। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তাঁর অবদান রয়েছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জি.সি দেবের লেখা এক চিঠি থেকে জানা যায় আলহাজ্ব নুরুল হক চৌধুরী জি.সি দেবের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে আলহাজ নুরুল হক চৌধুরী খুব সহজ সরল সাধারণ জীবন যাপন করতেন। সদালাপী ও বন্ধুভাবাপন্ন এই মানুষটি ১৯৮৭ সালে ৮৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

মির্জা রুহুল আমিন

মির্জা রুহুল আমিন ডাক নাম চখা মিয়া। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হতে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই মানুষটি ছিলেন ঠাকুরগাঁও জেলার মানুষের কাছে সমাজ পরিবর্তনের একজন সু-মহান নেতা। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষক, রাজনীতিবিদ ও সমাজ সংস্কারক।

বিশ শতকের ত্রিশের দশকের শুরুতে যখন অসহযোগ আন্দোলন, ভারত ছাড় আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন এবং মুসলিম জাগরণের আন্দোলনে ভারতভূমি প্রকম্পিত ঠিক সেই সময়ে তৎকালীন দিনাজপুর জেলার বর্তমান পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলার মির্জাপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মির্জা পরিবারে ১৯২১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কমরউদ্দীন আহম্মদ ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক মানুষ। মা মেহের আবজুন ছিলেন পরিশ্রমী মহিলা। ছোটো বেলায় তিনি খুব চটপটে ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন বলে তাঁর দাদী মির্জা রুহুল আমিনকে 'চখা মিয়া' বলেই

ডাকতেন। 'চোখা' শব্দের অর্থ ধারালো বা তীক্ষ্ণ (আঞ্চলিক উচ্চারণের চখা)। সত্যিই তিনি সমগ্র জীবনে সকল ক্ষেত্রেই সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন।

চাচা মৌলভী কাদের বকশ অবিভক্ত বাংলার একজন স্বনামধন্য নেতা, সমাজ সংস্কারক ও প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যক্তিত্বের আদর্শের অনুসারী ছিলেন মির্জা রুহুল আমিন। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক-সহ অবিভক্ত বাংলার অনেক বরেণ্য নেতা মৌলভী কাদের বকশ সাহেবের বাসায় আসতেন।

ঐতিহ্যবাহী মির্জাপুর এম.ই স্কুলে বাল্য শিক্ষা শেষে ঠাকুরগাঁও হাই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। অতঃপর রংপুর কারমাইকেল কলেজে এবং পরে কলকাতায় রিপন কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃতিত্বের সাথে বি.এ পাস করেন। এ সময় তিনি সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু ও দেশবরেণ্য দার্শনিক অধ্যাপক জি.সি দেবের স্নেহধন্য ছাত্র হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। যখন তিনি শেষ বর্ষের ছাত্র তখন কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে বাড়ি চলে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত আর পরীক্ষা দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মির্জা রুহুল আমিনের আবির্ভাব ঘটেছিল ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার ঊষালগ্নে। পাক ভারত সীমান্ত নির্ধারণের কমিশনার রেড ক্লিফ যখন তৎকালীন ঠাকুরগাঁও মহকুমাতে বীরগঞ্জ, কাহারোল, সেতাবগঞ্জ, খানসামা, বালিয়াডাঙ্গী, আটোয়ারী, হরিপুর, রানীশংকৈল, পীরগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁও সদরসহ মোট ১০টি থানা ভারতের অন্তর্ভূক্ত করার অপকৌশল অবলম্বন করেছিলেন ঠিক ঐ সময়ে এর বিরোধিতা করে রুহিয়াতে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই 'রুহিয়া কনফারেন্স' মির্জা রুহুল আমিন বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

পীরগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ঠাকুরগাঁও হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ছাত্র অবস্থায় রাজনীতিতে সক্রিয় থেকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এই জনপদের প্রতিটি প্রান্তরে জনমতকে সংগঠিত করেছিলেন। এর কিছুদিন পরে তিনি ঠাকুরগাঁও মহকুমা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর সততা ও কর্মনিষ্ঠা ছিল অতুলনীয়। ফলে অল্প সময়ে তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে দক্ষতার সাথে নেতৃত্ব দানে সক্ষম হন। পরবর্তীতে তিনি তৎকালীন দিনাজপুর জেলার মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদকও নির্বাচিত হন। দীর্ঘ ১৭ বছর ঠাকুরগাঁও পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন তাঁর জনপ্রিয়তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি দিনাজপুর জেলার জেলা পরিষদের সদস্যও ছিলেন।

তিনি ১৯৫৮ সালে ঠাকুরগাঁও শহরে প্রতিষ্ঠা করেন ঠাকুরগাঁও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। নারীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি ১৯৮০ সালে ঠাকুরগাঁও মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুরগাঁও ডিগ্রি কলেজ, সি.এম আইয়ুব বালিকা বিদ্যালয় ও হাজীপাড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় তাঁরই প্রচেষ্টার ফসল।

www.pathagar.com

মির্জা রুহুল আমিন তার সমগ্র জীবন মানুষ, সমাজ ও দেশের জন্য কাজ করে হয়েছেন স্মরণীয় ও বরণীয়। এই মহান কৃতিসন্তান ১৯৯৭ সালে ১৯ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭.১০ মিঃ ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।

মো. রেজওয়ানুল হক (ইদু) চৌধুরী

কৃষকের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার দিন যাপনের কাব্যে শ্রদ্ধার সাথে যে নামটি উচ্চারিত হয় তিনি হলেন রেজওয়ানুল হক চৌধুরী। কৃষকের প্রিয় নাম হলো ইদু চৌধুরী। ঈদের দিন জন্ম গ্রহণ করায় তার নাম রাখা হয় ইদু চৌধুরী। তিনি সবার নিকট ইদু চৌধুরী নামেই খ্যাত। তাকে বলা হয় কৃষকের বন্ধু।

ঠাকুরগাঁও উপজেলার ছোটো বালিয়া নামক গ্রামে চৌধুরী পরিবারে রেজওয়ানুল হক চৌধুরী জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম রমজান আলী চৌধুরী এবং মাতার নাম ফজিলাতুন্নেসা। বর্ণাঢ্য কৃষক পরিবারে জন্মের কারণে রেজওয়ানুল হক চৌধুরী তারুণ্যের দিনগুলোতে বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর পোশাক ছিল সাহেবী কায়দার। কোর্ট, প্যান্ট, সার্ট পরা, গাড়ী চালানো ছিল তাঁর নেশা। কিন্তু মাওলানা ভাসানীর সান্নিধ্যে আসার পর ইদু চৌধুরীর জীবনধারা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। মাওলানা ভাসানীর অনুসারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাহেবী পোশাক ছেড়ে দিয়ে তিনি আজীবন আবহমান বাংলার খদ্দরের পাঞ্জাবী ও লুঙ্গি পরিধান করেন। সাধারণ সহজ সরল দিন যাপন শুরু হয়। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী হওয়ার পরে মন্ত্রী পরিষদের শপথ অনুষ্ঠানে নিয়ম মাফিক পোশাকে তাঁকে উপস্থিত করা যায়নি। অবশেষে শুধু তার জন্যেই নিয়ম শিথিল করে তাঁকে পায়জামা পাঞ্জাবী ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি পায়াজামা পাঞ্জাবী পরেই শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ঠাকুরগাঁও-১ আসনে ১৯৭৯ এবং ১৯৮৮ সালে তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দু'বার সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।

রেজওয়ানুল হক চৌধুরী ১৯৫৭ সালে ন্যাপের রাজনীতিতে যুক্ত হন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ), দিনাজপুর জেলা শাখার সভাপতি এবং দিনাজপুর জেলা কৃষক সমিতির সভাপতি ছিলেন। মাওলানা ভাসানীর ঐতিহাসিক ফারাক্কা বাঁধের লং মার্চে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। কৃষক ঋণ, সুদ মওকুফ, সার্টিফিকেট মামলা ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকের দুর্দিনে তিনি কৃষকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

জনসেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন রেজওয়ানুল হক চৌধুরী। তাকে ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠার রূপকার বলা হয়। রিভারভিউ উচ্চ বিদ্যালয় এবং সি.এম আইয়ুব বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত করেছেন উমেদ আলী উচ্চ বিদ্যালয়, সবদল ডাঙ্গা কল্যাণ ট্রাস্ট, সোনাপাতিলা জামে মসজিদ, ফজিলাতুন্নেসা শিশু পরিবার। ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান, শিল্পকলা একাডেমীর সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৯ সালের ৪ ডিসেম্বর রেজওয়ানুল হক চৌধুরী তেভাগা আন্দোলনের বিখ্যাত কৃষকনেতা হাজী মোঃ দানেশ এর কন্যা সুলতানা রেজওয়ানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁকে আলপনা সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই কৃষকদরদী নেতা ১৯৯৪ সালের ২৫ মে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

মুহম্মদ দবিরুল ইসলাম

মুহম্মদ দবিরুল ইসলাম ১৩ মার্চ ১৯২২ সালে বর্তমান ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলাধীন বামুনিয়া গ্রামে জন্ম লাভ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা তমিজউদ্দিন আহমেদ, মাতা দখতার খানম। ঠাকুরগাঁও হাই স্কুল হতে ১৯৩৮ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে আই.এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে চতুর্থ স্থান অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী ও অন্যান্য আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার কারণে লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে এবং সরকারি রোষানলে পড়েন। পরে ১৯৪৭ সালে তিনি বি.এ পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন শাস্ত্রে ভর্তি হন। বিভিন্ন আন্দোলনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার এবং ১৯৫৫ সালে কারাবাস থেকে এল.এল. বি পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

বাঙালিদের অধিকার আদায়ের গৌরবজনক অধ্যায়ে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে, ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়ে কর্মচারীদের আন্দোলনে, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ (বর্তমানে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ) গঠনে যে ক'জন তেজোদীপ্ত তরুণ ছাত্রনেতা বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে মুহম্মদ দবিরুল ইসলাম অন্যতম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ক্লাসের সহপাঠী।

১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনে দিনাজপুরের নূরুল হুদা বা কাদের বক্স, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, এম আর আখতার মুকুল, দবিরুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে দবিরুল ইসলাম ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীসহ ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন দাবী নিয়ে আন্দোলন শুরু হলে সরকারের জুলুম নির্যাতন নেমে আসে। জুলুম নির্যাতন প্রতিরোধ হিসেবে ১৯৪৯ সালের ৮ জানুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র ধর্মঘট হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়াম মাঠে ছাত্ররা জমায়েত হতে শুরু করে। শেখ মুজিবর রহমান, দবিরুল ইসলাম ও অলি আহাদ এখানে বক্তব্য রাখেন। এই আন্দোলনের সূত্র ধরে দিনাজপুরে অপ্রতিরোধ্য ছাত্র আন্দোলনের সূচনা হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নেতা দবিরুল ইসলাম, নূরুল হুদা বা কাদের বক্স ও এম আর আখতার মুকুল কারারুদ্ধ হন। তাঁদের মুক্তির উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমান, আব্দুল হামিদ চৌধুরী ও আব্দুল আজিজ দিনাজপুর পৌঁছালে জেলা প্রশাসক ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নেতৃত্ববৃন্দকে দিনাজপুর ত্যাগের নির্দেশ দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের ধর্মঘটকে সমর্থন করার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ১৯৪৯ সালের ২৯ মার্চ শেখ মুজিবর রহমান, দবিরুল ইসলাম, আব্দুল হামিদ চৌধুরী, অলি আহাদসহ মোট ছয় জন বহিষ্কার হন।

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে দবিরুল ইসলাম যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্টের আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রীসভায়

তিনি প্রতিমন্ত্রী মর্যাদায় পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি (শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম) নিযুক্ত হন। তিনি ঠাকুরগাঁও জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। তখন তিনি ঠাকুরগাঁওয়ে সুগার মিল স্থাপনের জন্য জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিরল প্রতিভার অধিকারী মুহম্মদ দবিরুল ইসলাম ১৯৪৯ ও ১৯৫৪ সালে কারা অভ্যন্তরে অকথ্য নির্যাতন ভোগ করায় হৃদরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হন। ফলে ১৯৬১ সালে তিনি অল্প বয়সে ইন্তেকাল করেন।[৪]

আবু মোজাফ্ফর ইবনে জাহিদ মোহাম্মদ ইউসুফ

জন্ম রানীশংকৈল উপজেলার বনগাঁও গ্রামে। বিশিষ্ট সমাজসেবী দানশীল ব্যক্তিটি সবার কাছে মোজাফ্ফর উকিল নামে পরিচিত। পাকিস্তান আমলে মুসলিম লীগের রাজনীতি করেছেন দীর্ঘদিন। তৎকালীন দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি সংগ্রাম পরিষদে যোগ দেন। এ অপরাধে ৭১-এ পাক সেনারা তাঁকে গ্রেফতার করে এবং অমানবিক নির্যাতন করে। পাকিস্তানি সেনারা রাজশাহী ছেড়ে চলে গেলে তিনি নাটোর কারাগার থেকে মুক্তি পান। পরবর্তীতে তিনি ভাসানী ন্যাপ ও বাংলাদেশ পিপলস পার্টির রাজনীতি করেন। নেকমরদ আলিমুদ্দীন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এবং বনগাঁও আবু জাহিদা হাই স্কুল তাঁর স্মৃতির স্বাক্ষর বহন করছে। তিনি ১৯৭৭ সালের ২২ আগষ্ট মৃত্যু বরণ করেন।

মাওলানা হাফিজ উদ্দীন আহমদ

বিশিষ্ট আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ, সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ মাওলানা হাফিজ উদ্দীন আহমদ। ঠাকুরগাঁও উপজেলার সৈয়দপুর দানারহাট নামক গ্রামে তাঁর জন্ম।

মাওলানা হাফিজ উদ্দীন আহমদ পারিবারিক ঐতিহ্যেই ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হন। কোরআন, হাদীস এবং ইসলামী শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও আরবি, ফারসি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ঠাকুরগাঁও হাইস্কুলে দু'বছর লেখাপড়ার পর তিনি রংপুরের বদরগঞ্জ কালীগঞ্জ মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তিনি রংপুর শহরে সাধকপুরুষ মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী মাজার সংলগ্ন মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রংপুরের কনফারেন্সে তখনকার তরুণ নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও মাওলানা আকরাম খাঁ আসেন। এখানে ছাত্রাবস্থায় হাফিজ উদ্দীন আহমদ তাদের সান্নিধ্যে এলে তারা তাঁকে কলকাতায় লেখাপাড়ার পরামর্শ দেন। ফলে মাওলানা হাফিজ উদ্দীন আহমদ রংপুর ছেড়ে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার শাখা হুগলী মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এই মাদ্রাসা থেকে ১৯১৭ সালে জামাতে উলা পাশ করেন। এর পূর্বেই তিনি এন্ট্রান্স পাস করেন।

ছাত্রাবস্থায় হাফিজ উদ্দীন আহমদ মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁরই ভাবশিষ্য কংগ্রেসে যোগদান করেন । তিনি স্বদেশি আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২১ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় নিজ এলাকায় বিদেশি পণ্য বর্জন করে দেশীয় পণ্য হিসেবে চড়কায় কাটা সূতি কাপড় ব্যবহারের প্রচার চালান। তিনি কংগ্রেসের সিক্রেট কমিটির সদস্য ছিলেন। এছাড়া কংগ্রেসের ব্রিটিশ

www.pathagar.com

বিরোধী আন্দোলনের সময় দিনাজপুর জেলার সংবাদদাতা হিসেবে মাওলানা হাফিজ উদ্দীন আহমদ দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

১৯৩৩ সালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও মাওলানা আকরাম খাঁ-র নেতৃত্বে হাফিজ উদ্দীন আহমদ মুসলিম লীগে যোগ দিন। তিনি দিনাজপুর জেলা থেকে মুসলিম লীগের প্রাদেশিক কমিটির সদস্য হন। একই সাথে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের বঙ্গীয় কৃষক প্রজা সমিতির ঠাকুরগাঁও মহকুমার সভাপতি ছিলেন।

মাওলানা হাফিজ উদ্দীন আহমদ সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণে ও শিক্ষার আলো ছড়াতে নিবেদিত প্রাণ পুরুষ ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত দিনলিপিগুলো থেকে এই এলাকার তৎকালীন সমাজের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, সামাজিক রীতিনীতির অনেক চিত্র পাওয়া যায়। এই কর্মীপুরুষ ৯৬ বছর বয়সে ১৯৪৮ সালে ইন্তেকাল করেন।

মো. ফজলুল করিম

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ঠাকুরগাঁওয়ে আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দু ছিলেন মোঃ ফজলুল করিম। তিনি ১৯২৭ সালে ২৭ মার্চ ঠাকুরগাঁও রুহিয়া ইউনিয়নের কানিকশালগাঁ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নইমউদ্দীন আহম্মদ এবং মাতার নাম সতিজান নেসা।

১৯৪৬ সালে ম্যাট্রিক পাসের পর কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। কলেজের ইউরোপিয়ান অধ্যক্ষ ছিলেন ফ্রেন্ড পেরেরা। বেকার হোস্টেলে থাকতেন। তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই কলেজে ৩য় বর্ষের ছাত্র। এখানেই তাঁর সাথে বঙ্গবন্ধুর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। সোহরাওয়ার্দীর বাসায় নিয়মিত যেতেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্ত হলে ফজলুল করিম কলকাতায় থেকে যান। বঙ্গবন্ধু সে সময় ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৪৭-এ হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় কলকাতার চারদিক বিপর্যস্ত অবস্থা। এর রেশ ১৯৫০ সাল পর্যন্ত থাকে। দাঙ্গার মধ্যে কোনো রকমে বি.এ পরীক্ষা দিয়ে পাস করেন এবং ফিরে আসেন নিজ বাসভূমিতে। উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও লেখাপড়া শেষ না করে ঠাকুরগাঁও ফিরে আসেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ঠাকুরগাঁওয়ে ফিরে এসে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন ফজলুল করিম। তিনি আনিসুল হক চৌধুরী, আব্দুল গফ্ফার, মশিরউদ্দিন আহম্মদ মোক্তার' কে নিয়ে ঠাকুরগাঁও মহকুমায় আওয়ামী মুসলিম লীগ কমিটি গঠন করেন। ১৯৫১ তে ফজলুল করিমকে মিছিল থেকে তৎকালীন এসডিও আলতাফ গওহর (পরে পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী) গ্রেফতার করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ঠাকুরগাঁওয়ে মোঃ ফজলুল করিম পুনরায় গ্রেফতার হন। দিনাজপুর কারাগারে ছাত্রলীগের প্রথম সভাপতি দবিরুল ইসলামের সাথে ৯নং সেলে তাঁকে রাখা হয়। তখন কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা মোহাম্মদ ফরহাদও দিনাজপুর কারাগারে আটক ছিলেন। ১৯৬২ সালে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ১৯৬৬ সালে আঃ রউফ উকিল, আব্দুল লতিফ, আব্দুর রশীদ মোক্তারসহ তিনি ছয় দফার আন্দোলন ঠাকুরগাঁওয়ে ছড়িয়ে দেন।

www.pathagar.com

১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নমিনেশন নিয়ে ফজলুল করিম এমপি নির্বাচিত হন। এরপর থেকে ১৯৭১ এর প্রথম দিকের উত্তাল দিনগুলোতে তাঁকে গুরু দায়িত্ব পালন করতে হয়। ঠাকুরগাঁও ইপিআর ক্যাম্পে বাঙালিদের সাথে অবাঙালিদের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তাঁর বাড়ি অবাঙালি ইপিআর-রা আক্রমন করে। আক্রমনের পূর্বমুহূর্তে বাড়ি ত্যাগ করায় অল্পের জন্য সে যাত্রায় তিনি বেঁচে যান। ১২/১৩ এপ্রিলে ঠাকুরগাঁও ছেড়ে খোলাবাড়ি ক্যাম্প হয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। এরপরে মুক্তিযুদ্ধে ৬নং সেক্টরের সিভিল এ্যাডভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ইসলামপুরের বাকশা অফিসে কর্মরত ছিলেন। এখানে তার সাথে ছিলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, আকবর হোসেনসহ আরো অনেকে। দেশ স্বাধীনের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের এই ঠাকুরগাঁও মহকুমা পুনর্গঠনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি পুনরায় এমপি নির্বাচিত হন। ১৯৭৫-এ জেলা গভর্ণর মনোনীত হন। তিনি সমাজ সেবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রিভার ভিউ স্কুল, ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠায় অনেকের সাথে তিনিও অবদান রেখেছেন।

সৈয়দা জাহানারা

ঠাকুরগাঁও জেলার অগ্রণী মহিলাদের পথিকৃৎ হলেন সৈয়দা জাহানারা। নারীদেরকে শিক্ষা সংস্কৃতির আলোর জগতে নিয়ে আসতে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি ঠাকুরগাঁও জেলার অনেকগুলো সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৬৮ সালে 'অগ্রণী মহিলা সংসদ' নামে একটি ব্যতিক্রমধর্মী সমিতি গঠিত হয়। এই সংগঠনটি ঠাকুরগাঁওয়ে সামাজিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদান রাখে। সৈয়দা জাহানারা সংগঠনটির সম্পাদিকা ছিলেন। ১৯৭১ এর উত্তাল দিনগুলোতে ঠাকুরগাঁওয়ে যে সমস্ত মহিলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। একটি যুদ্ধে নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত ঠাকুরগাঁওয়ের অসহায় নারী ও শিশুদের পাশে এসে দাঁড়ান। 'নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। ১৯৭৩ সালে রংপুর, দিনাজপুর (আর.ডি.আর.এস) এ মহিলা বিভাগে যোগ দেন। 'মুন্সিরহাট মহিলা প্রশিক্ষণ কর্মী বহুমুখী সমবায় সমিতি' নামে একটি সংগঠন সৃষ্টি করেন। ঠাকুরগাঁওয়ের দরিদ্র মহিলাদের তৈরি কুটির শিল্প নরওয়ে কানাডা আমেরিকায় রপ্তানির ব্যবস্থা করেন।

এক সময় ঠাকুরগাঁও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং পরে ঠাকুরগাঁও মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন সাহায্য সংস্থা ইউ.এস.সি কানাডা বাংলাদেশ এর পরিচালক। সৈয়দা জাহানারা ঠাকুরগাঁওয়ে সাহিত্য সাংস্কৃতিক অংগনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিজে লিখেছেন অন্যকে লিখতে অনুপ্রাণিত করেছেন। জীবনের সফলতার স্বাক্ষর স্বরূপ আল্পনা সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদের সম্মাননা পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন। তাকে ঠাকুরগাঁওয়ের নারী জাগরণের ক্ষেত্রে 'বেগম রোকেয়া' বললেও অত্যুক্তি হয় না।

www.pathagar.com

ঝ. মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১। ঠাকুরগাঁও মহকুমা আরেকবার যেন তার সংগ্রামী ঐতিহ্য দেখানোর ঐতিহাসিক সুযোগ পেয়েছিল। প্রখ্যাত কৃষক নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশ তেভাগা আন্দোলনের কম্পরাম সিং, আভারণ সিং, রাজেন সিং, কমরেড তিলক সিং এবং রাজবংশী মহিলা কৃষক দীপশ্বেরীর জন্মভূমি ঠাকুরগাঁওয়ের আকাশ বাতাস যেন ফুঁসে উঠেছিলো সে সময়।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্তি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থানকে শক্ত করেছিলো। পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলো নতুন দিনের-শোষণ-বঞ্চনাহীন জনকল্যাণকর একটি রাষ্ট্রের। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তানি স্বৈর সামরিক শাসকচক্র ক্ষমতার মোহ তা হতে দেয়নি। ফলতঃ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধমূলক আন্দোলন এবং সংগ্রাম হয়ে উঠেছিলো অনিবার্য।

তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতার লিপ্সা ও পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্যবাদ ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে। ফলে ওই দিনই পূর্ববাংলা বিক্ষোভে ফেঁটে পড়ে। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। হরতাল পালনকারীদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। ৩ মার্চ পল্টনে জনতার বাঁধভাঙা জোয়ার। বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি অঙ্গনে এখানে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রথম ঘোষণাপত্র পাঠ করেন তৎকালীন ছাত্রনেতা শাহজাহান সিরাজ। তারপরের কয়েকদিন উত্তপ্ত গোটাদেশ। এসে যায় ৭ মার্চ। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। স্বাধীনতার পক্ষে ৯ মার্চ পল্টন ময়দানে ভাষণ দেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। এসব জাতীয় ইতিহাস।

ঠাকুরগাঁওয়ের মানুষও ঢাকার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলো। তখন ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র এখানে পৌছতো পরের দিন। ভিড় হতো পত্রিকা পড়তো। টেলিফোনের সংযোগও সহজলভ্য ছিল না। প্রাপ্ত তথ্য ও সংবাদের ভিত্তিতে ঠাকুরগাঁও শহরের জনসমাবেশ, মিছিল-মিটিং তথা সার্বিক আন্দোলন আস্তে আস্তে দানা বেঁধে উঠেছিল। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাদের অঙ্গসংগঠনগুলোর ডাকে আহুত কর্মসূচিতে সাড়া দিয়ে পথে নেমেছিলো ছাত্র-জনতা-কৃষক-শ্রমিক। কালিবাড়ি হাটের দক্ষিণে ওয়াপদা আবাসিক এলাকা থেকে উত্তরে টাঙ্গনের পাড়ের রিভারভিউ হাই স্কুল, পশ্চিমে ঠাকুরগাঁও কলেজ থেকে পূর্বে বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত প্রায় ৬ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ছোটো সাজানো গোছানো শহরটা টগবগিয়ে ফুটেছিলো জনতার উত্তাল শ্লোগান আর মিছিলে। সকালের নাস্তা খেয়েই মানুষ এসে জড়ো হতো চৌরাস্তায়। নেতৃস্থানীয়রা বসতেন পেল্টু বাবুর চায়ের দোকানে।

www.pathagar.com

৩ মার্চ বিকেলে স্থানীয় ফুটবল মাঠে তৎকালীন মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল লতিফ মোক্তারের সভাপতিত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মহকুমার তৎকালীন ১০টি থানার বিভিন্ন পেশা ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দসহ শহরের বেশিরভাগ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

রাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ফজলুল করিম এমপিএ সাহেবের বাসায় মিলিত হন। এখানে ৭১ সদস্য বিশিষ্ট একটি "সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করা হয়। সংগ্রাম পরিষদের কার্যাবলী সমন্বয় ও গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৩টি উপকমিটি গঠন করা হয় যার একটি ছিল প্রতিবেশী দেশ ভারতের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে যেন সহায়তা পাওয়া যায়। এই উপকমিটির দায়িত্বে ছিলেন এ্যাডভোকেট বলরামগুহ ঠাকুরতা এবং আব্দুল রশীদ মোক্তার।

স্কুল কলেজ বন্ধ। অফিস আদালতে উপস্থিতির আগ্রহ নেই কর্মচারীদের। মাঝে মধ্যে ঠাকুরগাঁও রোড এলাকার চিনির কল এবং বিদ্যুৎ বিভাগ থেকেও মিছিল আসতো। তৎকালীন এমপিএ মোঃ ফজলুল করিম মোক্তার এর বৈঠকখানা হয়ে উঠেছিলো কন্ট্রোল রুম। এখান থেকে নেতৃবৃন্দের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ মোতাবেক মিছিলসহ জনতার ঢেউ গিয়ে আছড়ে পড়তো মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয়ের বটতলায়।

৪ মার্চ মিছিলে মিসেস এহিয়া রউফ এর নেতৃত্বে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল বেশ স্বতঃস্ফূর্ত যা পরবর্তী সময়ের আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিলো। এদিন ফুটবল মাঠে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে প্রতি থানা থেকে ৩০০ জন নেতাকর্মীকে ৭ মার্চের রেসকোর্সের জনসভায় যোগদানের জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ৫ মার্চ চৌরাস্তা ও পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে গণমজায়েতের পর রেলপথে বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের প্রায় ৫০০ নেতাকর্মী ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন।

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ রেডিওতে প্রচার না করা হলেও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাক ও গেড়িলা যুদ্ধের বার্তা লোকমুখে শোনা যায়। ৮ মার্চ রেডিওতে প্রচারিত ভাষণ শোনার পর শহর উত্তাল বিক্ষোভে গর্জে উঠেছিলো।

যারা ৭ মার্চ জনসভায় যোগ দিতে ঢাকা গিয়েছিলেন তাঁরা ফিরে আসেন ৯ মার্চ। একজন নিয়ে এসেছিলেন ঐতিহাসিক ভাষণের ক্যাসেট। এমপিএ ফজলুল করিম সাহেবের বৈঠকখানা থেকে মাইকে শুরু হয় ক্যাসেট বাজানো। সে সময়ের প্রেক্ষাপটে এ ছিল যেন এক জাদুর বাঁশি। মানুষ ছুটে আসছিলো আর শুনছিলো সেই ভাষণ। তারপর থেকে অবিরাম এই গতিধারা চলছিলো ।

ঐ দিনই ঠাকুরগাঁও কলেজের তৎকালীন ভিপি মোহাম্মদ আলীকে আহবায়ক করে একটি "সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি" গঠন করা হয়। এছাড়া কেবল ছাত্রলীগের কর্মীদের নিয়ে গঠন করা হয় 'জয়বাংলা' বাহিনী যার নেতৃত্বে ছিলেন আনসারুল হক জিন্নাহ। একই দিন এস.এম. আজিজুল হকের নেতৃত্বে গড়ে তোলো হয় আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।

www.pathagar.com

ঠাকুরগাঁওয়ের রাজনীতিতে মুসলিম লীগের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। তারপরের স্থান ছিল ন্যাপের। বিশেষ করে ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থক বেশি থাকায় কলেজ সংসদে যেমন প্রভাব ফেলেছিল তেমনি রাজনীতিতেও। এখানে প্রগতিশীল বামপন্থী রাজনীতিবিদ হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত রেজওয়ানুল হক চৌধুরী, ডাঃ আব্দুল মালেক ও এফ,এম মোহাম্মদ হোসেনের গ্রহণযোগ্যতা ও ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ৯ মার্চ তারিখে পল্টনে মাওলানা ভাসানীর জনসভার পর থেকে তাঁরা অনেকখানি তৎপর হয়ে উঠেন স্বাধীনতার পক্ষে। ফলে আন্দোলন আরো বেগবান হয়।

১০ মার্চ ঠাকুরগাঁও শহরের সর্বত্র কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের আহ্বানে হাই স্কুলের শিক্ষক এম. ইউসুফ এগিয়ে আসেন ছাত্র যুবকদের রাইফেল ট্রেনিং দিতে। তিনি ছিলেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। রোভার স্কাউট এবং ইউ.ও.টি.সি.ক্যাডেটদের জন্য নির্ধারিত ৫০ টি ডামি রাইফেল দিয়ে শুরু হয় প্রশিক্ষণ। সকালে হাই স্কুল মাঠে এবং বিকেলে পাবলিক লাইব্রেরির মাঠে প্রশিক্ষণ চলে প্রায় ২০০ ছাত্র-যুবকের।

১১ মার্চ বৃহস্পতিবার, তৎকালীন এমপিএ এ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম ঢাকা থেকে ফিরে জনতার মিছিলে যোগ দেন এবং তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক তসলিম উদ্দিন আহমেদকে ছাত্র-জনতার সাথে একাত্ম হয়ে আন্দোলনের গতিশীল ও সার্বিক সহযোগিতা করতে আহবান জানান। ৭ মার্চের ভাষণের পর দেশের প্রায় জেলখানাই খুলে দেওয়া হয়েছিলো কয়েদীদের বের হয়ে আন্দোলনে শরীক হতে। তারই ধারাবাহিকতায় ঐদিন ঠাকুরগাঁওয়ের জেলখানা খুলে দেওয়া হয় এবং কয়েদিরা অনেকে আন্দোলনে শরীক হয়।

১২ মার্চ মহিলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস এহিয়া রউফ এর নেতৃত্বে মহিলাদের একক মিছিল বের হয়। মিছিলে সৈয়দা জাহানারা, শক্তি বর্ধন, দীপ্তি বর্ধন, মাস্তি রাণী ঘোষ, লায়লা শামীম রোজী, কামরুন্নাহার জলি, মিসেস ফরিদা লতিফ, রুবি, মঞ্জু ইসলাম, ছবি সেন গুপ্তা, ভারতীয় গুহ ঠাকুরতা, উষাদি, শরীফা সাত্তার, কালী বাবুর স্ত্রী ও গোসাইবাবুর স্ত্রী অক্লান্ত পরিশ্রম করে মহিলাদের সংগঠিত করেছিলেন। মহিলাদের হাতে ছিল দা, বটি ও ঝাড়ু। ভাবতে অবাক লাগে মহিলাদের এই মিছিলে স্থানীয় উপজাতি মহিলারাও তীর ধনুক হাতে অংশ নিয়েছিল।

১৫ মার্চ প্রকাশিত 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর একটি বিবৃতি ও দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য জারীকৃত ৩৫টি বিধির আলোকে ঠাকুরগাঁওয়ের সকল সরকারি আধা সরকারি অফিস আদালত এবং ব্যাংক-বীমা তাদের কাজ চালাতে শুরু করে।

১৬ মার্চ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন রাইফেল ট্রেনিং, গণজমায়েত, মিছিল এবং বিকেলে পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে জনসভা ও সন্ধ্যায় দেশাত্মবোধক গান, গণসংগীত ও বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-ছাত্রী ও সংগীত শিল্পীগণ এতে অংশ নিয়েছেন।

www.pathagar.com

এদিকে ২৩ মার্চকে সামনে রেখে ব্যাপক তোড়জোড় শুরু হয় বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত নতুন পতাকা তৈরি করে উড়ানোর। ফালু খলিফার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ৬/৭ দিনেই তৈরি হয়ে যায় প্রায় ১০০০ পতাকা। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এসব পতাকার কাপড় সরবরাহ করেছিলেন।

একই সাথে মহকুমার অন্য ৯টি থানাতেও আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করেছিলো। স্থানীয় প্রগতিশীল ও স্বাধীনতার স্বপক্ষের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিজেদের এলাকায় জনমত গঠন, মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন। ঠাকুরগাঁও শহর থেকে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এসব সমাবেশে গিয়ে ভাষণ দিয়েছেন।

২২ মার্চ স্মরণকালের সর্ববৃহৎ গণমিছিল বের হয়। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, কৃষক সমিতির সকল অঙ্গসংগঠন, ঠাকুরগাঁও সুগার মিল, ওয়াপদার শ্রমিক সংগঠনের নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষ এতে অংশ নেন। সন্ধ্যায় বের হয় মশাল মিছিল। রাতেই বিতরণ করা হয় নতুন পতাকা।

২৩ মার্চকে আগেই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিলো 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালনের। ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। এস. এম আসগর আলী এবং জর্জিসুর রহমান খোকাসহ বিপুল সংখ্যক ছাত্রজনতা ২৩ মার্চের সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয়ে পতাকা উড়ানোর প্রত্যয় নিয়ে রাত কাটান ফজলুল করিম সাহেবের কাচারিতে। প্রত্যুষে দলবল নিয়ে মিছিল সহকারে রেজাউল হক বাবুলসহ তিনজনে মিলে মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয়ের উপর পতাকা উত্তোলন করেন। নিচে অগণিত মানুষ। এরপর থানা ভবনে গিয়ে পতাকা উত্তোলনে অবাঙালি প্রহরী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলেও তৎকালীন ওসি আবদুল গফুর নিজেই পতাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা নেন।

২৪ মার্চের গণ মিছিল ও গণজমায়েতসহ সর্বত্র শোভা পাচ্ছিল নতুন পতাকা। ২৫ তারিখে মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয়ে কে যেন পাকিস্তানি পতাকা উড়িয়েছিলো এবং পরে তা নামিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল উত্তেজিত জনতা। সেখানে পুনরায় টাঙানো হয়েছিল বাংলাদেশের পতাকা।

২৬ মার্চ সকাল থেকেই ঢাকার সাথে টেলিযোগাযোগ সম্ভব হচ্ছিলো না। মিছিল মিটিং আগের মতোই চলছিলো। আকাশবাণী, বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার খবর অবগত হয়েছিল সবাই। ২৫ মার্চের অপরাশেন সার্চলাইট শুরু হবার পর থেকে বাঙালি নিধন ও আন্দোলন নস্যাত করতে পাকিস্তানি শাসকদের কার্যক্রম প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পায়। শাসকগোষ্ঠীর অধীনে সেনাবাহিনী, তৎকালীন ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত বাঙালি ও অবাঙালিদের পৃথিকীকরণের কার্যক্রম চলে। এরই ঢেউ এসে লাগে ইপিআর এর দিনাজপুর সেক্টরের অধীনে ঠাকুরগাঁওয়ের ৯ম উইংয়ের বাঙালিদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো অফিসার ছিলেন সুবেদার মেজর কাজিম উদ্দিন এবং সাধারণ সিপাহিদের সিংহভাগই ছিলেন বাঙালি।

সত্তরের নির্বাচনের সময় থেকে প্রচুর সামরিক সভা নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২৬ তম এফ.এফ এর একটি কোম্পানি দিনাজপুর সার্কিট হাউজে অবস্থান করছিলো।

www.pathagar.com

তাঁরা বাংলাদেশে যোগাযোগের জন্য কুঠিবাড়ি ইপিআর ক্যাম্পে একটি শক্তিশালী ওয়্যারলেস সেট স্থাপন করেছিলো। ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকে অবাঙালি এসব অফিসার ও জোয়ানদের গোপন তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছিলো।

২৫ মার্চ মেজর মোহাম্মদ হোসেন ছিলেন পঞ্চগড় এলাকার সীমান্ত চৌকি পরিদর্শনে। দিনাজপুর সেক্টরের জরুরি বৈঠকে যোগ দেন ক্যাপ্টেন নাবিদ আলম। বৈঠকটি হয় অত্যন্ত গোপনীয় এবং সেখানে বাঙ্গালি অফিসার ও জোয়ানদের ভৎর্সনা করা হয়। ২৬ মার্চ সকালে মেজর মোহাম্মদ হোসেন ও ক্যাপ্টেন নাবিদ আলম একত্রিত হয়ে উইং-এর সকল জেসিওদের মিটিং ডাকেন। মেজর সাহেব সমবেত সবাইকে পাকিস্তান সরকারের জারীকৃত আদেশ পাঠ করে শোনান ও বাঙালিদের আন্দোলনের প্রতি কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখেন। মনে মনে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোনো বাঙালি জেসিও কোনো কথা বলতে পারেননি। তাদের কাছে বাইরের পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ন অজানা।

উইং কমাণ্ডারের নির্দেশে ইপিআর-এর টহল শুরু হয়। জনতা রাস্তায় রাস্তায় বেরিকেড দেয়া শুরু করে। ইপিআরদের টহল গাড়ীতে এদিন বাঙালি ও অবাঙালি উভয়ই ছিলো। বেরিকেড সরিয়ে তাদের টহল চলছিলো। ২৬ তারিখ সন্ধ্যায় মাইকিং করে সমস্ত শহরে সান্ধ্য আইন বা কার্ফ্যু জারি করা হয়। কিন্তু কে শোনে কার নির্দেশ। উত্তাল জনতা কার্ফ্যু ভঙ্গ করে মিছিল বের হয়। কিন্তু ঢাকার সাথে কোনো যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছিলো না নেতৃবৃন্দের। অনেকের মুখে শোনা যাচ্ছিলো সংগ্রাম পরিষদের অব্যবস্থার কথা। এ সময় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ২৬ মার্চ সবার রাত কাটে ভীতিকর অবস্থায়। তবুও রফিউল এহসানের বাসায় রাতে নেতৃবৃন্দ গোপনে বৈঠকে বসেন ।

পরদিন ২৭ মার্চ কার্ফ্যু ভঙ্গ করে যথারীতি জনতার ভিড় সমবেত হয় ফজলুল করিম সাহেবের কাচারির বা কন্ট্রোল রুমের সামনে। সেখান থেকে বের হয় মিছিল। সাউথ সার্কুলার রোড (চৌরাস্তা থেকে বালী বাড়ি মোড় পর্যন্ত) ধরে মিছিল এগিয়ে চলে কালীবাড়ির দিকে। অন্যদিকে ইপিআর ক্যাম্প থেকে একটি জিপে করে শহরের পরিস্থিতি দেখতে বের হয় মেজর মোহাম্মদ হোসেন, সুবেদার মেজর কাজিম উদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন নাবিদ আলম। তাদের পেছনের পিকআপ গাড়িতে ছিল ৮/১০ জন ইপিআর। একদিকে মাইকে ৭ মার্চের ভাষণ অন্যদিকে মিছিলের বিভিন্ন শ্লোগানের এক পর্যায়ে কেরামত আলী মোক্তার সাহেবের বাসার সামনে আসে মিছিল। এখানে মুখোমুখি হয় মেজরের জিপ, টহলদার পিকআপের ইপিআর এবং জনতার।

ঠাকুরগাঁওয়ের তৎকালীন সিও ডেভ (যিনি ১৯৭০ থেকে ঠাকুরগাঁওয়ে কর্মরত ছিলেন) আবদুল ওহাব আম্ধার মানিক ১৯৭২ সালে তাঁর 'অমর কাহিনিকার' নামক গ্রন্থে 'শহীদ মোহাম্মদ আলী সড়ক' নামক সংবেদনশীল নিবন্ধে লিখেছেন- "বেলা ১২ টা বেজে ১০ মিনিট। কেরামত আলী মোক্তার সাহেবের বাসার সামনে মিছিলটি এসে থেমে গেল। দক্ষিণ দিক থেকে দ্রুতবেগে ধেয়ে আসছিল একটি জিপ ও এক লরি সৈন্য। মেজরের জিপটা এসে সামনে থামলো। উইং কমাণ্ডার মেজর মোহাম্মদ হোসেন ও ক্যাপ্টেন নাবিদ আলম জিপ থেকে নামলেন। তাদের দেখে মিছিলে অংশগ্রহণকারী

www.pathagar.com

জনতা যেন বারুদের মতো জ্বলে উঠলো। মিছিল থেকে অসীম সাহসী, বলিষ্ঠ দেহী, মুখে চাপদাড়ি মধ্য বয়সের মোহাম্মদ আলী নামের এক রিকসাচালক সবার সামনে চলে আসে। মেজর মোহাম্মদ হোসেনের সামনে গিয়ে দৃপ্ত ও অকুতোভয় স্পষ্ট আওয়াজে চিৎকার দিয়ে ওঠে; 'জয়বাংলা'। সাথে সাথেই পরপর তিনটা গুলির শব্দ হলো। একটা বিকট চিৎকার দিয়ে লুটিয়ে পড়লো তাঁর দেহ। "ঠাকুরগাঁওয়ের প্রথম শহীদ মোহাম্মদ আলী।" গাড়ীতে উঠে মেজর তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে ইপিআর ক্যাম্পে ফিরে গেল।

পাঞ্জাবি মেজরের এমন বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডে তাৎক্ষণিকভাবে মিছিল ও জনগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেও কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার জড়ো হলো। খবর ছড়িয়ে পড়লো গোটা শহরে। জনতা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। এবার সিদ্ধান্ত হলো ইপিআর ক্যাম্প আক্রমণের। শহীদ মোহাম্মদ আলীকে রাস্তার পূর্বপাশেই দাফন করা হলো। মেজর মোহাম্মদ হোসেন ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য সুবেদার মেজর কাজিম উদ্দিনের নেতৃত্বে তিন লরি ইপিআর প্রেরণ করে। সে সময় শোকে বিহ্বল জনতার মিছিল ধেয়ে চলছিলো ইপিআর ক্যাম্পের দিকে। অবস্থার ভয়াবহতা চিন্তা করে কাজিম উদ্দিন নিচে নেমে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় সামনের সারির কয়েকজন নেতার সাথে কথা বলেন এবং তাদের পরিকল্পনা ও পরিস্থিতির বর্ণনা দেন। জনতা শান্ত হয়। মিছিল আবারো ফিরে আসে। রাস্তায় রাস্তায় বড়ো বড়ো গাছ কেটে বেরিকেড তৈরি হয়। সন্ধ্যায় আবারো কার্ফ্যু জারী করা হয় মাইকে। ক্যাম্পের মধ্যে সুবেদার মেজর কাজিম উদ্দিন গোপন আলোচনায় বসেন সুবেদার হাফিজ, সুবেদার আতাউল, নায়েব সুবেদার মতিউর রহমান, হাবিলদার আবু তালেব ও নায়েক আব্দুল হাকিমকে নিয়ে।

২৮ মার্চ রোববার। প্রচণ্ড রোদের মধ্যেও আবারো মিছিল- বিক্ষোভ। মিছিল গিয়ে জনসভায় রূপ নেয় ঠাকুরগাঁও হাই স্কুল মাঠের অশ্বত্থ তলায়। এফ.এ মোহাম্মদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ভাষণ দেন আসগর আলী, আনোয়ার হোসেন, জর্জিসুর রহমান, রেজাউল হক, বজলার রহমান, আবদুল লতিফ মোক্তার, আবদুর রশীদ মোক্তার এবং সিরাজুল ইসলাম এমপিএ। জনসভায় ঘোষণা করা হয় আজ থেকে কন্ট্রোলরুম করা হলো- এসডিও অফিসের সামনের বটতলায় দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট একটি টালির ঘরকে। মিটিং শেষে মিছিল করে জনতা সেখানে যায়। তখন বেলা ৩টা। ইপিআরের একটি টহল গাড়ি গোয়াল পাড়ার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলো। গাড়ি দেখে পশ্চিম পাশে একটি কুঁড়ে ঘর থেকে একটি ৭/৮ বছরের শিশু চিৎকার দিয়ে উঠেছিল 'জয়বাংলা'। চিৎকারের শব্দ লক্ষ্য করে টহল গাড়ি থেকে রাইফেলের গুলি ছোড়া হলে ঘটনাস্থলে নিহত পাড়ার সন্তুকী চৌহানের শিশু পুত্র নরেশ চৌহান-পাঁচ মিনিট আগেই যে শিশুটি রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি করছিলো। নরেশ চৌহানকে ধর্মীয় মতে সৎকার করারও সাহস হয়নি তাদের। ভয়ে কেউ এগিয়েও আসেনি। দ্রুত বাড়ির সামনে রাস্তার পূর্বপার্শ্বে তাকে সমাহিত করা হয়।

এ ঘটনায় শহরবাসী আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ অনেকখানি মুষড়ে পড়েছিলেন। তবুও তাঁরা যোগাযোগ করেন সুবেদার মেজর কাজিম উদ্দিনের সাথে। অন্যদিকে মেজর মোহাম্মদ হোসেন ও ক্যাপ্টেন নাবিদ আলম, অবাঙালি ইপিআরদের নিয়ে গোপনে বৈঠক করে রাত পৌনে এগারোটায় সমস্ত বাঙালি

www.pathagar.com

সৈন্যদের হত্যা করার পরিকল্পনা করে। এ খবর টের পেয়ে যান সুবেদার হাফিজ। ফলে তাঁরাও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পাঞ্জাবিদের আক্রমণের আগেই আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত অবাঙালি ইপিআরদের হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সেভাবেই কাজ হতে থাকে।

রাত ১০ টা ১৮ মিনিট। পরিকল্পনা মোতাবেক সুবেদার হাফিজের স্টেনগানটা গর্জে ওঠার সাথে সাথেই অন্যান্য সব বাঙালি সেনাদের কাছে রক্ষিত হাতিয়ারগুলো গর্জে ওঠে। ভীত হয়ে পড়ে শহরের সাধারণ মানুষ। কিন্তু যখন শোনা গেল 'জয়বাংলা' শ্লোগান এবং সাধারণ মানুষকে এগিয়ে এসে সহায়তা করার উদাত্ত আহবান তখন মানুষ ছুটে এলো রাতের অন্ধকারসত্ত্বেও। জনগণ তাদের সাধ্যমত খাবার ও পানি নিয়ে এগিয়ে আসেন। এভাবে সারারাত পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের দোসর অবাঙালদিের খুঁজে খুঁজে হত্যা করা হলো। পরের দিন খোচাবাড়ীতে সস্ত্রীক ক্যাপ্টেন নাবিদ আলমকে এবং ৩০ মার্চ তারিখে সস্ত্রীক মেজর মোহাম্মদ হোসেনকে তার বাংলোতে হত্যা করা হয়।

২৫ মার্চ রাতের ঘটনার পর আন্দোলন ও সশস্ত্র সংগ্রামের কেন্দ্র বিন্দুতে চলে আসেন সুবেদার মেজর কাজিম উদ্দিন। তিনি সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে বসেন ২৯ তারিখে। সামনের দিনগুলোর ভয়াবহতা এবং সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে সাজোয়া বাহিনী ও আকাশ পথে বিমান আত্রমণের সম্ভাব্যতা সকলকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলে।

২৯ মার্চ চারিদিকের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়ে যে সমস্ত সামরিক ও আধাসামরিক সেনাসদস্য ছুটিতে ছিলেন বা যারা পালিয়ে বেঁচেছেন তাঁরা এসে যোগ দিলেন কন্ট্রোলরুমে। একটি নিয়মিত বাহিনীর মতো করে অগ্রগামী দল হিসেবে প্রতিরক্ষা যুদ্ধের জন্য কৌশল রচনা করা হলো ভাতগাঁও ব্রিজের কাছে। সে পর্যন্ত রাস্তার পাশ ধরে পরিখা খনন ও গাছ কেটে বেরিকেড তৈরির কাজ চলে পুরোদমে।

আবারো শুরু হলো রাইফেল ট্রেনিং। এবার আর ডামি দিয়ে নয়। এবার মূল রাইফেল দিয়ে। ইপিআরদের অস্ত্রগারের সমস্ত হালকা অস্ত্র একদিনের মধ্যে চলে আসলো সাধারণ মানুষের হাতে। বিওপিতে কর্মরত অবাঙালি ইপিআরদের নিরস্ত্র ও হত্যা করা হয়। এ ক্ষেত্রে মির্জা আলমগীর ও মির্জা বাবলুর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। প্রতিরক্ষা ব্যূহতে নিয়োজিত মুক্তিযোদ্ধা ও এদিকে যারা সারা দিনব্যাপী ট্রেনিং দিচ্ছিলো, পরিখা খনন করছিলো, বেরিকেড সৃষ্টিসহ বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত ছিল তাদের যথাসময়ে খাবার সরবরাহের জন্য ২টি লঙ্গরখানা খোলা হয়। ডিফেন্সের জন্য খাবার তৈরি হয় ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা বিদ্যালয় মাঠে। যারা দায়িত্বে ছিলেন নূরুল ইসলাম ছুটু ও ফনি পালিত অন্যটি স্থাপিত হয়েছিলো সাধারণের জন্য সিরাজদ্দৌলা সড়কের বেলতলায়। অবস্থা আঁচ করতে পেরে ঐদিনই আওয়ামী লীগ নেতা আকবর হোসেন ও জগন্নাথ গুহ ঠাকুরতা মোটর সাইকেলে তেঁতুলিয়া হয়ে চলে যান শিলিগুড়ি। বাংলাবান্ধার ওপর ফুলবাড়িয়ার কংগ্রেস নেতা চণ্ডী বাবুকে নিয়ে তাঁরা তৎকালীন মন্ত্রী অরুণ কুমার মৈত্রের বাসায় দেখা করে সঠিক অবস্থা বর্ণনা করেন। সেখানে তখন তেঁতুলিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কামরুল হোসেনের সাথে দেখা হয়। তিনজনে মিলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

www.pathagar.com

করে সহায়তার আবেদন জানান। ভারতীয় লোকজন স্থানীয়ভাবে 'মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রাম সহায়ক কমিটি' গঠন করে এক ট্রাক ভর্তি লবণ, কয়েক ড্রাম তেল, চিনি, সিগারেট, ব্যাটারি, ডাল ও সাবান সাহায্য হিসেবে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

অন্যদিকে দিনাজপুরের কুঠিবাড়ির ৮ নম্বর উইং-ও বাঙালিদের দখলে আসে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে। ফলে ঠাকুরগাঁও দিনাজপুরের বাঙালি সেনা অফিসারেরা ও একত্রে সৈয়দপুর সেনানিবাস থেকে সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার উপায় খুঁজতে থাকলেন।

বিকেলে আব্দুর রশীদ মোক্তার ও বলরাম গুহ ঠাকুরতা কলকাতা রওয়ানা হয়ে যান সহায়তা প্রাপ্তির আসায় এবং সুবেদার মেজর কাজিম উদ্দিন চলে যান ভারতের ৭৫ বিএসএফ কমাণ্ডের কর্ণেল ব্যানার্জীকে এগিয়ে আসার আমন্ত্রণ জানাতে।

১ এপ্রিল : কর্ণেল ব্যানার্জী ঠাকুরগাঁও আসেন। সিরাজুল ইসলাম এমপিএসহ তিনি শিবগঞ্জ বিমান ঘাটি, ইপিআরদের অগ্রবর্তী ঘাঁটি পরিদর্শনসহ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেন। বিদ্যুৎ বিভাগের প্রকৌশলী মিঃ রেজা নিজেই ১০ মাইলে স্থাপিত পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন স্টেশনের টাওয়ারে উঠে বিদ্যুৎবাহী তার বিচ্ছিন্ন করে দেন। আবুল হাসনাত ভোলার নেতৃত্বে ঠাকুরগাঁও সুগারমিলের শ্রমিকদের সহায়তায় জনগণ শিবগঞ্জ বিমান বন্দরের রানওয়েতে বড়ো গাছ কেটে ফেলে রাখেন।

২ এপ্রিল : শুক্রবার পাবলিক লাইব্রেরির মাঠে রাইফেল চালনা প্রশিক্ষণকালে সেখানে এসে সবার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর এম.টি. হোসেন। এদিক থেকে তিনিই যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে যান। কজিম উদ্দিন তার সহকারী হয়ে থাকলেন। এতে প্রতিরোধ ব্যবস্থায় জীবন ফিরে আসে। সৈয়দপুর সেনানিবাস থেকে পালিয়ে আসা বাঙালি অফিসার ক্যাপ্টেন আশরাফ ও ক্যাপ্টেন আনোয়ার যোগ দেন দিনাজপুর উইং এর সাথে। ক্যাপ্টেন আশরাফকে ঠাকুরগাঁও উইং এর সাথে যোগ দিতে মির্জা আলমগীর দিনাজপুর যান।

৩ এপ্রিল : শনিবার মেজর এম.টি হোসেন স্থানীয় ডাকবাংলোতে যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত তাঁর অফিস স্থাপন করেন এবং অধীনস্ত জেসিও এনসিওদের দায়িত্ব বন্টন করেন। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ হয়। এলাকার যাবতীয় কার্যক্রম নিয়ে উর্দুতে লেখা একটি চিঠি ধরা পড়ার প্রেক্ষিতে এদিন সবচেয়ে অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে। অবাঙালি জনৈক লোকের হাতে প্রাপ্ত চিঠিতে সব গোপন তথ্য ছিল যা নাকি সৈয়দপুর সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। ফলে অবাঙালি হত্যা শুরু হয়। যা চলে পরবর্তী দুই দিন।

এরপর থেকে ভীতিকর অবস্থা নেমে আসে পুরো শহরে। অবাঙালিদের বাড়ি ঘরের সমস্ত মালামাল এনে জমা করা হয় আদালত প্রাঙ্গণের কন্ট্রোল রুমে। এখাকার সঠিক ইনচার্জ কে ছিলেন আর শেষ অবধি কি কি মালামাল পাওয়া গিয়েছিলো তার কোনো সঠিক হিসাব বা তথ্য কেউ পরবর্তীতে দিতে পারেননি।

৪ এপ্রিল : রবিবার থেকে সাধারণ মানুষ আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। একদিকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার যেমন কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিলো না অন্যদিকে অবাঙালি

www.pathagar.com

নিধনের জের কিভাবে কার উপর এসে পড়বে তা নিয়ে সবাই আলোচনা করছিলো। আগের দিনের চেয়ে আদালত প্রাঙ্গনে উৎসুক জনতার ভিড় কম মনে হলো। এদিন থেকেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাদের পরিবার পরিজন শহর থেকে গ্রামের দিকে সরিয়ে দিতে শুরু করেন।

৫ এপ্রিল : সকাল ১০-০০ টা নাগাদ শহর ছিল প্রায় ফাঁকা। রাতাঁরাতি অধিকাংশ শহরবাসীই তাদের আত্মীয়-স্বজনদের গ্রামীণ এলাকায় সরিয়ে দিয়েছে বলে জানা যায়। অন্যদিকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বেশকিছু গুজব ছড়িয়ে পড়ে যা ভীতিপ্রদ। ডাকবাংলো থেকে নির্দেশ পেয়ে মাইকে ঘোষণা করা হয় যে, যাদের কাছে রাইফেল আছে তাঁরা যেন তা ডাকবাংলোতে জমা দিয়ে এন্ট্রি করে নেন এবং যুদ্ধে যোগদান করেন।

৬ এপ্রিল : এদিন অবস্থা ছিলো আরো নাজুক। কন্ট্রোল রুম খোলার জন্য কোনো দায়িত্ববান লোকও পাওয়া যাচ্ছিলো না। শহরের দোকানপাট বাড়িঘর পাহারা দেবার জন্য যারা রাতে ছিলেন তাঁরাও আদালত প্রাঙ্গণে আসতে আসতে দুপুর করে দিয়েছেন। সবার চোখে মুখে ছিল আতংক। ঢাকাসহ অন্য কোনো জায়গায়ই কোনো সঠিক খবর কেউ দিতে পারতো না। রাতে বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা এবং আকাশবাণীর সংবাদ ছিল মূল আকর্ষণ।

৭ এপ্রিল : বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে দিনটি স্মরণীয়। এদিন 'দৈনিক বাংলাদেশ' নামে একটি সংবাদপত্রের প্রকাশ ঘটে। ঠাকুরগাঁও ওয়াপদার কর্মকর্তা কাজী মাজহারুল গুদা পূর্বের বেশ কয়েকদিনের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সময়ের তাগিদে জনগণের মনোবল বৃদ্ধি ও ফ্রন্টলাইনের খবরসহ মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বিশ্বজনমত তুলে ধরার ব্যাপারে বেশ কয়েকজনের সাথে আলাপ করেন। ফলশ্রুতিতে স্থানীয় সুলেখা প্রেস থেকে ১/৮ ডিমাই সাইজের ৪ পৃষ্ঠার ৫০০ কপি পত্রিকা ছাপানো হয়। মূল্য ছিল ১০ পয়সা। অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন, মির্জা আলমগীর, মুহম্মদ জালাল উদ-দীন, আবু ইয়াসিন, মনতোষ দে-সহ বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবী এতে লিখেছেন। একটি সংখ্যার ব্যানার হেড ছিল 'গণচীন একটি কাগুজে বাঘ' যা আকাশবাণী থেকে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করেছিলেন ও পত্রিকাটির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। রাত জেগে প্রুফ দেখা ও ছাপিয়ে পরের দিন সকালে পাঠকের হাতে তুলে দিতে বেশ বেগ পেতে হতো। এভাবে পর পর ৬টি সংখ্যা বের করা হয়। পত্রিকাটির গ্রহণযোগ্যতা ছিল বর্ণনাতীত। ২য় সংখ্যা থেকে ১০০০ কপি ছাপানো হয়। পরবর্তীতে পত্রিকাটি পশ্চিমবঙ্গের ইসলামপুর শহর থেকে প্রকাশিত হয়। কবি আবুল হোসেন সরকারও কয়েকটি সংখ্যা সম্পাদন করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের এটিই প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র।

৮ এপ্রিল থেকে ১৪ এপ্রিল : এই সাতদিন ছিল শহরবাসীর সবচেয়ে উৎকণ্ঠার দিন। কয়েকজন ছাত্রনেতা ও কর্মী, কয়েকজন দোকানদার এবং ট্রেজারি ও থানা এলাকায় প্রহরী ছাড়া কেউ রাতে শহরে থাকেননি। সকাল হলে অবস্থা বুঝে সংবাদ নিয়ে তারপর টাঙ্গনের এপাড়ে শহরে ঢুকেছেন সবাই। এসব দিনগুলোতে শহরের ফাঁকা অবস্থা নিরসনে সকলকে নিজ নিজ গৃহে ফিরে আসার আহবান জানিয়ে মাইকে

ঘোষণা প্রচার করা হয় ও ফিরে না এলে বাড়িঘর বাজেয়াপ্ত করা হবে বলেও জানানো হয়।

১৪ এপ্রিল রাতে স্থানীয় : এ রাতে স্থানীয় 'ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান' এর ভোল্ট ভেঙ্গে রাতে সমস্ত টাকা পয়সা ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। শহরবাসী এ খবর জানতে পারে ১৫ এপ্রিল। পয়সার বাক্সসহ দু'জনকে আটকও করা হয়েছিল। অবশ্য পরে সমস্ত ঘটনা জানা গিয়েছিল। তথ্যমতে জানা যায় এ টাকা পরবর্তীতে মুজিবনগর তহিবলে জমা হয়েছিল।

১৫ এপ্রিল : বেলা ১১-০০ টা। শহরে রাত যাপনকারী কয়েকজন লোক, কয়েকজন ছাত্র নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন আদালত প্রাঙ্গণে। গ্রাম থেকে লোকজন এখনো পুরোপুরি আসেনি। মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছিল পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে, আমাদের অগ্রগামী বাহিনী সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের কাছে পৌঁছে গেছে ইত্যাদি-ইত্যাদি।

হঠাৎ শহরের দক্ষিণ প্রান্তে বিকট শব্দে একটা শেলের বিস্ফোরণ হলো। মানুষ তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ছুটতে শুরু করলো উত্তর দিকে। সবারই এক উদ্দেশ্য-টাউন ছাড়তে হবে, টাঙ্গন নদীর ওপারে যেতে হবে। গ্রাম থেকে আরো প্রত্যন্ত এলাকা হয়ে সীমান্তে পাড়ি জমানোর উদ্দেশ্যে যাত্রার যাত্রী হয়ে পালাতে লাগলো সবাই। পিছনে তাকিয়ে অনেকেই দেখলো দাউ দাউ করে জ্বলছে এসডিও সাহবের বাংলো। গোটা শহরের আকাশে কেবল আগুনের কুণ্ডুলী।

নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে বালিয়াডাঙ্গী, আটোয়ারী, পঞ্চগড় ও হরিপুরের সীমান্ত এলাকা দিয়ে কয়েক হাজার মানুষ আশ্রয় নিলো ভারতীয় শরণার্থী শিবিরে। ২৫ মার্চের ২০ দিন পর ঠাকুরগাঁও শহর শত্রু কবলিত হলো। এদিকে সৈয়দপুর সেনানিবাসের সাজোয়া ইউনিট ও ট্যাংকের সামনে টিকতে না পেরে মুক্তিযোদ্ধারা একে একে পিছু হটে আসছিলো যা কেউই সাধারণ মানুষকে জানায়নি। সাধারণ মানুষ ছিল বেশ অসহায়। মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে হটতে পঞ্চগড়ে গিয়ে ডিফেন্স নেন। ২৯ এপ্রিল পঞ্চগড়ের পতন হয়। শেষ অবধি তেঁতুলিয়া থানার ভোজনপুরে চাওই নদীর ব্রিজ ভেঙ্গে দিয়ে উত্তর পাড়ে মুক্তিবাহিনী ডিফেন্স নিয়েছিলো। ভোজনপুর থেকে বাংলাবান্ধা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ৭৪ বর্গমাইলের তেঁতুলিয়া থানাটি ছিল সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত। চাওই নদীর ব্রিজ ভাঙা থাকার কারণে পাকিস্তানি সেনারা আর অগ্রসর হতে পারেনি। তাছাড়া জগদল, মাগুরমারী, অমর খানা এলাকা নিতান্তই সীমান্তবর্তী বিধায় নিরাপত্তার দিক দিয়েও তাঁরা এগুতে সাহসী হয়নি।

৭৪ বর্গমাইলের এই তেঁতুলিয়াকে ঘিরে গড়ে উঠেছিলো মুজিবনগর ভিত্তিক বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা। এখান থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করা হতো। বেশ কিছু দিন তেঁতুলিয়া ডাকবাংলোতে বসবাস করেছেন এম.কে বাশার। এখান থেকে আমার সম্পাদনায় প্রকাশ করা হয়েছিলো 'সাপ্তাহিক সংগ্রামী বাংলা' যা স্বাধীনতাত্তোরকালে ঠাকুরগাঁওয়ের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

এর পরের দিনগুলো প্রতিরোধের এবং সম্মুখ যুদ্ধের। অবরুদ্ধ শহরে খান সেনাদের সহায়তাকারী কিছু অবাঙালি ও মালদাইয়াদের কারণে বেশ কিছু হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। পীরগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা, কোসা রাণীগঞ্জের সালাহ উদ্দিন, ফাড়াবাড়িতে পানির কূপে শহর আলী বহর আলীসহ ১৮ জন, ভাতারমারি

www.pathagar.com

ফার্মের পাশে হত্যাকাণ্ডসহ খুনিয়া দিঘি, জাটিয়া ডাঙ্গা, ওয়াপদা ওয়ার্কশপ, পায়েন্দানা চৌধুরী পাড়া, রুহিয়ার রামনাথ হাটসহ বিভিন্ন স্থানের হত্যা ও গণ কবর এবং বাঘের খাচায় নির্যাতনের ভয়াবহ শিকার হয়েছে ঠাকুরগাঁওবাসী।

ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঠাকুরগাঁও জেলার লোকসংগীতের শিল্পী আর তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে দরিদ্রতা ও বিভিন্নমুখী সংকট মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। রূপান্তরের মধ্যেও বহুদিন সজীব থাকার উপাদান আছে এই লোকসংগীত শিল্পীদের জীবনে। ঠাকুরগাঁও জেলার লোকসংগীত শিল্পীদের জীবনকথায় সে সবেরই ইঙ্গিত রয়েছে। ঠাকুরগাঁও জেলায় যে সকল লোকসংগীত শিল্পী আছেন তাদের অন্যতম কিছু শিল্পীদের নিয়ে বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে এই অধ্যায়। জেলার সেসব লোকসংগীত শিল্পীদের মুখোমুখি হয়ে সরাসরি প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাদের জীবনের কথা এখানে উল্লিখিত হয়েছে যা জেলার লোকসংগীতের সাথে জড়িত লোকশিল্পীদের যাপিত জীবনের কথাকে বিশেষভাবে আলোচিত করেছে।

শ্রী যুক্ত বাবু রমেশ চন্দ্র রায়

রানীশংকৈল তথা ঠাকুরগাঁও জেলার অতি পরিচিত এক লোকশিল্পীর নাম। সকলেই তাকে রমেশ বাবু বলে ডাকে। মিষ্টভাষী হবার দরুণ হয়ে উঠেছেন সকলের প্রিয় মুখে। যন্ত্র শিল্পী হিসেবে সমস্ত জেলায় এখনও তার জুড়ি মেলা ভাড়। বাজাতে পারেন প্রায় সকল বাদ্যযন্ত্র। জন্মের পরপরই হাতে পড়েছে বাদ্যযন্ত্র। জীবনের শুরু থেকেই বাজাতেন তবলা, ঢোল খোল কঙ্গ এরপর মন্দিরা, করতাল, বাঁশি-কাশি ইত্যাদি প্রায় সব বাদ্যযন্ত্র। জন্ম থেকেই ভালোবাসতেন বাদ্য বাজাতে। মূলতঃ বাদ্য বাজিয়ে মানুষের মন জয় করলেও গায়ক হিসেবে তিনি ভালো গান করেন, সে কথা বলার সুযোগ নেই। জীবনের শুরুতে খেলার ছলে গান করে বেড়িয়েছেন গ্রামে গ্রামে। কিংবা পূঁজা ও বিভিন্ন উৎসবে মাগন করেছেন বাড়ি বাড়ি। আশেপাশের বন্ধুদের সাথে নিয়ে করেছেন সারীগান, নটুয়া, এমনকি যাত্রাপালা। দরিদ্রতার সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা এই মানুষটি জন্মেছিলেন ১৯৪৯ সালে বিনোদিনি রায়। বাল্য শিক্ষা শেষে পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৯ম শ্রেণি পাস করেন এবং প্রথম শ্রেণিতে মেট্রিক পাস করেন পশ্চিম বনগাঁ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে। বর্তমানে দুই ছেলে, চার মেয়ে ও স্ত্রী চানোপ বালা রায়কে নিয়ে চরম দারিদ্রের সাথে বসবাস করছেন তেঘরিয়া পল্লীর একমাত্র সম্বল জীর্ণ বাস্তুভিটায়। ছেলে মেয়ে সবার বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু দারিদ্রের কাষাঘাত থেকে তাঁরাও মুক্ত নন বলে পিতা মাতার জন্য তাঁরাও কিছু করতে পারেন না।

চোখের ছানি জনিত অন্ধত্বের কারণে বিগত ছয় বছর ধরে তিনি কিছুই দেখতে পান না এবং দেখতে পান না তার প্রিয় চেনা মুখ ও স্থানগুলোকে। তার এই সংকটাপন্ন জীবন দূরে সরিয়ে দিয়েছে মানুষের কাছ থেকে। অথচ এই মানুষটি কিনা জীবনব্যাপি গান করেছেন মানুষকে ভালোবেসে। তাই তার কণ্ঠে শোনা যায় অভিমানের ঝড়–

“একলা পড়ে আছি, এখন আগের মতো কেউ আসে না, দূরে সরে গেছে সবাই।”

www.pathagar.com

কিছু করতে না পাড়ার যন্ত্রণা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। হতাশ হয়ে উঠেন কেউ তার জন্য সাহায্যের হাত বাড়ায় না বলে। সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে কোনো সম্মানী বা ভাতা তার কপালে জুটেনি। দুস্থ শিল্পী হিসেবে তার ভাগ্য পরিবর্তনেও কোনো সফল উদ্যোগ আজও কেউ গ্রহণ করেনি। অথচ এই মানুষটি এক সময় প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে অনুষ্ঠান করে বেড়িয়েছে সমস্ত ঠাকুরগাঁও এলাকা জুড়ে। গানের পেছনে কে প্রেরণা যুগিয়েছেন জানতে চাইলে তিনি উচ্চারণ করেন প্রতিবেশী খর্গমোহনের নাম। যিনি পেশাদার যাত্রাশিল্পী ছিলেন। তারই হাত ধরে যাত্রা দলে ঝুঁকেপড়া। পরবর্তীকালে দেশের অনেক বড়ো বড়ো যাত্রাদলে কাজ করেছেন। যেমন পাবনার শীমা, অপেরা, মেঘদূত ইত্যাদি তবে গুরু হিসেবে মানে পাবনা জেলার বিশ্বনাথ মজুমদার ও রংপুর জেলার রমা কান্তকে। যৌবনে দেশের বিভিন্ন স্থানে যন্ত্রী ও শিল্পী হিসেবে যাত্রা দলে অংশ নিয়েছেন। একই সময়ে একই সাথে একাধিক যন্ত্র বাঁজিয়ে আসর মাতিয়ে রেখেছেন দিনের পর দিন। যা সাধারণ দর্শক শ্রোতার কাছে বিস্ময়ের খোড়াক যোগাত। এক সাথে একাধিক যন্ত্র বাঁজাতে দেখে ১৯৭৪ সালে এক অনুষ্ঠানে তৎকালীন পঞ্চগড় থানার OC সাহেব তাকে দুইশত টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন যা তাকে মাঝে মাঝে স্মৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। শিল্পী হিসেবে নটুয়া, বিষহরি, সত্যপীড়, সরীগান, যাত্রাপালা ও কীর্তন গান করেন। ১৯৮৫ সালে NGO ভিত্তিক RDRS ফেডারেশন খুললে তিনি তাতে কাজ করেন। তার নিজের তৈরি করা সরীগান জলসু পাগলা।

ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সংখ্যালঘু ইস্যুতে তাকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। ধর্মীয় দাঙ্গার সম্ভাবনা ও প্রভাব সেই সমাজে ভিন্নভাবে স্নায়ুযুদ্ধে রূপান্তরিত করেছে। ফলে সম্ভাব্য দাঙ্গার ভয় দেখিয়ে তৎকালীন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বন্ধুরা তাকে দেশ ত্যাগ করতে বলেছিল। কিন্তু এ দেশের মায়া তিনি ত্যাগ করতে পারেননি। তাই ১৯৬৭ সালে ভারতে গিয়েও ৯ মাস পর ফিরে এসেছেন মাতৃভূমির টানে। ভারতে অবস্থানকালেও ভুলতে পারেননি সাংস্কৃতিক চর্চা। নিজের রচিত জলসু পাগলা নামের একটি সরীগানের পরিবেশন করেন ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার মহিনিগঞ্জে। দুঃখজনক হলেও সত্য সেই গান না লিখে রাখা এবং চর্চার অভাবে তা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

গান করতে গিয়ে তাকে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র থেকে জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে। যেমন- কোরআন, হাদিস, গীতা, পুরান, উপনিষদ ইত্যাদি। এখন সেগুলো অনেকটা বিস্মৃত হয়ে গেছে। গান করতে গিয়ে কোনো বাঁধার সম্মুখীন হয়েছিলেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন– তেমন বাঁধার সম্মুখীন হইনি। তবে অনেকের সাথে গানের বিষয় নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

অর্থনৈতিক জীবনের কথা বলতেই তিনি টেনে আনেন অতীতকে। জানান যে, অতীতে তার চাষযোগ্য প্রায় ১৮ বিঘা জমি ছিল। এক সময় ইউনিয়ন কাউন্সিলের জমির খাজনা তুলে দিতেন যা থেকে তৎকালীন পঞ্চাশ থেকে একশত টাকা আয় হতো। বর্তমানে তিনি অন্যের জমি বর্গা হিসেবে ছেলেদের দিয়ে ফসল ফলান। নিজস্ব

www.pathagar.com

জমি সবই বিক্রি হয়ে গেছে। বর্তমানে তিনি অন্ধ (প্রায় ছয় বছর) জীবনের সায়াহ্নে অর্থনৈতিক চরম কষ্টে দিনাতিপাত করছেন। জীবনে পাননি কোনো স্বীকৃতি, দুস্থ শিল্পী হিসেবে পাননি সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের কোনো অর্থ সাহায্য। তাই অন্ধত্ব ও দরিদ্রতা তার নিত্যদিনের সংগী।

বর্তমানে কি নিয়ে আছেন জানতে চাইলে কীর্তন গানের কথা উল্লেখ করেন। ভবিষ্যতেও এই কীর্তন গান করে ও বাদ্য বাঁজিয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে চান। গলায় গুরুদেবের দেওয়া কণ্ঠ ব্যবহার করলেও ধর্মীয়ভেদ তাকে স্পর্শ করে না। তিনি জানান মানুষকে ভালোবাসাই তার প্রধান ধর্ম। সেজন্যই হয়ত তার শিল্পী জীবনের প্রত্যাশাপ্রাপ্তিও হয়ে উঠেছে মানুষ। জনপ্রিয়তার কারণ জানতে চাইলে তিনি যা বললেন তা রীতিমত বিস্ময়কর—"রানীসংকৈলে গিয়ে এক কাপ চাও কিনে খেতে হয় না, এত মানুষের ভালোবাসা আমাকে স্বর্গসুখ এনে দেয়।

তিনি প্রকৃতপক্ষে সংস্কারমুক্ত এক অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ। ভালোবাসেন দেশ ও দেশের মানুষ। এক সময়ে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন করা এই মানুষটি সোনার বাংলার স্বপ্নকে বাস্তবে দেখতে চান। তিনি বিশ্বায়নের এই যুগেও নিজেদের সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। তাইতো যে কোনো সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরি হলেই সেখানে যথাসম্ভব ভূমিকা রাখতে চেষ্টা করেন।

লোকশিল্পী রমেশ চন্দ্র রায়

অন্ধ হলে কি প্রণয় বন্ধ থাকে। আমাদের লোকশিল্পী রমেশ চন্দ্র তখন অন্ধ। কিন্তু তাঁর সংগীত চর্চা বন্ধ হয় নাই। চোখের আলোয় ভূবনের মুগ্ধ করা অপরূপ সৌন্দর্য তার দৃষ্টির গোচর না হলেও ভেতরের আলো দিয়ে হাতের তাল দিয়ে আলোড়ন তুলতে তার জুড়ি মেলা ভার।

জীবনের শুরুতে রমেশ অন্ধ ছিলেন না, দৃষ্টি ছিল অসীম, প্রতিজ্ঞা ছিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ইন্দ্রের নৃত্যের ছন্দ, স্বরস্বতীর বীনায় ঝংকৃত করার প্রত্যয় নিয়ে সংগীতে প্রবেশ।

প্রাতিষ্ঠানিক কোনো তালিম নিয়ে নয়, বরং বলা যেতে পারে স্থানীয় দাইঘুরা গানের দলের সাথে ঘুরতে ঘুরতে একদিন লোকালয়ের প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের সবগুলো বাদ্য বাজাতে সিদ্ধ হস্ত হয়ে উঠলেন।

ঢোল, খোল, কঙ্গ, মন্দিরা, করতাল, বাঁশি-কাশি, ফুলেট, কর্ণেট এ ধরনের যন্ত্র বাজাতে পারার কারণে যে কোনো অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতি অনিবার্য হয়ে পড়ে।

রমেশ বাবুর বাবার নাম পদ্মলাল রায়। পিতার প্রথম এবং পুত্র সন্তান হওয়ায় পারিবারিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পড়ালেখাতে অবহেলা ছিল না। এস.এস.সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে ১৯৭৩ সালে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। স্থানীয় রানীশংকৈলকলেজে ভর্তি হলেও পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায় ৭৪-৭৫ সালের সারা দেশের মঙ্গার কারণে। সেই থেকে গানের প্রতি মনোযোগ সময় এবং রোজগারের পথ হিসেবে গানের গুরু মনমোহন, বনগা শিয়ালডাঙ্গী এর শিষ্য হয়ে গানে গভীরভাবে মনোনিবেশের ফলে খুব অল্পদিনেই বাদ্যভার হিসেবে দক্ষ হয়ে উঠলেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ৯০ দশকের পর থেকে চোখের অসুখ দেখা দেয়। চিকিৎসা বলতে যাতে কিছুটা অবহেলা,

www.pathagar.com

অনেকটুকু অর্থনৈতিক কারণে চোখের অসুখ আর ভালো হলো না। ভারতের মাদ্রাজ থেকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম সকল নেত্রালয়ে চিকিৎসা শেষে অবশেষে অন্ধত্ব বরণ। কোনো পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই রমেশ বাবু বাদ্য বাজিয়ে কোনো একদিন চলে যাবেন। সেদিন তার সকল যাত্রার বাদ্য বাজাবে কোনো এক আনকোড়া শিল্পী। যা সে বেঁচে থাকতে কোনো দিনই সহ্য করেননি।

লোকশিল্পী আব্দুল মালেক

প্রবাদ আছে আগুনকে ছাই চাপা দিয়ে রাখা যাবে না। আব্দুল মালেক রানীশংকৈল উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকা নেহেম্বা ইউনিয়নের চাপোড়-পার্বতীপুর গ্রামে ১৯৫৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা-মায়ের মুখ আলো করে ভাইবোনদের মধ্যে প্রথম এসেছিলেন ভূবনে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে পড়ালেখা করা প্রায় অসম্ভব। এমন সময় বাবার অদৃশ্য ইচ্ছায় পার্শ্ববর্তী কুলীক নদীর অপর পাড়ে রাউতনগর স্কুলে ভর্তি। স্কুলের জাতীয় সংগীতে অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সংগীত স্পৃহা জাগ্রত হয়। পরবর্তীতে রেডিওতে দুর্বার অনুষ্ঠান, আকাশবানীর অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে গানে কণ্ঠ মিলানো এবং গীত রচনার সাহস সঞ্চয় করে।

তিনি পড়ালেখায় শেষ পর্যন্ত এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি পাশ করেন, স্বাস্থ্য সহকারী হিসেবে রানীশংকৈল উপজেলার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত আছেন। এমন সময় রানীশংকৈল উপজেলা সদরে বৈশাখী মেলা কমিটির আমন্ত্রণ এবং T.N.O. হুমায়ন কবির মহোদয়ের অনুপ্রেরণাসহ নিবন্ধনের জন্য গান রচনার দায়িত্ব দিলে তিনি যে গান রচনা করলেন, তা নির্বাহী মহোদয়ের পছন্দ হয়। সেই থেকে গান লেখা, সুর দেওয়া এবং স্থানীয় লোকশিল্পী মাইকেলের ভরাট কণ্ঠে লোকসংগীত, জারীগান দারুন জনপ্রিয় উঠতে থাকে। এমন সময় আ: মালেক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে তার ডান হাতের কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। এখন লিখতে পারেন না, মুখে মুখে বলেন অন্য কেউ লেখেন, সুর দিতে পারেন, মাইকেলের কণ্ঠে তুলে দিতে এখনও উদ্যম হারাননি। এভাবেই আমাদের লোকশিল্পীদের জীবনে নেমে এসেছে কালো ছায়া।

এক.

ও মোর বড়ো ভাবী গে
ও মোর সোনার ভাবী গে
ওগে দশটা টাকা দে যাম মুই
বাঙ্কির বাজার॥
ওগে নেকমরদের পশ্চিম পাকে
গোরকই কান্দরত মেলা লাগছে
মুই যাছু তোর বহিনের তাহানে
ও মোর বড়ো ভাবী গে
ও মোর সোনার ভাবী গে
দেরি হলে তোর বহিনডা
যাবে গে বিগরে ॥
ওগে লোকলা কহে মোক আনা-ভুলা

www.pathagar.com

তোর বহিনে কহে বহা পাগলা
মোক কাথা কহে চোখের ইশারে
ও মোর বড়ো ভাবী গে
ও মোর সোনার ভাবী গে
টপ করে দে টাকালা মোক
বেলা যায় পড়ে ॥[৫]

দুই.

ফুলের নামে নাম রেখেছিলাম
ফুরে নামে তোমায় ডেকেছিলাম
ফুলের সুবাস যখন ছড়ালে তুমি
তখন তোমায় আমি হারালাম ॥
আজও উঠে রবি শশী
তাঁরাদের সাথে জ্বলে জোনাকি
তোমার সাথীরা সবে নানারূপ সাজ সেজে
গেয়ে যায় আনন্দের গান
(আর) আমি শুধু একা একা আঁখি ভিজালাম ॥
আজো বাজে বাঁশের বাঁশি
তার মাঝে খুঁজি তোমার হাসি
অভিমানী: অভিমানে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে
দিয়ে গেলে ধুপেরই ঘ্রাণ
(আর) কষ্টের মালাখানি আমি পরলাম ॥ [৬]

তিন.

এই বাংলার মেঠোপথে দেখেছো?
আমি দেখেছি।
যেখানে কুলিক নদীর ঘাটে
ছোটো গায়ে আমি চড়েছি ॥
যেখানে ঘাটের পাড়ে হাট বসেছে
যেখানে বটতলার মেলা জমেছে
যেখানে সবুজের প্রান্ত হয়ে
মেঘের ভেলা দেখেছি॥
যেখানে পল্লী বধু কলসি কাঁধে
জল আনতে যারা প্রকাশও সাঝে
যেখানে গোধুলীর লাল মঞ্চে
রাখাল বাজায় বাশরী।[৭]

কবি আবুল হোসেন সরকার রচিত "হামার জেলা ঠাকুরগাঁও" কবিতাটিতে ঠাকুরগাঁও জেলার সংক্ষিপ্ত চিত্র পাওয়া যায়-

হামার জেলা ঠাকুরগাঁও,
হামরা ঠাকুরগাঁও বাসী,

www.pathagar.com

হামার গাঁও ঠাকুরগাঁও,
উত্তর বাংলা সেরা গাঁও,
এ গাঁওকে হামরা ভালোবাসি,
জন্ম হামার মরণ হামার এ গাঁওয়ে,
পিতা-মহ মাতা-মহ হয়েছেন গত এ গাঁওয়ে,
হামরাও গত হমো এ গাঁও কে ভালোবাসি ॥
এ গাঁওয়ের ইতি কথা করি যে বর্ণন-
শুনেন শুনেন জ্ঞাণী-গুণী শুনেন সর্বজন,
ইতিহাসের কথা কভু হয়না যে বাসি ॥
এ গাঁওকে আমরা ভালোবাসি ॥
ঠাকুরগাঁওয়ে থানা হয় ব্রিটিশ শাসনকালে,
আক্‌চা ইউনিয়নে ইউনিয়নে সন আঠোরো-শ-সালে,
আক্‌চায় ছিল তখন প্রভাবশালী ঠাকুর বাড়ি ॥
নীচু ভূমি তাই থানা এলো মৌজা নিশ্চিন্তপুরে,
থানা হলো মহকুমা আঠারো শ ষাট সালে,
টাঙ্গন নদীর পাড়ে হলো মহকুমা শাসকের বাড়ি ॥
দিনাজপুর ছিল জেলা দিনাজপুরের অধীন,
ঠাকুরগাঁও থানা-মহকুমা ছিলো দীর্ঘদিন,
কাজে-কামে যাইতো মানুষ লয়ে গরুর গাড়ি ॥
ঠাকুরগাঁওয়ে তে-ভাগা আন্দোলন চল্লিশ দশকে
'হাল যার, জমি তার' 'শ্লোগান কৃষকের মুখে মুখে,
'আধি নাই, তিনভাগ চাই, ধান উঠিবে কৃষকের বাড়ি' ॥
তে-ভাগা নেতা গুরুদাস আর হাজী দানেশ,
'আসোবাহে' ঠাকুরগাঁওয়ে হবে এক বড়ো সমাবেশ,
লাখে লাখে কৃষক আসে হাতে দা-লাঠি, মিছিল সারি সারি ॥
কৃষক সমাবেশে গুলি চালায় ব্রিটিশ সেনারা,
ঝাকে ঝাকে কৃষক মরে লাশ গুম করে থানা,
আহতরা কেঁদে মরে গুলি খেয়ে কৃষক করে আহাজারি ॥
ঠাকুরগাঁও হলো জেলা সন উনিশ-শ চুরাশি,
হাতের কাছে জেলা পেয়ে লোকজন হলো খুশি,
ছোটো বড়ো চাকরি নিয়ে হলো কর্মকর্তা-কর্মচারী ॥
ঠাকুরগাঁও প্রাচীন মসজিদ ফতেপুর, বালিয়া,
দরগাশাহী, মহলবাড়ি, মেদেনীসাগর, গেদুড়া,
জামালপুর, সোনগাঁ, ইমামবারা, সালবাড়ি ॥
ঠাকুরগাঁওয়ে পীর-আউলিয়া-দরবেশগণ
ইসলাম প্রচারে যুগে যুগে করেছে আগমন,
মাজারে ভক্ত সমাগম আজও চিহ্ন আছে ধরি ॥

www.pathagar.com

ঠাকুরগাঁওয়ে শাহ্ মখদুম চিশতী (রাঃ) এর আছে মাজার,
হরিপুরে শাহ মখদুম জালাল (রাঃ), সৈয়দ বাহার (রঃ),
পীরগঞ্জে শেখ সিরাজউদ্দিন (রঃ), শাহ জাঁহা (রঃ) আর
নকমরদে সৈয়দ নাসিরউদ্দিন শাহ (রাঃ) এর মাজার আছে জারি ॥
ঠাকুরগাঁওয়ে প্রাচীন মন্দির ঢোলারহাট,
গোবিন্দনগর, হরিপুর মন্দির গোরক্ষনাথ;
ভেমটিয়া, নাককাটি, আর হরিণমারী ॥
ঠাকুরগাঁওয়ে প্রাচীন দূর্ঘ বাংলার গড়,
গড়গ্রাম, গড়ভবানী, মালদুয়ার,
আছে আরও কোরাম খান, গড়খাঁড়ি ॥
ঠাকুরগাঁওয়ে প্রাচীন কত রাজ প্রাসাদ
হরিপুরে, জগদলে, রাজমহলজাত,
আছে রাজভীটা রাজা টংকনাথের বাড়ি ॥
ঠাকুরগাঁওয়ে নদী টাঙ্গন, কুলিক ঢেপা,
শুক, তিরনই, নাগর, জুলেই, সেনুয়া,
আরও আছো ভুল্লী, পাথরাজ, চুরামাটি ॥
ঠাকুরগাঁওয়ে আছে দিঘি রামরাই, মেদিনী সাগর,
আঠারোগন্ডি, শাসলা, পিয়ালা, খুনিয়া, রাণীসাগর,
হরিণমদারী, আধার, টুকুলী, ঠাকুরদিঘি, কুমিল্লাহারী ॥
হরিপুরে আছে বিল-দামোল, লৌহচান্দ, যমুনা,
পীরগঞ্জে ধরধরিয়া, ধাতরা, জালুইখাল, লেহেম্বা,
রাণীশংকৈলে পামোল, কাশিপুর আরো আছে গড়গড়ি ॥
ঠাকুরগাঁওয়ে হাট গড়েয়া, ভুল্লী, শিবগঞ্জ,
যাদুরাণী, খোচাবাড়ি, কালমেঘ মাদারগঞ্জ,
নকমরদ, জাঠিভাঙা, রামনাথ, ফাড়াবাড়ি ॥
ঠাকুরগাঁর মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকা চিরস্মরণীয়,
মোহাম্মদ আলী, নরেশ চৌহান শহীদ বরণীয়,
তিন ডিসেম্বর স্বাধীনতা, মুক্ত শহর-গ্রাম-বাড়ি ॥
হামার গাঁও ও ঠাকুরগাঁও,
শস্য- শ্যামল হামার গাঁও,
এ-গাঁওকে হামরা ভালোবাসি ॥[৮]

গ্রাম নির্ভর বাংলাদেশের লোকায়ত সহজ সরল স্বাক্ষরহীন বিত্তহীন প্রাচুর্য নেই প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল নয় এমন লোকেরাই গ্রামীণ মানুষদের মাঝে প্রাণ সঞ্চার করে থাকে, কখনো গল্প বলে, কিসসা বর্ণনা করে স্থানীয় কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবিতা, গান রচনা ও সুর স্থাপন করে পরিবেশন করে থাকে, নিজস্ব ভাব-ভাষায় যা লোক সমাজে খুবই সমাদৃত হয়ে থাকে। এমন ব্যাক্তিটি গ্রামীণ আটপৌড়ে জীবনে গুণী ব্যক্তি। আমরা তাদের মধ্যে জনপ্রিয় লোকশিল্পীদের তালিকা উল্লেখ করছি।

www.pathagar.com

রমেশচন্দ্র রায় (অন্ধ)
বয়স : ৬২
বাবা : মৃত পদ্মনাম রায়
তেঘরিয়া, বল্লিয়ারা

ইলিয়াস বাউল
বাবা : আব্দুল বাসির
বয়স : ৪২
বল্লিয়ারা

পাহাড় সিংহ
মৃত. খোলারাম সিংহ
গোরকই
বয়স : ৬০

মলিন চন্দ্র রায়
বাবা : মৃত বুধু রাম চন্দ্র
বল্লিয়ারা
বয়স : ২৬

আ : হামিদ বয়াতি
বয়স : ৫২
পেশা : চা দোকানদার
বন্দর, রানীশংকৈল

আব্দুল মালেক
বয়স : ৫২
পেশা : পান বিড়ি দোকানদার

আনিসুর রহমান
বয়স : ৫৫
বন্দর, রানীশংকৈল
পেশা : পিয়াজ-মরিচের দোকানদার

ধীরেন মালাকার
বয়স : ৫২
গ্রাম : সিদলি

যাত্রী রাণী রায়
বয়স : ৪০
পেশা : কৃষাণী
নওগাঁও, বাংলাগড়

আষাঢ়ু রাম
বয়স : ৩৫
পেশা : দিনমজুরী
গ্রাম : ভাংবাড়ি

www.pathagar.com

অর্জুন রায় (দাইঘুরা গানের নায়ক)
বয়স : ৪৫
গ্রাম : ভাংবাড়ি

দধিরাম, লটুয়া গানের শিল্পী
বয়স : ৭০
গ্রাম : ভাংবাড়ি

খাটাস
বয়স : ৬৫
গ্রাম : ভাংবাড়ি
পেশা : দিনমজুর

বেতলা
বয়স : ৩৫
গ্রাম : বাচোর

ঘৃত বর্মন (বিষহরি গানের গাইন)
বয়স : ৪৮
গ্রাম : নন্দুয়ার

লালবাহাদুর
বয়স : ৪২
পেশা : বাদক
গ্রাম : বানিয়ারা

গোরকু
বয়স : ৪৮
পেশা : কৃষি
গ্রাম : নন্দুয়

তথ্যনির্দেশ

১. বাংলাদেশ টেলিভিশন ঠাকুরগাঁও সম্প্রচার কেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৬।
২. আ.কা.মোঃ যাকারিয়াঃ ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে বাঙলাদেশ পরিষদ আয়োজিত দিনাজপুর জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক সেমিনারে পঠিত 'সভাপতির ভাষণ।
৩. ড. নীহাররঞ্জন রায়ঃ বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা : পৃ-১২৩।
৪. সূত্র. জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ রচিত গ্রন্থ অবলম্বনে
৫. আ : মালেক (৫৫), পিতা : আলী মুদ্দিন, গ্রাম : বসতপুর, ইউনিয়ন : লেহেম্বা, পেশা : চাকুরি, উপজেলা : রানীশংকৈল, জেলা : ঠাকুরগাঁও।
৬. ঐ।
৭. ঐ।
৮. অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবুল হোসেন সরকার (৬৪), পিতা : মৃত- আজিম উদ্দিন সরকার, কবিতা কুটির, ইসলামবাদ ঠাকুরগাঁও।

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা

সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মাঝে ক্ষুদ্রদেহী প্রবালকীট যেমন করে তার দেহাবশেষ সঞ্চিত করে সুদীর্ঘ কাল ধরে ধীরে ধীরে গড়ে তোলে প্রবাল প্রাচীর ও প্রবালদ্বীপ যার সমুন্নত শীর্ষদেশ আমাদের বিস্মিত করে, তেমনি যুগযুগান্তর ধরে বয়ে চলা মানব সভ্যতার চলিষ্ণু ধারায় লোকায়ত মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা ঋদ্ধ বিপুলায়তন লোককথার ভাণ্ডারও আমাদের বিস্মিত করে। প্রবল প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে এই লোককাহিনির মধ্যে। বহতা এই ধারার বাঁকে বাঁকে মানুষের সুখ-দুঃখ, বেদনা-হতাশা, লাঞ্ছনা-বঞ্চনার কথা ফুটিয়ে উঠেছে। ঝংকৃত হয়েছে দানব, বৃহৎ, সবল ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মানব ক্ষুদ্র, দুর্বল, অত্যাচারীর বিজয় ঘোষণা।

মানব সভ্যতার চিরায়ত জীবন কাহিনির ফলিত সংস্কৃতির সহজিয়ারূপ লোকসংস্কৃতি। এই লোকসংস্কৃতিরই স্বতন্ত্র শাখা লোককাহিনি। বলা প্রয়োজন ইংরেজি 'ফোকটেল' শব্দটির ভাষান্তর করা হয়েছে- লোককথা বা লোককাহিনি। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে 'গদ্যের ভিতর দিয়ে যে কাহিনি প্রকাশ করা হয় ইংরেজিতে তাকেই সাধারণভাবে folktale বলা হয়। বাংলায় লোককথা বললে এই কথাটির যথার্থ অনুবাদ হয়, তবে সংক্ষেপে এটি কেবলমাত্র কথায় উল্লেখ করা যেতে পারে।'

ইংরেজি শব্দ folktale সম্পর্কে প্রখ্যাত গবেষক স্টিথ থম্পসন বক্তব্য রেখেছেন-

'the term folktale' is legitimately employed in a such broader sense to include all froms of prose narrative, written or oral, which have come to be handed down through the years.'

অর্থাৎ গদ্যে বিবৃত, লিখিত বা মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে হস্তান্তরিত যে সাহিত্য সম্পদ তাই লোককথা। অবশ্য থম্পসন লিখিত অর্থে মৌখিক গল্পগুলোর সংগৃহীত রূপ বুঝিয়েছেন, যার উদ্দেশ্য ঐতিহ্যের নিশ্চিত সংরক্ষণ।

গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত লোককাহিনিগুলোর মূলত সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য সৃষ্টি এগুলোতে তত্ত্বকথা বা শিক্ষনীয় কিছু নেই বরং হাস্যরসসহ আদিরস বিদ্যমান। বেশিরভাগ কাহিনি বাস্তবের সাথে সম্পর্কহীন। রাজা-রানি, জিন-ভূত, রাক্ষস-খোক্ষস, সিংহ-বকরী, বোবা-পাগল এ ধরনের অতি পরিচিত কাহিনিগুলো লোককাহিনির মধ্যে পাওয়া যায়। রূপকথার কাহিনিগুলোও এর অর্ন্তভুক্ত।

www.pathagar.com

এক

কোনো এক গ্রামে ছিল এক বিয়ে পাগল যুবক। সে ছিল আজলা বা বোকা। সে কোনো সময় রাজার মেয়েকে, কোনো সময় জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখে। গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাই তাকে নিয়ে মজা করে। পাড়ার ছেলেরা একদিন বোকাকে ঘিরে জিজ্ঞাসা করে এই বোকা তোর বিয়ে কোন দিন রে? বোকা উত্তর দেয় মোর বিয়ে তো রাজার বেটির সাথে আধা আধি পাকা হয়ে গেছে। সবাই জানতে চাইল আধা আধি পাকা কেমন? বোকা জানালো, বড়ো কইন্যা দুজনে রাজি হইলে তার বিয়ে পাকা হয়। মুই তো রাজি আছু, খালি রাজার বেটি রাজি হইলে তো বিয়েখ্যান পাকা হয়ে যায়। একথা শুনে সবাই হাসে ।

ছেলের বিয়ে পাগলা অবস্থায় দেখে বাবা-মা বোকা ছেলের বিয়ে দেয় গরীব ঘরের এক মেয়ের সাথে। কারণ বোকা ছেলেকে কে বা বিয়ে করবে। বোকা তো খুব খুশি। বিয়ের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে বোকা জামাই। ভেবে অস্থির বোকা ছেলে শ্বশুরবাড়িতে গেলে কি যে করে। রওনা হওয়ার আগে মা ছেলেকে অনেক বুঝিয়ে বলল, শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিস উল্টা পালটা কথা বকিস না। রাক্ষসের মতো খাইস না। শাশুড়ি খাবার দিলে একটু না না করিস। শাশুড়ির সঙ্গে বসে গপসপ করিস ইত্যাদি। বোকা মিষ্টির হাড়ি নিয়ে গেল শ্বশুরবাড়ি। শাশুড়ি জামাইকে আদর যত্ন করে বসতে দিল। নাস্তা খাওয়ালো জামাই মনে করলো তার মা বলে দিয়েছে শাশুড়ির সাথে গপসফ করতে। বোকা জামাই শাশুড়িকে বলল, মা এখুদি বসেনদি, গপসফ করি। শাশুড়ি বসলো, বেহাই বেহানির কথা জিজ্ঞাসা করলো, বাড়ির সবাই কেমন আছে জানতে চাইল। হঠাৎ বোকা জামাই প্রশ্ন করে বসলো আচ্ছা মা তোমার কি বিয়ে হইছে? শাশুড়ি তো হতভম্ব এমন প্রশ্ন শুনে। রেগে গিয়ে জামাইকে বলল, মোর যদি বিহা না হয় তে তুই বিহা কইছিস কার বেটিক রে বেহায়ার ব্যাটা। এই বলে শাশুড়ি ঘর থেকে বের হয়ে গেল বোকা জামাই ভাবতে লাগলো ভুলটা কোথায় হলো।

রাতে জামাইকে খাওয়াতে বসিয়েছে শাশুড়ি। তিনি নিজ হাতে জামাইকে খাবার তুলে দিচ্ছেন। জামাইতো পেটুক। তাই খাচ্ছে পোলাও কোরমা, মাছ, মাংসসহ বিভিন্ন প্রকার খাবার। এসব খাবার দেখে মায়ের উপদেশ ভুলেই গিয়েছিলো, খাওয়া যখন শেষ পর্যায়ে, দুধভাত দেওয়া হয়েছে খেতে, তখন বোকার মনে পড়েছে মায়ের উপদেশের কথা-'খাবার দিবার সময় একটু না না করিস।' তাই শাশুড়ি যখন দুধভাতে গুড় দিতে গিয়েছে অমনি বোকা বলে উঠেছে না না । শ্বাশুড়ির হাত থেমে গেল। ভাবলো জামাই বুঝি গুড় খায়না বোকার তো খুব আফসোস হতে লাগলো। কারণ গুড় তো খুব প্রিয়। কিন্তু আর তো চাওয়া যায় না। গুড় ছাড়াই দুধভাত খেয়ে উঠতে হলো। রাতে তো ঘুম আসে না। তখন সে ভাবতে লাগলো কিভাবে গুড় খাওয়া যায়। সবাই ঘুমিয়ে গেলে বোকা চুপি চুপি রান্না ঘরে গেল এবং অন্ধকারে গুড়ের হাড়ি খুঁজে এবং সে হাড়ির শিকা খুঁজে পেল। হাড়ি নামাতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে হাড়ি ভেঙ্গে গেল। এই শব্দে বাড়ির সবাই চোর চোর বলে চিৎকার করে রান্না ঘরে এসে দেখে হাড়ি থেকে গুড় মাটিতে পড়ছে আর বোকা মনের সুখে খাচ্ছে। ইতোমধ্যে দুই চার ঘা

www.pathagar.com

পড়ে গেল চোরের পিঠে। চোরকে আলোতে নিয়ে এসে দেখে সে তাদের বোকা জামাই। গুড়ের লোভ সামলাতে না পেরে এই কাণ্ড করেছে।[১]

দুই

এক গ্রামে কৃষকেরা রাজার কাছে নালিশ নিয়ে এসেছে। কোনো এক প্রাণী রাতের বেলায় তাদের ক্ষেতের ধান খেয়ে ফেলেছে। ধানের গাছগুলো পায়ে মাড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে ফেলেছে, এর বিচার করতে হবে। রাজা তো মহা চিন্তায় পড়ে গেল। কি করে যানা যায় এটা কোন প্রাণী। এক সভাসদ পরামর্শ দিলেন, হুজুর ধান ক্ষেতে প্রাণীর পায়ের ছাপের আকার আকৃতি পরীক্ষা করলে প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যাবে। রাজার আদেশ হলো প্রাণির পায়ের ছাপ পরীক্ষা করার জন্য। পায়ের ছাপ পরীক্ষা কর্মকর্তা এসে জানালেন হুজুর প্রাণিটির পায়ের ছাপ খুব বড়ো আকৃতির ও গোলাকার। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন বড়ো? কেমন গোল?' তদন্তকারী বলল, হুজুর' ছামের(হামানদস্বা) মতো গোল।' তৎক্ষণাত রাজার হুকুম জারী হয়ে গেল, 'রাজ্যের যত ছাম আছে সবগুলোকে বেঁধে নিয়ে আসা হোক।[2]

বোকার গল্প

এই বোকার গল্পের বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষ কোনো দিক থেকে পিছিয়ে থাকলে অন্যেরা তার এই দুর্বলতাকে পুঁজি করে তার কাছ থেকে ভাঙ্গায়ে খায়। জীবনের প্রতি পদক্ষেপ তাকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সাধারণত দেখা যায় এই বোকা প্রকৃতির মানুষগুলো অনেক সৎ হয় এবং সত্যবাদী হয়। সৃষ্টিকর্তা এই শ্রেণির মানুষগুলোকে অনাকাঙ্খিতভাবে সাহায্য করেন। সততার বলে তাঁরা জীবনে টিকে থাকে। আর যারা দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ তাঁরা সব সময় অন্যের অনিষ্ট করার জন্য প্রস্তুত থাকে। এমনকি তাঁরা আপন ভাইকেও ছাড়ে না। সেই সত্যটির প্রকাশ ঘটেছে এই গল্পের মধ্য দিয়ে। আমাদের সমাজে আমরা প্রতিনিয়ত এই বিষয় দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের বিষয়বস্তুটি এখানে প্রকাশ পেয়েছে। লোককাহিনির বিভিন্ন শ্রেণি বিভাগ আছে। তার মধ্যে থেকে পশু কাহিনির মধ্যে আমরা এই বিষয়গুলো পাই। এভাবে মানুষ তাদের না পাওয়ার বেদনা, হতাশা ও অত্যাচারকে তুলে ধরেছে লোককাহিনিগুলোতে। সমাজ পরিবর্তন হচ্ছে। যুগ বদলে যাচ্ছে কিন্তু মানুষের এই মানসিকতার কোনো পরিবর্তন ঘটছে না। এটিই এই লোককাহিনির মূল বিষয়বস্তু।

কলসের আত্মকাহিনি

এই গল্পটি একটি রূপক গল্প। একটি নারীর সংসার জীবনে যে ঘাত প্রতিঘাত ঘটে তারই একটি চিত্র এখানে পাওয়া যায়। অতীতের সমাজ জীবনে এবং বর্তমানেও নারীদের জীবনে এমন ঘটনা ঘটে। আমরা যতই বলি নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা কিন্তু আমরা সমাজে কতটা তার প্রমাণ দেখতে পারি আর পারি না তাও বোঝা যায় লোককাহিনির মাধ্যমে। বর্তমান যুগ আধুনিক যুগ। আধুনিকতার ছোয়ায় আমরা নিজেদের উন্নত করতে চাচ্ছি কিন্তু কাজে তা পারছি না। কারণ আমাদের মানসিকতা সেভাবে তৈরি হয়নি। সমান অধিকার মানে নারী পুরুষ এক সাথে বাইরে কাজ করা নয়। সংসারে রান্না বা বাচ্চা মানুষ করার ভাগাভাগি নয়। এর বাইরে যেটা আছে সেটা

www.pathagar.com

হচ্ছে মানসিক প্রশান্তি। হয়ত একটা পুরুষ তার স্ত্রীকে এই সুবিধাগুলো দিচ্ছে কিন্তু কিছু কিছু সময় তাকে বলা হচ্ছে তুমি নারী আর আমি পুরুষ। যদি ওপেন সেক্স এর দেশগুলোর দিকে তাকাই এক বাক্যে সবাই বলবে নারীরা স্বাধীন। কিন্তু তার প্রমাণ কোথায় যে নারী স্বাধীন। বাঙালি নারী সংসার জীবনে নির্যাতিত। আর যে দেশে নারীর সংসার নাই তাঁরাও নির্যাতিত জীবন সংগ্রামে। আর এসব বিষয়ই প্রকাশ পেয়েছে কাহিনিতে। আরও দেখা যায় নারীদের জীবনে এটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এই জ্বালা যে সইতে পারবে পরে তার সুখ হবে।

সহ সহ সহ নারী
সইয়ে থাক ঘরে
আমি যখন জন্মেছিলাম
কুমারের ঘরে।
হ্যাটে-পিঠে পুড়ায়
রাঙা করেছিল মোরে
এখন আমি চড়ে বেড়াই
যুব নারীর কোলে।

মদনকুমারের গল্প

এই কাহিনিতে দেখা যায় স্ত্রী মারা যাওয়ার পর প্রজাদের অনুরোধে রাজা আবার বিয়ে করে। কিন্তু প্রথম স্ত্রীর সন্তান এবং রাজা তার স্মৃতি মনে রাখুক সেটা দ্বিতীয় বউ সহ্য করতে নারাজ। তাইতো রাজার অনুপস্থিতিতে সৎ সন্তানকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করে। সৃষ্টির আদিকাল থেকে নারীর মধ্যে এই মানসিকতা কাজ করছে। তাঁরা অন্যের সন্তানকে কখনও নিজের ভাবতে পারে না। কারণ তাদের জগতটা সীমিত স্বামী সংসার এর ভাগ তাঁরা আর কাওকে দিতে চায় না। তাইতো গল্পের মধ্যে দেখা যায় রানি রাজার অনুপস্থিতিতে আন্দে নামক এক যুবকের সাথে সম্পর্ক করেছে। এই সম্পর্ক শুধু যৌবনের ক্ষুদা নিবারণের জন্য না। তার দ্বারা রানির পথের কাঁটা মদন কুমারকে সরাতে চেয়েছে। কাহিনির কোথাও নেই যে রানি রাজাকে মারতে চেয়েছে। বরং রাজা বাণিজ্য থেকে আসলে সে মিথ্যা কান্না কাঁদছে। অর্থাৎ রাজাকে সন্তুষ্ট করতে চাচ্ছে যে তার সন্তানের জন্য রানিরও দুঃখ হচ্ছে। এককভাবে পাওয়ার যে ইচ্ছা বা প্রতিহিংসা সেটিই এখানে কাজ করেছে।

রাজা বিক্রমাদিত্য

এই কাহিনিতে দেখা গেছে বিক্রমাদিত্য এক অলৌলিকক ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ। বর্তমান সমাজে আমরা যাকে জ্যোতিষ্ক বা গুণী বলে থাকি। এরা মানুষকে দেখে তাদের সম্পর্কে অনেক কিছু বলে দিতে পারে। এটি সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত। কাহিনিতে দেখা গেছে বিক্রমাদিত্য রাজার স্ত্রী সম্পর্কে বললে রাজা তাকে ভুল বুঝে তার গর্দান কাটার আদেশ দেয়। এই কাহিনির মাধ্যমে বোঝা যায় সে সত্য মিথ্যা যাচাই না করে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত না। রাজা বিক্রমকে পরীক্ষা না করে তার মৃত্যুর আদেশ দেয়, এটি তার চরম বোকামি। রাজার ছেলে অসুস্থ হলে সেই বিক্রমাদিত্যই তার রোগ

www.pathagar.com

সারার ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ রাজা যাকে শত্রু মনে করেছিল সেই আবার তার জীবনে কাজে লেগেছে।

অর্থাৎ সঠিক বিষয় যাচাই না করে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত না। এটি এই কাহিনির শিক্ষনীয় বিষয়। আবার রাজার ছেলেও একই ভুল করে। ভালু-ক কে কথা দিয়ে সে কথা রাখেনি। বাঘের প্ররোচনায় পড়ে রাজাপুত্র ভালু-কের কথা রাখেনি তাকে অবিশ্বাস করেছে। তার পরিণতি হিসেবে তার জীবনে চরম দূরদশা নেমে এসেছে।

পণ

এই কাহিনিতে দেখা গেছে নায়ক একটা পণ করে। পণ হচ্ছে নায়কের বউ যদি তাকে পায়ে হাত দিয়ে কথা না বলে তাহলে তার সাথে কথা বলবে না। শুধু একজনের জন্য সবাইকে চিন্তায় ফেলে দেয়। সংসারে অশান্তি নেমে আসে। এমনকি নায়িকার অন্য পুরুষের সাথে বিয়ে হয়ে যায়। শুধুমাত্র নায়কের গোড়ামির কারণে এই ঘটনাগুলো ঘটে।

অর্থাৎ এখানে পুরুষ শাসিত সমাজের চিত্র পাওয়া যায়। নারী তার চেয়ে নিচে থাকুক সেটা সে চেয়েছে। তাই যদি না হতো তাহলে পায়ে না হাত দিলে ক্ষতির কিছু ছিল না ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি কোনো কিছুর তো কমতি থাকতো না। কিন্তু আমাদের মানসিকতা দীর্ঘদিন ধরে লালিত। আমাদের অভ্যাস, রীতি-পদ্ধতি এগুলো থেকে বের হয়ে আসতে পারি না। যার জন্য এ ধরনের সমস্যা ঘটে। এই কাহিনির মধ্যে সে সব বিষয়ের উল্লেখ আছে।

ব্রাহ্মণ

এই কাহিনিতে দেখা গেছে একটা সত্য গোপন করার কারণে নায়কের জীবনে চরম। দূরদশা নেমে আসে। নায়কের বাবার মৃত্যুর সময়ে সে পাশে না থাকায় তার বাবার শেষ কথাগুলো শুনতে ও শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে পারেনি। বউ অর্থের লোভে স্বামীকে বলেনি। স্বামীর অবস্থার পরিবর্তনের কারণে নায়িকা বাবার বাড়ি চলে যায়। নায়ক অন্যের কাছে ঋণী হয়ে বাবার শ্রাদ্ধ করতে যায়। কঠিন সময়ে স্ত্রীর কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি পায়নি নায়ক। বরং অপমানিত লাঞ্চিত হয়েছে। স্ত্রী অন্যের সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে। আবার সেই ধন বা সম্পত্তি খুঁজে পেয়ে নায়কের সুখের দিন আসে। আবার নায়ক বিয়ে করে। প্রথম স্ত্রী তার কাছে আবার ফিরে যায়। কিন্তু নায়ক সেই স্ত্রীকে আর ভালোবাসে না। অর্থাৎ কোনো সম্পর্ক একবার ভেঙ্গে গেলে আর জোড়া লাগানো যায় না। বিয়ে, প্রেম, ভালোবাসা এই বিষয়গুলোতে সাধারণত বিশ্বাস কাজ করে বেশি।

ভূতের গল্প

এখানে দেখা গেছে এক ভূত কোনো এক মানুষের অনুপস্থিতিতে তার রুপ ধারণ করে এক সংসারে থাকে। পরবর্তীকালে আসল মানুষ আসলে তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এক সময় পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। পরীক্ষায় ভূত হেরে যায় আর তার শাস্তি হয়। মানুষ তার সংসার ফিরে পায়। অর্থাৎ মানুষের ভিতর এই অলৌকিক বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে অবস্থান করেছে। এই বিশ্বাস সংস্কার মানুষ আগেও করতো এখনও করে।

www.pathagar.com

বলদা

এই কাহিনিতে দেখা যায় এক বলদার দুই বউ। ছোটো বউ বড়ো বউকে সহ্য করতে পারে না। এক সময় ছোটো বউ তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। নারীদের মনসতাত্ত্বিক বিষয় এখানে উঠে এসেছে। একজন আরেক জনকে সহ্য করতে পারে না। বড়ো বউয়ের সন্তানদের উপর ছোটো বউ নির্যাতন করে। গল্পে অলৌলিকভাবে নায়িকার রাজার ছেলের সাথে বিবাহ হয়ে যায়। নায়িকা সুখে থাকে। সাধারণত দেখা যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা মারা-মারি হয় দুই বউয়ের ভিতরে কিন্তু যাকে নিয়ে এই ঘটনা অর্থাৎ স্বামী বা রাজা যে থাকে সে পুতুলের মতো। এখানে তার কোনো ভূমিকা নেই। সে অত্যাচারী যার শক্তি বেশি। যে মিথ্যা বলতে পারে স্বামী বা রাজাকে ভুল বোঝাতে পারে সেই হয় স্বামী বা রাজার কাছে প্রিয় পাত্র। পরবর্তীতে সত্য প্রকাশ পেলে দোষী হয় আবার সেই নারীটি যে এক সময়ে অত্যাচার করেছে। কিন্তু স্বামী বা রাজার কোনো শাস্তি হয় না। অথচ রাজার উচিত ছিল এই ঘটনাগুলো ঘটার আগে সত্য মিথ্যা বিচার করা। কিন্তু সেগুলো আমরা কখনও দেখিনা কাহিনিগুলোতে। অর্থাৎ এখানে কাহিনিগুলোতে পুরুষতান্ত্রিকতার প্রকাশ পেয়েছে।

এক শিকারি

এক শিকারি প্রতিদিন পশু শিকার করে। তাঁর ছেলেদের ইচ্ছা শিকারি জীবিত হরিণ নিয়ে যাবে এবং তাঁরা জবাই করবে। শিকারি এক হরিণ শিকার করে কিন্তু সেই হরিণের দুটি ছোটো বাচ্চা ছিল তাই সে অনুনয় বিনয় করলো তাকে ছাড়ার জন্য। কিন্তু শিকারি কোনোভাবে ছাড়ল না। হঠাৎ এক ফকির হরিণ এর হয়ে নিজে বন্দি হয়। পরে হরিণ আপন ইচ্ছায় বন্দি হয়। শিকারি মানুষ হয়েও অমানবিক কাজ করলো। সে একবারও ভেবে দেখল না যে পশুর জবান দিয়ে মানুষের মতো কথা বের হচ্ছে। এটি কোনো স্বাভাবিক ব্যাপার না। শিকারির মধ্যে জ্ঞানের এবং বিচক্ষনতার অভাব ছিল। পশু জবাই করতে করতে সে পশুর চেয়ে অধম হয়ে গিয়েছিল। অন্যের ক্ষতি করলে নিজের ক্ষতি হয়। তার প্রমাণ হিসেবে শিকারি তার ছেলেদের হারায়। অর্থাৎ ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তার পরাজয় সুনিশ্চিত এটিই এই কাহিনির বিষয় বস্তু।

গবদে রাজা

এই কাহিনিতে দেখা যায় বোকা বিয়ে করতে চাইলে তার ভাইয়েরা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে বের করে দেয়। কারণ বোকা-বিয়ে করলে তার বংশ বৃদ্ধি পাবে তার সম্পত্তির ভাগ দিতে হবে। তাই বোকা এক মাস্টারের বাড়ি যায় মজুরি খাটে। শর্ত তার মেয়েকে বোকা বিয়ে করবে। কিন্তু মেয়ের বাবা তাকে ঠকাতে চায়। কিন্তু বোকার ভাগ্য ভালো যে নায়িকা তাকে সব কথা বলে দেয়। বোকা নায়িকাকে বিয়ে করতে সক্ষম হয়। মাঝে কিছু সময় বোকা নায়িকাকে হারিয়ে ফেলে কিন্তু পরবর্তীতে আবার খুঁজে পায়। বোকার উদ্দেশ্য ঠিক ছিল। তাই সে সফল হয়।

চোর

সাধারণভাবে আমরা সমাজে যে চোর দেখি অথবা যারা পেশা হিসেবে এটি গ্রহণ করে তাঁরা এক সময় না এক সময় ধরা পড়ে। কিন্তু আমাদের কাহিনিতে যে চোরের কথা

www.pathagar.com

আমরা শুনি সে কখনও ধরা খায়নি। অর্থাৎ এই কাহিনিটি একটি রূপক কাহিনি। সমাজপতি ও রাজনীতিবিদ বা যারা শাসক শ্রেণি তাঁরা প্রতিনিয়ত দরিদ্রের অর্থ কারচুপি করছে অর্থাৎ স্থূল কারচুপি যা কেউ বুঝতে পারে না। এরা কখনও ধরাও পড়ে না। অর্থাৎ প্রতিনিয়ত সমাজে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিক থেকে এসব কাজ চলছে। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারলেও তার করার কিছু থাকে না, তাই তাঁরা লোককাহিনির মাধ্যমে তাদের মনের কথাগুলো প্রকাশ করে।

মোড়ল ও রাখাল

সমাজে যে সব সমাজপতিরা আছেন তাঁরা সব সময় নিঃস্বার্থভাবে কারও উপকার করে না। রাখালকে অসহায় দেখে মোড়ল সহজে তার কাজ দেয়নি। তার কাছে আবার শর্ত প্রয়োগ করেছে। অর্থাৎ ছলনার আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু রাখাল ছিল বুদ্ধিমান তাই তার বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজটির সমাধান করেছে। উপস্থিত বুদ্ধির জন্য সে মোড়লের কাছ থেকে কাজ পেয়েছে। মানুষের জীবনে এই বুদ্ধি প্রয়োজন আছে।

মুরগি

এটি একটি হাসির গল্প। গল্পের মধ্যে বোঝানো হয়েছে মাঝে মাঝে অসম্ভব ও সম্ভব হয়ে যায়। সৃষ্টিকর্তা ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করতে পারে। ক্ষুদ্র ও ছোটোকে আমরা অবহেলা করি। কিন্তু তাঁরাও হঠাৎ বড়ো কিছু করে চমকে দিতে পারে। অন্যের দেখা-দেখি কিছু করলে তা অনেক সময় ফলপ্রসু হয় না। তাই তো প্রতিবেশী গৃহস্থ লোভ করে তার পোষা প্রাণি কুকুরকে ঝাটা মেরে বের করে দিলো, পরবর্তীতে তার উচিৎ শিক্ষা হয়।

খ. কিংবদন্তি

আমাদের অতি পরিচিত লৌকিক সমাজ জীবনের সন্নিহিত কোনো ঘটনা সত্য ও কল্পনায় মিশ্রিত হয়ে কিংবদন্তির রূপ নেয়। কিংবদন্তির রাজ্য সবটাই সত্য নয়, আবার সবটাই মিথ্যা নয়। সত্য ও কল্পনা, বাস্তব ও অতি প্রাকৃতিক, মানুষের ইচ্ছা ও অনুভূতির সমন্বয় জনমনের উপর দিয়ে অনবরত আন্দোলিত হতে হতে কিংবদন্তি গড়ে ওঠে। সেদিক দিয়ে কিংবদন্তির সঙ্গে মানব মনের আশ্চর্য একটি যোগ আছে। কিংবদন্তিগুলো হলো অর্ধেক ইতিহাস আর অর্ধেক কল্পনা, অবশ্য কল্পনা মিশ্রিত পৌরাণিকতার রূপ ও পরিচয় নিয়ে এক বিশেষ শ্রেণির কিংবদন্তি আছে।

কিংবদন্তি ও জাতির বিশেষ এক শ্রেণির কথাসাহিত্য, যদিও তা রূপকথা, ব্রতকথা ও উপকথার মতো বিশেষ কোনো ধরনের বর্ণনা ভঙ্গি কিংবদন্তির মধ্যে পাওয়া যায় না। অরণ্যের নিভৃতে সমাধিশ্রিত পুষ্প কুঞ্জের মতোই কিংবদন্তিগুলোর রূপ-প্রাচ্যের এক সহজ আবেগে নিজেকে প্রকাশ করেছে। বাগানের পুষ্পকুঞ্জের অনুরূপ কোনো পরিপাট্য এদের নেই। কারণ এরা কোনো দক্ষ মালির হাতের সেবায় ও যত্নে লালিত নয়। কিন্তু বর্ণ ও সৌরভের কোনো অভাব নেই।

কিংবদন্তির মূল উপাদান জনশ্রুতির মতো, কিন্তু জনশ্রুতি ও কিংবদন্তির মধ্যে যে ব্যবধান আছে তা অত্যন্ত স্পষ্টগোচর। ঐতিহাসিক অথবা প্রাকৃতিক কোনো বাস্তব

www.pathagar.com

নিদর্শনকে আশ্রয় করে যে কাহিনি জনমনে কল্পনার রূপ গ্রহণ করে সেই কাহিনিকেই যথার্থ কিংবদন্তি বলা যায়।

অর্থাৎ বলা যায়, সংস্কার, বিশ্বাস, ইতিহাস ও কল্পনার সংমিশ্রনে যে লোকশ্রুতিমূলক গল্প-কাহিনি সৃষ্টি হয় তাই কিংবদন্তি; কিম + বদন্তি। অর্থাৎ যা বলা হয় বা হয়েছে এমন, আদিযুগ থেকে মানুষ যা শুনে আসছে এরা তারই বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে।

ইংরেজি 'Legend' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'কিংবদন্তি' পূর্বকালে কোনো কোনো ভোজ উৎসবে বিশিষ্ট ধর্মগুরুর জীবন বৃত্তান্ত আলোচিত হতো। দু-একজন শিল্পী ঐ জীবন-কাহিনি গান আকারেও পরিবেশন করতেন। সংগীত বা উপখ্যানরূপে বর্ণিত কাহিনিগুলো তখন "Legend" নামে পরিচিত ছিল ।

জনশ্রুতি, জনরব বা গুজবের উপর ভিত্তি করেই শুধু কিংবদন্তির ময়ূরপঙ্খি কল্পলোকের নীলাকাশে ডানা মেলতে পারে না। কেননা, ইতিহাস বর্জিত লোককাহিনি কিংবদন্তির গৌরব হারিয়ে রূপান্তরিত হয় রূপকথায়। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস-কিংবদন্তি আর রূপকথার পার্থক্য প্রকারগত নয় মাত্রাগত।

বিচার করলে দেখা যায় যে, কিছু সংস্কার ও বিশ্বাস ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও স্থানের সাথে বাস্তবতা জড়িত হয়ে মুখরোচক লোক শ্রুতিমূলক গল্প কাহিনি সৃষ্টি করে, এগুলোই হচ্ছে কিংবদন্তি। সুতরাং ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রনে লোক সাহিত্যের রূপদানকারী লোককাহিনিগুলোই কিংবদন্তি বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়। তবে ফোকলোরের পরিভাষায় একে বলা যায় "ইতিহাস"। ইংরেজিতে যাকে বলে লিজেন্ড (Legend) । কিংবদন্তি সাধারণত কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. স্থান সম্পর্কিত কিংবদন্তি।
২. ব্যক্তি সম্পর্কিত কিংবদন্তি।
৩. অদৃশ্য বস্তুগত কিংবদন্তি।
৪. প্রাতিষ্ঠানিক কিংবদন্তি।
৫. বৃক্ষলতা সংক্রান্ত কিংবদন্তি।
৬. জলাশয় সংক্রান্ত কিংবদন্তি।

পাশ্চাত্য লোকবিজ্ঞানীগণ মিথ (Myth) বা পুরাকাহিনি হতে লিজেন্ড (Legend) কথাটিকে সর্বদাই আলাদা করে ভাবেন। পাশ্চাত্য লোকবিজ্ঞানীগণ লিজেন্ড (Legend) কথাটির যে সংজ্ঞা নির্দেশ করে তা হলো -

'লিজেন্ড (Legend)' সাধারণত কোনো ধারক কিংবা সাধক চরিত্র অবলম্বন করে রচিত ইতিবৃত্ত। একে লৌকিক ইতিবৃত্ত বা সংক্ষেপে ইতিকথা বলে নির্দেশ করা হয়। পুরাকাহিনি কিংবা 'মিথ (Myth)' এর সঙ্গে এর প্রধান পার্থক্য এই যে, দেবদেবী, পীর, ফকির, আউলিয়া, দরবেশ ও অন্যান্য অলৌকিক চরিত্র অবলম্বন করে 'লিজেন্ড (Legend)' বা ইতিকথা রচিত হয়।

অতীতে সমাজ জীবনের অন্তর্ভুক্ত কোনো পীর কিংবা সাধক, ফকির, আউলিয়া, দরবেশের চরিত্র অবলম্বন করে মুখে মুখে এগুলো রচিত হয়। মুখে মুখেই চর্চা হতো। তারপর যতদিন পর্যন্ত সমাজ তাদের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করে চলে ততদিন

www.pathagar.com

পর্যন্ত তাদের সম্পর্কিত কাহিনি ও স্মৃতির মধ্যে রক্ষা করে। কালক্রমে সমাজ তাদের জীবনের আদর্শ হতে ভ্রষ্ট হয়ে পড়লে সমাজের স্মৃতি থেকে তাঁরা লোপ পায়। সকল ইতিকথাই কোনো কোনো সময় জাতির উচ্চতর সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত হয়ে 'এপিক' সংজ্ঞা লাভ করে।

পুরাকাহিনি 'মিথ (Myth)' এর সঙ্গে ইতিকথা 'লিজেন্ড (Legend)' এর অন্যতম প্রধান পার্থক্য এই যে, পুরাকাহিনির চরিত্রগুলো নির্বিশেষ, কিন্তু ইতিকথার চরিত্রগুলো এক একটি বিশেষ পরিচয় লাভ করে। ইতিকথার চরিত্র একদিন সাধারণ সমাজের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে সমাজের দশজন লোকের মতোই আচরণ করতে গিয়ে অসাধারণত্ব দেখিয়ে গিয়েছে, সমাজ-মন তা সুস্পষ্ট অনুভব করতে পারে। তাদের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে যে অতি-মানবত্বের (Superman) ভাবই প্রকাশ পাক না কেন, তা যে একদিন সমাজের প্রত্যক্ষগোচর হয়েছিল তা ইতিকথার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠে।[৩]

পুরাকাহিনি ও ইতিকথার মধ্যে আর একটি সুক্ষ্ম পার্থক্য এই যে, পুরাকাহিনির মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মের অপব্যাখ্যাই (Misinterpretation) শুনতে পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মের বিশ্লেষণই এর প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু ইতিকথার উদ্দেশ্য তা নয়। ব্যক্তি বিশেষের অলৌকিক চরিত্র মহিমা কিংবা জাতির কোনো বীরত্বমূলক কাহিনি বর্ণনাই এর মূখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সব সময়েই পুরাকাহিনি ও ইতিকথার এই পার্থক্য ঠিক নাও হতে পারে। পাশ্চাত্য সমালোচকগণ বুঝতে পেরেছেন যে, The Line between Myth and legend is often vague[৪]. বাইরের দিক থেকে এরা যতই অস্পষ্ট হোক না কেন এদের উভয়ের আভ্যন্তরীন মৌলিক পার্থক্যের বিষয় কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

কিংবদন্তির উৎস

কিংবদন্তির উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। পুরাণ (Myth) ও কিংবদন্তি (Legend) এর তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে, লিজেন্ড (Legend) অনেকটা সংকীর্ণ পরিসরে সীমিত। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, `The term myth and legend is often vague' লিজেন্ড (Legend) এর বাংলা যদি কিংবদন্তি বা জনশ্রুতি হয় তাহলে এর পরিসর মিথ (Myth) এর গণ্ডিকেও ছাড়িয়ে লোকসাহিত্য (Folklore) এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়।

কারণ, যা বলা হয়েছে, যা শোনা গেছে, এমনটি বলতে আবহমান কাল ধরে যেসব সাহিত্য ধাঁ-ধাঁ, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, গীত, গীতিকা, লোককথা, লোকাচার, লোকসংস্কৃতি, লোকচিকিৎসা, কাহিনি কিংবদন্তি প্রভৃতি যা কিছু মানুষের মুখে মুখে বর্ণিত, কথিত, গীত হয়ে এসেছে তাকেই বোঝায়। অর্থাৎ লোকসাহিত্যে (Folklore) বলতে যা বোঝায়, জনশ্রুতি বা কিংবদন্তি তারই একটি অংশ।

ঐতিহাসিক কোনো ঘটনার উপর ভিত্তি করে স্মৃতিপটে বিজড়িত হয়ে যখন মানুষের মনের রংতুলিতে একটি কাহিনিতে পর্যবসত হয়ে যায় তখনই তাকে কাহিনি কিংবদন্তি বা জনশ্রুতি কাহিনি বলা হয়। এ ধরনের কাহিনিকে ডক্টর সিদ্দিকী তার "লোকসাহিত্য" গ্রন্থে লোকপুরানমূলক কাহিনি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

'আমাদের পূর্ব-পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) বিভিন্ন অংশে ইষ্ট-কুটুম, চাতক-চাতকী, কাক, টিকটিকি, নদ-নদী, বিল-ঝিল ইত্যাদির সঙ্গেও অনেক লোকপুরাণমূলক কাহিনির বিবরণ আছে'।

কিংবদন্তির বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি

'কিংবদন্তির (Legend)' শব্দটির সাথে 'পুরাণ (Myth)' শব্দটির খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মিথ অর্থ পুরাণ কাহিনি, লিজেন্ড মূলত পুরাণ কাহিনিই, তবে এতে দেবদেবী, পীর, ফকির, আউলিয়া, দরবেশ কিংবা কোনো অলৌকিক চরিত্রের পরিবর্তে কোনো আদর্শ মানব মানবী কাহিনির নায়ক অথবা নায়িকারূপে আত্মপ্রকাশ করে। আরো একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, বিশেষ কোনো স্থানে সংগঠিত বলে বিবেচিত সুনির্দিষ্ট কোনো ঘটনা অবলম্বন করেও কিংবদন্তি রচিত হয়। কিন্তু মিথের এরকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নেই।

কিংবদন্তির নায়ক-নায়িকা যে কোনো কালেই বর্তমান থাকুক না কেন তাদের নিজস্ব ও প্রত্যক্ষ পরিচয় একদিন ছিল, জনসাধারণ এরকম একটি ধারণা পোষণ করে। কিন্তু আরও গভীরে দেখা যায় যে, 'মিথ (Myth)' বা পুরাণ কাহিনির মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মের অপব্যাখ্যা আছে। এছাড়া প্রাকৃতিক নিয়মের বিশ্লেষণ ও মিথের প্রধান উদ্দেশ্য, কিংবদন্তির উদ্দেশ্য তা নয়।

কিংবদন্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি বিশেষের অলৌকিক চরিত্র মহিমা বর্ণনা করা। ফলে মিথ বা পুরাকাহিনির চরিত্র যেখানে দেবতা, পীর, ফকির, আউলিয়া, দরবেশ কিংবদন্তির চরিত্র সেখানে অতিমানব।

পুরাণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুভূতি সক্রিয় কিন্তু কিংবদন্তি একান্তভাবেই লৌকিক। কিংবদন্তি কোনো প্রামান্য দলিল বা ইতিবৃত্ত নয়, কোনো নীতিকতা বা যুক্তিসিদ্ধ কাহিনিও নয়। অলৌকিক ঘটনাবলীই এর উপজীব্য। প্রাকৃতজনের মুখে মুখে পুরুষানুক্রমে এর চলমান গতিশীলতা। প্রাণের সহজ আবেগে কিংবদন্তি নিজেকে প্রকাশ করে।

লোকশ্রুতিবিদদের মতে, ইতিহাসের যেখানে শেষ, কিংবদন্তির সেখানে শুরু। সুন্দর অতীতের বিচ্ছিন্ন ইতিহাসের উপাদানমূহ একত্রিত হয় কিংবদন্তিতে এসে। বড়ো পুকুর, প্রকাণ্ড মাঠ, পুরনো বটগাছ, দীর্ঘ নদী প্রভৃতির সাথে ইতিহাসের চরিত্র যুক্ত হয়ে পড়ে। এভাবে বাগেরহাটের খান জাহান আলী, যশোরের রাজা প্রতিপাদিত্য, সোনারগাঁয়ের ঈসা খাঁ, সাভারের হরিশচন্দ্র, জয়দেবপুরের ভাওয়াল রাজা, বাঘার শাহদৌলা, নবাবগঞ্জের শাহ নেয়ামতুল্লাহ, রাজশাহীর শাহমখদুম (রঃ) কিংবদন্তির সাথে যুক্ত হয়েছেন। কিংবদন্তি সেখানে এত প্রবল যে, মূল ইতিহাস উদ্ধার করাই কঠিন। অন্যদিকে, লিখিত ইতিহাস যেখানে নির্বাক থাকে মৌলিক কিংবদন্তিকে সেখানে সবাক হতে সাহায্য করে।

ব্যক্তি বিশেষের বিশিষ্ট জীবন-সাধনার প্রতি, সমাজের প্রতি সমাজের শ্রদ্ধাবোধ যতদিন বর্তমান, ততদিন পর্যন্তই সে সম্পর্কিত বিবরণ সমাজে প্রচলিত। কিন্তু সমাজ-জীবন চিরপরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীল সমাজ-জীবনের সামনে কোনো দিনই বিশেষ কালাশ্রিত বিশেষ একজন ব্যক্তির জীবন সাধনা ধ্রুব নক্ষত্রের মতো চিরদিনই

www.pathagar.com

স্থির আদর্শরূপে গণ্য হতে পারে না। আদিম সমাজ জীবন গোষ্ঠীবদ্ধভাবে (Communally) উদযাপিত হতো, তখন গোষ্ঠী সংগ্রামের (Community Warfair) মধ্যে বীরত্ব প্রদর্শন করে, গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা তাদের জীবন সমাজের আদর্শ ছিল। গোষ্ঠী 'বীর' নামে পরিচিত হতো। তাদের অলৌকিক বীরত্বের কাহিনি নিয়ে তখন সমাজের ইতিকথা রচিত এবং চর্চিত হতো। কিন্তু বর্তমান সমাজ-জীবনের নিয়মিত আচার-আচরণে তা আর অন্তর্ভুক্ত নেই।

এমনকি, সাম্প্রদায়িক কিংবা জাতিগত (Eathnic) কলহ ও অসামাজিক আচরণ বলে এদের মধ্যে দিয়েও যে সকল বীরত্বের পরিচয় প্রকাশ পায় তাকেও সমাজ কোনো দিক দিয়েই অভিনন্দন জানায় না। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক দিকের সীমান্ত রক্ষা কিংবা প্রতিবেশী রাজ্য আক্রমন সম্পর্কিত যে সকল বীরত্ব প্রকাশ পেত, তাদের সাথেও এদেশের সাধারণ সমাজের যোগ যে খুব নিবিড় ছিল তা মনে হতে পারে না। সেজন্য সে যুগের বাঙালির বীরত্বের কোনো কাহিনি ব্যাপকভাবে ইতিকথার উপজীব্য হতে পারেনি।[৫]

(ক) প্রখ্যাত সংজ্ঞাকারকরা[৬] ইতিকথা বা কিংবদন্তির এবং ঐতিহ্যের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, সাহিত্যের অনেক পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, লিজেন্ড বা কিংবদন্তির ঐতিহ্যের (Tradition) কোনো আলাদা পৃথক পরিভাষা পাওয়া দুর্লভ যা দিয়ে দুই এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সে জন্য সংজ্ঞাকার লিজেন্ড ও ট্রাডিশন দুটিকে এক করে বোঝাতে চেয়েছেন। আসলে লিজেন্ড, মিথ ইত্যাদি লোককাহিনিগুলো মূলত ঐতিহ্যগত যেমন ব্যাখ্যা দানকারী লিজেন্ড বা ইতিকথা যেখানে সৃষ্টি বা উৎসের মূল সূত্রটিকে আবিষ্কার করা হয়।

(খ) কিছু কিছু গল্প আছে যার মধ্যে অতি প্রাকৃত পরী, বামন, ফকির, দরবেশ এবং জিন ও ভূতের রহস্যকে উপস্থিত করা হয়।[৭]

(গ) এমন কিছু কাহিনিমূলক লিজেন্ড আছে যা মূলত ইতিহাসমূলক বা ইতিহাস আশ্রিত কোনো চরিত্রের কাহিনি যেমন বাঁশীবাদক হ্যামিলন এর গল্প। এই ধরনের গল্পগুলো ঘটনা হিসেবেই উপস্থিত করা হয় এবং সেগুলো কথকের বিশ্বাসের মধ্যে থেকেই এসে যায়। যদিও এই গল্প কাহিনিগুলোর নির্দিষ্ট সময় বা স্থান থাকলেও অনেক সময় তা লোকশ্রুতিগত বিশ্বাসের মধ্যে থেকে পরিবর্তিত হয়।[৮]

সুতরাং উপর্যুক্ত সংজ্ঞা থেকে যথেষ্ট বোঝা যায়, লিজেন্ড (Legend) হোক আর মিথ (Myth) হোক, পরী কাহিনি, পীর, মাজারের কাহিনিই হোক আর জিন বা ভৌতিক গল্পই হোক এগুলো অলৌকিক ঐতিহ্য থেকে সাধারণের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হয়ে লোক সাধারণের মধ্যেই এগুলো জন্মলাভ করে এবং স্মৃতি পরিবাহিত হয়ে বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়। তার মধ্য থেকেই গড়ে ওঠে বিভিন্ন ধরনের লোককাহিনির সংজ্ঞা এবং বিশ্লেষিত হয় তার বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য। লিজেন্ড (Legend) বাংলা কিংবদন্তিই হোক আর ইতিকথাই হোক তার প্রধান বৈশিষ্ট্য যে ইতিহাস আশ্রয় বা ইতিহাসের ভগ্নাংশ সে বিষয়ে তার আর কোনো সন্দেহ থাকে না।

www.pathagar.com

১. খুনিয়া দিঘি

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি দখলদার সৈন্য ও রাজাকাররা মানুষ হত্যা করে এই পুকুরে ফেলে রাখত। আর তখন থেকে এই পুকুরের নাম হয় খুনিয়া দিঘি। হাজার হাজার মানুষের লাশ এই দিঘিতে ফেলা হয়েছে। যুদ্ধের সময় পাকিস্তানিরা সাধারণ মানুষকে ধরে আনত। তারপর শত শত মানুষকে এক সাথে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করতো এবং এই দিঘিতে ফেলতো। এই দিঘিতে ছোটো ছোটো তিনটি গ্যাপ[৯] আছে। আনুমানিক ৩০-৪০ বিঘার উপর এই দিঘি অবস্থিত। তথ্যদাতা ইসরাইল জানান, রাতে এই পুকুরে আসলে এখনও মানুষের মাথা ও হাড়গোড় ভাসতে দেখা যায়। অনেক দিন পর্যন্ত এই পুকুরের পানি লাল ছিল। মানুষ বলে সেই যুদ্ধের সময় মানুষের রক্ত পড়েছে বলে পানি লাল। পরে পুকুরের পানি সেচে ফেলা হয়েছে। এখন এই পুকুরের পানি মানুষ ব্যবহার করে।

২. ভাংবাড়ি নামকরণ

প্রায় ২০০ শত বছরেরও আগে এই গ্রামের নাম রাখা হয় ভাংবাড়ি। ভাংবাড়ি নামকরণের পেছনে বয়োজ্যেষ্ঠরা বিভিন্ন কাহিনি বলে থাকেন। কেউ কেউ বলেন, এই এলাকায় এক সময় প্রচুর ভাং নামক এক প্রকার গাছ জন্মাত। আর বাইরে থেকে মানুষ আসতো এই ভাং কিনতে ও খেতে। মূলত এই ভাং একটি নেশা জাতীয় গাছ। তামাক ও গাজার মতো এটিও একটি উদ্ভিদ। আর এই ভাং গাছ বেশি থাকার কারণে এই এলাকার নাম হয় ভাংবাড়ি।

৩. মাতাল পাড়া

মকবুল নামক এক ব্যক্তি বাইরে থেকে মারামারি করে আসতো। মারামারি করতে করতে তিনি মাতাল হয়ে যেতেন। তিনি মারামারি বা ঝগড়া (কাইজ্যা) করতে এতই পছন্দ করতেন যে সাধারণ বিষয়ে খুব সহজে ক্ষেপে যেতেন এবং ঝগড়া (কাইজ্যা) শুরু করতেন। আর ঝগড়া (কাইজ্যা) করতে করতে তিনি প্রায় উন্মাদ হয়ে যেতেন। তখন তিনি মাতালের মতো মাতলামি করতেন। তবে তিনি কোনো নেশা বা ভাং পান করতেন না। অন্য গ্রামের লোক তার সাথে কখনোও মারামারি করে জিততে পারতেন না। আর এই কারণে গ্রামের মানুষ তখন থেকে পাড়াটির নাম দেয় মাতাল পাড়া।

৪. রামরাই দিঘি

২০০২ সালে রামরাই দিঘির নাম হয় 'রানি সাগর রামরাই দিঘি' তখন থেকেই এটি পর্যটন এলাকা হয়। দৈনিক প্রায় ৫০০-৭০০ মানুষ এখানে দেখতে আসে। বছরে দুই ঈদে মেলা হয়। এই মেলা এক সপ্তাহব্যাপী হয়ে থাকে। তথ্যসূত্রে পাওয়া যায় প্রায় ৫০০ বছর ধরে, এই ঈদে পুনর্মিলন মেলা এখানে হয়ে আসছে। এই দিঘির ভিতর পাশে লিচু এবং বাইরে বনজ গাছ লাগানো হয়েছে সরকারিভাবে। ২১০ বিঘা জমির উপর এই দিঘি অবস্থিত। আনুমানিক জলাশয় এবং পাড় মিলে ৭০ একর, ৮০ বিঘা এই দিঘিতে বাধানো ঘাট। কাটনমুখ[১০] আছে ৫টি।

দিঘি সম্পর্কে কথিত আছে যে, এলাকায় কারও অনুষ্ঠান হলে এই দিঘির কাছে এসে জিনিস চাইতো। সন্ধ্যায় এসে চাইলে পরের দিন সকালে জিনিসগুলো পুকুরপাড়ে

www.pathagar.com

উঠে থাকতো। এই পুকুরে কাপড়-চোপড়ও পাওয়া যেত। তবে এই জিনিসগুলো আবার ফেরতও দিতে হতো। জিনিস পেতে তাদের কোনো মানত করতে হতো না। তবে কোনো জিনিস কম ফেরত দিলে নিত না। একবার এক লোক জিনিস কম দিয়েছিল তারপর থেকে এই পুকুরে আর জিনিস পাওয়া যায় না। অপরিষ্কার থাকলে ক্ষতি হতো। অর্থাৎ কেউ যদি অপরিষ্কার জিনিস ফেরত দিত তাহলে তার ক্ষতি হতো। স্বপ্নে রামরাই রাজা দেখা দিত এবং বলতো পরিষ্কার করে দিবি তা-নাহলে তোর ক্ষতি হবে।

৫. মধুহাড়ি পুকুর

মল্লিকপুর গ্রাম ও নানুর গ্রামের মাঝে এই মধুহাড়ি পুকুরটি অবস্থিত। আনুমানিক ৮-৯ বিঘা জমির উপর পুকুরটি অবস্থিত। পুকুর এর সাথে দুই মানব-মানবীর নিয়ে কাহিনি প্রচলিত আছে। মল্লিকপুর গ্রামের জব্বার আলী বলেন, পুকুরের এক পাড়ে হাড়ির বাড়ি আর অপর পাড়ের পাশে কন্যার মধুর বাড়ি ছিল। মেয়েটি ছিল মুসলমান এবং ছেলেটি হিন্দু। ছেলেটি (হাড়ি) শ্রীমতি কন্যাকে ভালোবাসত। কিন্তু মেয়েটি (মধু) তাকে ভালোবাসত না। এক দিন পুকুরে গোসল করার সময় হাড়ি কন্যাকে ধরতে যায়। কিন্তু কন্যা কাপড় কাঁচার পিড়ার উপর বসে শুধু পুকুরের পানিতে ঘুরে বেড়ায়। কন্যা যে ধার দিয়ে ঘুরেছে সেই সেই ধার দিয়ে দরিয়া হয়ে গেছে। যার কারণে কন্যার গলার চন্দ্রহারটি পাশের আর একটি স্থানে পড়েছিল এবং সেখানে পুকুর হয়ে গেছিল। আর সেই পুকুরের নাম হয় চন্দ্রহার। এই কন্যা (মধু) যে ধার দিয়ে চক্রের মতো ঘুরেছে সেই ধারে নালা হয়ে গেছে। পরবর্তীতে সেই নালা থেকে দরিয়া হয়ে এটি বঙ্গোপসাগরে নেমে যায়। জব্বার আলী সেই পুকুর, নালা সবই আমাদের দেখালেন।

৬. চালান গাছ

এই গাছটির নাম কি তা আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারে না। মল্লিকপুর গ্রামের একটি ধান ক্ষেতের পাশে ঝোপের মধ্যে এই চালান গাছটি অবস্থিত। কেউ গাছটির সঠিক নাম বলতে পারে না। এই এলাকার মানুষ মনে করে এটি উত্তর দিক থেকে কোনো এলাকা থেকে গাছটি চলে আসছে।

মল্লিকপুর গ্রামবাসী বিশ্বাস করে যে, এই এলাকার একটি লোক একবার যাদু শিখতে গিয়েছিল বিদেশের এক যাদু বুড়ির কাছে। কিন্তু সে বাড়ি আসতে পারছিল না। পরে তার ওস্তাদ একটি গাছে ডিভি[১১] করে তাকে গাছে তুলে যাদু করে পাঠিয়ে দেয়। আর লোকটি ফেরত আসে কিন্তু পথ ভুলে যায়। বাড়ি আসতে পারছিল না তখন লোকটি গাছে বান মারছে আর গাছে ডিভি হয়ে গেছে। এই গাছে ১০১টি ডিভি আছে। এই গাছের দৃশ্য একেক সময় একেক রকম লাগে। চোখ ধাঁধার মতো বিভিন্ন গাছ মনে হয়। আমগাছ, জামগাছ, গাবগাছ মনে হয়। গাছটিকে সবাই ভয় পায়। কেউ গাছটির ধারে কাছে যায় না। এই গ্রামের তিতামিয়া ঐ গাছ সংলগ্ন জমিতে হালচাষ করতে গেলে মুখ দিয়ে রক্ত বের হয় এবং মারা যায়। তারপর আর কেউ ঐ জমিতে চাষ করতে যায় না।

www.pathagar.com

৭. জাদুরানির হাট

আনুমানিক ১০০ বছরেরও আগে বাজারটির নামকরণ হয় যাদুরানির হাট। হাটটির নামকরণের কারণ হিসেব অনেকে মনে করেন হাটটি যাদব রাজার জমিদারি অঞ্চলে অবস্থানের জন্য রাজার নামের প্রথম শব্দ হিসেবে যাদু নেওয়া হয়েছে। আর স্থান বা মাটি সব সময় মেয়ে বা নারীর সাথে তুলনা করা হয়। তাই নারী প্রতিচ্ছবি হিসেবে রানিকে বিবেচনা করা হয়। তাই হাটটির নাম যাদব থেকে যাদু এবং নারীর প্রতিশব্দ হিসেবে রানি। অতএব যাদু+রানি=যাদুরানির হাট হয়েছে। আবার অনেকে বলেন, একজন মহিলা যাদুকর ছিলেন এই গ্রামে। তিনি এই হাটের সূচনা করেন। আবার কেউ কেউ বলেন মৌজার নাম হচ্ছে "নন্দগাঁও" নন্দ নামে এক হিন্দু প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নামানুসারে মৌজার নাম নন্দনগাঁও। এই নন্দনগাঁও মৌজার উপরে যাদুরানি নামে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন এক হিন্দু মহিলা ছিল। যাদুরানি এই গ্রামের এক পুকুরের ধারে ছোট্ট কুড়েঘরে বসবাস করতেন। একই কারণে পুকুরটির নামও যাদুরানি পুকুর হয়। পুকুরের কেন্দ্রে পানির নিচে তাঁর ঘরবাড়ি ছিল। তার কাছে সাধারণ মানুষ যা আবেদন করতো সে ব্যক্তি সেটা পেত। টাকা-পয়সা, হাড়ি-পাতিল ইত্যাদি। এই পুকুর পাড়ে প্রতি বছর ১লা বৈশাখে হিন্দু শাস্ত্র মতে তার পূজা-পার্বণ হতো এবং এখনও হয়। এই পূজাতে বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ আসে। প্রায় দশ হাজারের মতো মানুষ এখানে মেলার সময় আগমন করে। পুকুরকে কেন্দ্র করে এখনো মেলা হয় এবং পুকুরে মানুষ মানত করতে আসে। মনের আশা পূর্ণ হলে মানতের জিনিস পুকুর পাড়ে রেখে আসা হতো। সাধারণত হাস-মুরগি, পশু-পাখি রাখা হতো। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন যে, তাদের গ্রামে এক হিন্দু মানুষ এই পুকুরে মানত করে সন্তান পাওয়ার জন্য। সে মানত করেছিল যদি তার সন্তান হয় তবে প্রথম সন্তান এই পুকুর পাড়ে রেখে আসবে। সত্যি সত্যি তার সন্তান হয় এবং প্রথম সন্তানটি পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে দেয়।

আরো জানা যায় যে, কামার পুকুর গ্রামের সাথে নন্দীগাঁও এর বিবাদ হয়। আর তখনই সেই যাদুরদেবী কামারপুকুর থেকে হাটটি নিয়ে নন্দীগাঁওয়ে ছেড়ে দেয়। জানা যায় যে, দেবী দুটি কবুতর ছেড়ে দেয় কবুতর দুটি যতদূর যায় ততদূর হাট হয়।

৮. দুয়ো-সুয়ো পুকুর

রাজা বিনোদের দুই মেয়ের নাম ছিল দুয়ো ও সুয়ো। আর তাদের জন্য রাজা দুটি পুকুর খনন করেন। পুকুরের নাম দেন দুয়ো ও সুয়ো রানির পুকুর। তখন থেকেই পুকুরের নামের পাশাপাশি এলাকার হাটের নামও হয় দুয়োসুয়ো হাট। দুয়োসুয়ো নামক এই গ্রামে নামে দুটি পুকুর আছে। এই পুকুরের পানি কোনোদিন শুকোয় না। এই অঞ্চলের লোক বিশ্বাস করে যে পুকুরে তলায় জিনের ৭টি বাচ্চা আছে। এই জিনেরা মাঝে মাঝে মানুষকে ভয় দেখাতো এবং ক্ষতি করতো। পুকুর দুটির একে অপরের সাথে যোগাযোগের জন্য পথ আছে। কোদাল ধোঁয়া পুকুরের সাথেও এর যোগাযোগ আছে। দুয়ো ও সুয়ো পুকুরে সবাই মানত করতো আগে। ৮০ বিঘা জলকর ও ৮০ বিঘা পাড়সহ ১৬০ বিঘা জমির উপর এর অবস্থান। রাজার ছেলে

www.pathagar.com

রূপবাবু অর্থাৎ রাজবিনোদের ছেলে তিনি এই পুকুরে বর্তমানে মাছ চাষ করেন। বর্তমানে রাজার বংশধরেরা এখন চারতা নামক গ্রামে বসবাস করে।

অন্য একজন জানান, দুয়োসুয়ো পুকুরের তলদেশে একটি সুড়ঙ্গ ছিল। আর এই সুড়ঙ্গ দিয়ে এক পুকুরের পানি আর এক পুকুরের সাথে মিশত। এই পুকুরে জিন আছে বলে এলাকাবাসীর বিশ্বাস। প্রত্যক্ষদর্শী মোঃ ইউসূফ আলী পেশায় একজন শিক্ষক জানালেন, ঐ পুকুরের পাড় দিয়ে হাটতে গিয়ে দেখেন এক বৃদ্ধ লোক আসছে। তার গায়ে কোনো কাপড় নেই। সে ভালো করে দেখল যে সেই বৃদ্ধ লোকটি ঐ পুকুরের পানির মধ্যে নেমে গেল। এই পুকুরের পানির নিচে স্বর্ণের এক তলা বিশিষ্ট জিনের বাড়ি ছিল। মকবুল নামক এক ছেলেকে জিন নিয়ে গিয়েছিল তার বোনের সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য।

তিন দিন পর মকবুল পুকুরের পানি থেকে উঠে আসেন। তাঁর মা মাহুতের কাছ থেকে দোয়া তাবিজ করে বলে সেই সময় থেকে এই পুকুরে একটি মাদার দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হয়। লোকজনের বিশ্বাস এই মাদার দেবতা মুসলমানের পক্ষে। পুকুরের পাশ দিয়ে গেলেই জিনেরা মানুষের সমস্যা করতো। তখন কেউ এই মাদারের নাম নিলে বা তাকে স্মরণ করলে সে এসে তাকে রক্ষা করতো। তিনি আসতেন ঘোড়ার পিঠে উঠে, হাতে চাবুক নিয়ে জিনকে চাবুক মেরে লোকটাকে বাড়ি পৌঁছে দিতেন।

দুয়ো পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়ে একটি পতাকা ঝুলানো আছে। নিচে পরিষ্কার করা আছে, এখানে সকলেই যেকোনো সমস্যায় মানত করে। হিন্দু ও মুসলিম সকলেই মানত করতে আসে এখানে। হাস-মুরগি পালন করলে হাস-মুরগি যাতে অসুস্থ না হয় সেজন্য দু-একটা মোরগ ছেড়ে দিত মাদারের নামে। বড়ো হলে মোরগ মাদারের জন্য এ দুয়ো পুকুর পাড়ে নিয়ে আসে। প্রথমে মাদারের নাম মাটি দিয়ে মুছে দেয়। তারপর মোরগটি বাড়িতে নিয়ে রান্না করে খায়। কবুতরও দেয় কেউ কেউ। গত ৪-৫ বছর ধরে এই পুকুরের ধারে মেলা বসে। তিন দিন এই উৎসব চলে। প্রায় ১০০০ হাজার মানুষ আসে।

৯. টংকনাথের রাজবাড়ি

শ্রী টংকনাথ এই বাড়িটির রাজা ছিলেন। এই রাজবাড়িতে একটি অন্ধকূপ ছিল। ১৯৮৭ সালের বন্যার সময় কিছু সাপ অন্ধকূপ থেকে রাজবাড়িতে উঠেছিল। তারপর রাজবাড়ির অন্ধকূপ বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাজবাড়িতে একটি মন্দির ছিল। তখনকার সময় ৮০ মন সোনা না হলে মন্দির তৈরি করা হতো না। এই রাজবাড়ির কালি মন্দিরটিও ছিল ৮০ মন সোনা দিয়ে তৈরি। সেই কালির নাম ছিল তন্নি। রাজবাড়িতে এসে কাউকে ডাকলে সেই কালি দেবতা সাড়া দিত। কেউ হ্যাঁ করলে প্রতিমাটিও হ্যাঁ করত। এই দেবতার কাছে এসে সব ধর্মের মানুষেরা বিপদ ও রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য মানত করতো। আরও সত্যি নাকি তা পূরণ হতো।

মন্দিরে কোনো কিছু শব্দ করলে বা কারো নাম ধরে ডাকলে কালি আবার তা আবৃত্তি করতো। এই কালি মন্দিরটি ছিল রাজবাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমে। মন্দিরে ৩০

www.pathagar.com

কোটি দেবতা ছিল বলে এখানকার মানুষ বিশ্বাস করে। রাজবাড়িটি ৩০ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। তন্নি কালি সাপের রূপ ও মহিলা মানুষের রূপ ধরে বাড়ির আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতো, গোসল করতো, পানি খেতো। অমাবস্যার রাতে এই দেবীকে দেখা যেত রাজবাড়িতে।

উত্তর দিকের এলাকা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। বাঘের ভয় ছিল প্রচুর। আর বাঘের ভয়ে বাড়ির চারিধারে পুকুর কাঁটা হয়। এই পুকুরে এক সময় বড়ো বড়ো ডেগচি[১১] উঠত। এই ডেগচিগুলোতে সোনার টাকা আছে বলে এই এলাকার মানুষের বিশ্বাস। ডেকচি ওঠার সময় ঝনঝন শব্দ হয়। প্রত্যক্ষদর্শী মোঃ আবদুল জলিল বলেন, এখনো মাঝে মাঝে এই ডেগচি পুকুরের পানির মধ্যে ঘুরে বেড়ায় ।

১০. গৌরলাল চৌধুরীর পুকুরের শোলমাছ

ঠাকুরগাঁও সদরে ঢোলার হাট নামক স্থানে গৌরলাল চৌধুরীর পুকুর। পুকুরটি আকৃতিতে তেমন বড়ো ছিল না। দেখতে অনেকটা কূপের মতো। কূপের মতো তার পানির রং। পানির রং দেখে সবাই ভয় পায়। কেউ পানিতে নামে না। এলাকার মানুষের বিশ্বাস যে, এই পুকুরে আগে জিন-ভূত থাকতো। বর্তমানে এই পকুরে যে পানি আছে তা কেউ কখনও শুকাতে পারে না। স্যালোমেশিন দিয়ে কয়েকদিন ধরে পানি সেঁচেও পানি শুকানো সম্ভব হতো না। এলাকাবাসীর বিশাল পুকুরের তলা পাকা করা আছে এবং পুকুরের পশ্চিম পাশে বাধানো পাড় ছিল। এই পুকুরে অতীতে একটি বিশাল শোল মাছ ছিল। তার নাকে সোনার নথ লাগানো ছিল। বড়ো বড়ো মাছ ছিল, দেখা যেত কিন্তু কখনও ধরা যেত না। পানি খুবই কালো ছিল। কেউ পানিতে নামার এবং মাছ ধরার সাহস পেত না। প্রত্যক্ষদর্শী উজ্জ্বল কুমার চৌধুরী নিজে এই মাছ দেখেছেন।

১১. তামড়াই দিঘি

মুরিদপুর গ্রামের ৮ নং ইউনিয়নে এই দিঘিটি অবস্থিত। এই দিঘির আয়তন জলময় ৮৪ বিঘা + পাড় ১৬ বিঘা = ১০০ বিঘা। দিঘিটির পানি কখনোই শুকায়নি। প্রত্যক্ষদর্শী মোঃ জব্বার মিয়া বলেন, ১৯৬৬ সাল হতে এ পর্যন্ত এ দিঘির পানি শুকায়নি। এই দিঘিতে জিন-ভূত বাস করতো। এক দেবতা এই পুকুরে বাস করে। কিন্তু দেবতার নাম তাঁরা উল্লেখ করেনি। স্বর্ণ, রোপ্য, টাকা, পয়সা ইত্যাদি আগের দিনের সৎ লোকেরা নিয়ত করলে পেতো। প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, গায়ে চুলকানি হলে ১-২ টি মাছ এই দিঘিতে ছেড়ে দিয়ে ঘাট থেকে ৫-১০ হাত দূরে এক বুক পানিতে গিয়ে তিনটা ডুব দিলে চুলকানি সেরে যেত। বিভিন্ন এলাকার লোক এই রোগের জন্য আসে। বগুড়া, রাজশাহীর দক্ষ জেলেরা মাছ ধরতে আসত। মাছ ধরার সময় তাঁরা কিছু আচার-প্রথা পালন করত। কেউ কেউ ছাগল, কবুতর, পাঠা বলি দিত। যেন কেউ মারা না যায়। অপশক্তির হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই আচার-প্রথা পালন করা হতো।

এই দিঘিটিকে স্থানীয় মানুষ খুব বেশি ভয় পায়। এখনও এই দিঘির দক্ষিণ পার্শ্বে কেউ যায় না। এর পার্শ্বে বন জঙ্গল আছে। দিঘির পরিচালক জানান দিঘির দক্ষিণ পার্শ্বে কেউ গেলে সে আর ফিরে আসতে পারে না। একবার বড়ো জাল টেনে মাছ

www.pathagar.com

ধরার সময় এক জেলেকে পানির নিচে টেনে নিয়ে যায়। পরে আর লোকটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

তারপর থেকে পুকুরের দক্ষিণ পাশে আর কেউ মাছ ধরতে যায় না। বর্তমানে পুকুরটি ব্যক্তি মালিকানাধীন। প্রত্যক্ষদর্শী মোহছেনা বলেন, তার মেয়ের নাম মিনা। এই দিঘির পানি ব্যবহারের ফলে সুস্থ্য হয়ে যায়। মোহছেনা যে কাজ করেন তাহলো পুকুরের পাড়ে মাটিতে একটি কলা পাতার উপর কিছু বাতাসা, ধূপ ও সিঁদূরের তিনটি ফোটা দিল। তারপর ছাটি চিংড়ির মাথায় একটি সিঁদূরের ফোটা দিয়ে পানিতে ছেড়ে দিলেন। আর বললেন-

"বামড়া ঠাকুর তোর উদ্দেশ্যে এই মাছ ছেড়ে দিলাম।"

১২. আমগাঁও (লুকানী) নামকরণ

এই গ্রামে একটি আম বাগান ছিল সেখান থেকে এই গ্রামের নাম হয় আমগাঁও। আম বাগানের গাছগুলো ছিল বিশাল বড়ো বড়ো এবং স্থানটি এক সময় জঙ্গলের মতো ছিল। বিশাল আম বাগানের কাছাকাছি গ্রামে একটি বড়ো পুকুরও ছিল। সেখানে স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যবাহী প্রথা অনুযায়ী বিবাহের পর স্বামীর বাড়িতে আসার পরের দিন নতুন বউকে এই পুকুরে গোসল করতে হয়। আমগাঁও গ্রামের এক হিন্দু বধূ এই পুকুরে গোসল করতে নামে। কিন্তু পুকুরের পানিতে ডুব দিয়ে আর উঠেনি। একদিন পর নববধূর লাশটি ভেসে ওঠে। গোসল করতে গিয়ে নতুন বধূর প্রাণ লুকিয়ে যায় পুকুরের পানিতে। এই ঘটনার কারণে গ্রামের লোকেরা আমগাঁও এর সাথে লুকানী নাম যোগ করে এবং গ্রামের নাম হয়ে ওঠে লুকানী আমগাঁও।

১৩. গুপনীহার পুকুর

গুপনীহার রাজার পুকুর। তবে পুকুরটি কবে খনন করা হয় তা কেউ বলতে পারে না। পুকুরের ধারে প্রতি বছর মেলা হয়। পুকুর থেকে শুরু করে ৯ মাইল পর্যন্ত এই মেলা বিস্তৃত থাকে। পুকুরে মানত করা হয়। কিছু সংস্কারও পালন করা হয়। মানতের পশু গোসল করানো হয় এখানে। মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, এলাকাতে কারও অনুষ্ঠান হলে, থালা-বাটির প্রয়োজন হলে এই পুকুরে এসে মানত করলে, পরের দিন সকালে পুকুর পাড়ে পাওয়া যেত। কিন্তু পুকুরে আবার ফেরত দিয়ে দিতে হতো। একবার এক মুসলমান গরুর মাংসসহ ফেরত দিলে তারপর থেকে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে আর থালা-বাসন দেয় না। এমনকি কেউ একটা কম দিলেও নিবে না এবং যথা সময়ে ফেরত দিতে হতো। এই অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস গুপনীহার রাজার আত্মা এই পুকুরে থাকে। স্বপ্নের মাধ্যমে তিনি মানুষের সঙ্গে দেখা দেন এবং কথা বলেন। স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজনে এগিয়ে আসেন। তবে বর্তমানে এই পুকুরে আর থালা বাসন উঠে না।

১৪. নেকপীর মরদ

তিনি নেক বান্দা ছিলেন বলে তার নাম নেকপীর মরদ বলে অনেকে ধারণা করেন। এই পীরের নামানুসারে এই অঞ্চলের নাম নেকমরদ করা হয়। পূর্বে এর নাম ছিল ভবানন্দপুর। এই এলাকাতে আগে হিন্দু বসবাস করতো। ঠিক ঐ সময় পীরবাবা

www.pathagar.com

আসেন। তিনি ভিমরাজের কাছে জায়গা চান বসবাসের জন্য। কিন্তু তিনি তাকে নদীর মধ্যে জায়গা দেখিয়ে দেন। পীর নদীর মাঝে গিয়ে জায়নামাজ পেতে নামাজ পড়েন আর তখন পানির ভিতর থেকে মাটি উঠে আসে আর তার উপর তিনি ঘরবাড়ি তৈরি করেন।

আবার অনেকে ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন যে, এই পীরের আসল নাম 'নাসির উদ্দীন পীর' তিনি যখন ভবানন্দপুর আসেন তখন এখানকার রাজা ছিল ভীমরাজ। সেই সময় এখানে একটি নদী ছিল। সেই নদী নেই কিন্তু বর্তমানে তার চিহ্ন আছে। বর্তমানে এখানে বড়ো খাল বা নালা আছে। পীর ভিমরাজার কাছে আশ্রয় চান কিন্তু তিনি আশ্রয় দেননি। রাজা নদীর মধ্যে জায়গা দেখিয়ে দেন। তখন পীর কলার পাতায় বসে রওনা হন মুনির দিকে। নদীর মধ্যখানে গিয়ে কলার পাতা আটকে যায়। তখন ঐখানে হঠাৎ করে বালুচর হয়ে যায়। পীর সিজদায় যান আর আশেপাশের সব রাজ প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়ে। কিছু পানির মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। যার ধবংশাবশেষ এখনো নালার মধ্যে পাওয়া যায়। তারপর থেকে পীর এখানে বসবাস শুরু করেন। আগে এখানে মেলা হতো। উপমহাদেশে প্রথম এই মেলাতে হাতি বেচা কেনা হতো বলে প্রচলিত আছে।

১৫. বোসলগাঁও বুড়াপীরের মাজার

প্রতি বছর পৌষ মাসে বুড়াপীরের মাজারে মাহফিল হয় । ভারত এবং বাংলাদেশের সীমানায় কিছু গেট আছে। কিন্তু প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে সেই গেটের তালা খুলে যায়। এই অবাক কাণ্ড দেখে প্রশাসন সতর্ক হয়ে যায়। বি. এস. এফ সেই গেটগুলোতে সারারাত টোহল দিয়ে থাকে। কিন্তু তারপরও গেটের তালা খুলে যায়। আর সেই কারণে এই অলৌকিক কাহিনিকে এই এলাকার লোকেরা ভাবেন যে বুড়া পীরের ভাই ভারতে বসবাস করেন। আর সেই কারণে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার নামাজ পড়তে আসতেন। আর এই কারণে মাহফিলের সময় প্রতি বৃহস্পতিবার সীমান্তের গেট খুলে যাওয়ার এই ঘটনা ঘটে। বোসলগাঁও গ্রামে মাস তিনেক আগে এই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

১৬. ঢোলার হাট

এই অঞ্চলে একটি বিশালাকার পুকুর ছিল। পুকুরটি ছিল রাজা গৌরলাল রায় চৌধুরীর। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে বছরে একদিন পুকুরে মাছ ধরা হতো। এ সময়, এই রাজা সমগ্র গ্রামে ঢোল পিটিয়ে মাছ ধরার জন্য গ্রামের সকলকে আহবান করতেন। মাছ ধরা, কেনা-বেচা প্রভৃতির জন্য এই স্থানে কয়েকদিনের জন্য হাট বসে যেত। জনবসতি বাড়তে বাড়তে এবং পুকুরের আয়তন কমতে কমতে এখন পুকুরের অস্তিত্ব শুধু ইতিহাস। জনবসতির প্রয়োজনে পুকুর পার্শ্ববর্তী স্থানে সাময়িক সময়ের জন্য বাৎসরিক হাট ধীরে ধীরে সাপ্তাহিক হাটে পরিণত হয়। শুরুর সময়ের হাট বসতো ঢোল পেটানোর ফলে। তাই প্রথম থেকেই হাটের নামকরণ করা হয় ঢোলার হাট। পুকুর যেমন স্মৃতির গর্ভে বিলীন তেমনি ঢোল পিটিয়ে আর হাটের আহবানও করা হয়

www.pathagar.com

না। কিন্তু নামকরণের মাধ্যমে এলাকার অতীত গর্বের ইতিহাস এবং তার পাশাপাশি সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্যের স্মারক হয়ে ঢোলার হাটটি টিকে আছে কিংবদন্তি হিসেবে।

১৭. বটগাছ ও পিপলগাছের বিয়ে

যাদুরানি হাটের দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্তমান প্রাইমারি স্কুল অবস্থিত। যেটি ১৯৪৪ সালের দিকে ঘর ছাড়াই স্থাপিত হয়। এই স্কুলকে ভিত্তি করে ১টি বটগাছ ও পিপল গাছের বিয়ে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল জনগনের পানির সুবিধা দেওয়া। হিন্দু শাস্ত্র মতে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিয়েকে কেন্দ্র করে উপস্থিত ছিলেন তখনকার ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট লালমোহন সরকার। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ছিল ২নং আমগাঁও ইউনিয়ন এর উন্নয়ন করা। বিয়ের আয়োজন করেছিলেন শশীমোহন ও হরিমোহন। তাঁরা বর্তমানে জীবিত নেই। যাদুরানি হাটের জায়গাটি ছিল কার্তিক সরকারের। এই বটগাছ ও পিপল গাছের বিয়েতে প্রায় ২০০ জন উপস্থিত ছিল। তবে তখন আদিবাসীর সংখ্যাই বেশি ছিল। অধিকাংশই ছিল সাঁওতাল আদিবাসী।

এক সময় এই পিপল গাছটি বিরাট আকার ধারণ করে। পিপল গাছটি যে স্থানে ছিল ঐ ধার দিয়ে কেউ হাটতো না ভয়ে। এলাকাবাসীরা বলেন যে এই পিপল গাছে অপদেবতা বাস করতেন। তবে কারও কোনো ক্ষতি করত না। কেউ গাছটি কাটতে চাইলে তাকে স্বপ্ন দেখাতো এবং বলতো গাছ কাটলে তোর বংশ ধ্বংশ হবে। একবার এক ছুতার (কাঠমিস্ত্রি) কয়েকজন কে নিয়ে পিপল গাছটি কাঁটতে যায়। অপদেবতা তাকে গাছ কাটতে নিষেধ করে। স্বপ্ন দেখায়। লোকটি তারপরও অনেক পুজো টুজো দিয়ে গাছটি কাটার সিদ্ধান্ত নেয়। গাছটি এতই বড়ো ছিল যে একবারে কাটা সম্ভব ছিল না। তাই একটি করে ডাল কাঁটা হলো। এই গাছ কাঁটার পর থেকেই ঐ লোকের বংশের লোক মরতে শুরু করে। সত্যি সত্যিই তার বংশ নির্বংশ হয়ে যায়। লোকটিও মারা যায়। বর্তমানে তার বংশে শ্যামানন্দ সিংহ বেঁচে আছেন। তিনি নিজেই তার এই বংশের করুণ কাহিনি আমাদের বলেন।

১৮. কোদালধোয়া

দুয়োসুয়ো পুকুরের দক্ষিণ পার্শ্বে আর একটি পুকুর আছে যার নাম কোদাল ধোয়া। দুয়ো ও সুয়ো পুকুর কেটে সেই কোদাল এই পুকুরে ধোয়া হতো বলে এর নাম হয় কোদালধোয়া। আনুমানিক ৩০-৪০ বিঘা জমির উপর এটি প্রতিষ্ঠিত। তবে এই পুকুরটি কবে খনন করা হয়েছে? কে খনন করেছে? তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে ঐ অঞ্চলের লোক বিশ্বাস করে। এই পুকুরের পানিও কখনো শুকায় না।

১৯. দুর্গামন্দির

দুর্গামন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত বাংলা ১২১২ সালে । এটি ঠাকুরগাঁও সদরে অবস্থিত। গৌরলাল রাজা তার রাজর্ষি পূজা করার জন্য দুর্গামন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজার আমলে এই মন্দিরে শুধু রাজারা পূজা করতেন। কোনো সাধারণ মানুষ এই মন্দিরে পূজা করার সুযোগ পেতেন না। সাধারণ মানুষের জন্য এটি নিষিদ্ধ ছিল। শারদীয় কালে এই মন্দিরে দুর্গা পূজা হয়। চৈত্র মাসেও এই পূজা হতো। চাঁদ দেখে এই পূজার দিন ঠিক করা হতো।

www.pathagar.com

মন্দিরের দেওয়ালে দুর্গাদেবীর টেরাকোটা প্রতিমা ছিল এখনও তার ধ্বংশাবশেষ আছে। কিন্তু এই এলাকায় মানুষ বলেন এই মন্দিরে তাঁরা কখনো তৈরিকৃত প্রতিমা দেখেনি এবং তাঁরা কখনো প্রতিমা তৈরির দুঃসাহস দেখায় না।

আনুমানিক ১০ শতক জমির উপর এটি প্রতিষ্ঠিত। এখানে এখনো পূজা হয়। এই মন্দিরের পশ্চিমে গৌরলাল রাজার বাড়ি ছিল। বাড়ির চারিধারে নালা খনন করা ছিল। এক দিন এই মন্দিরের দুর্গাদেবী রাজাকে স্বপ্ন দেখান। স্বপ্নে দেবী জানিয়েছিল নরবলী দিতে হবে। তারপর গৌরলাল মনস্থির করলেন যে তিনি নরবলী দিবেন। যদি তিনি নরবলী দিতে পারেন তাহলে তার আরও ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে। এই মনোভাব পোষণ করে রাজা তার ছোটো ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বলী দিতে চান। তারপর একদিন তার বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুল কাটা হয়। আর সেই রক্ত দেয় মন্দিরে দুর্গা প্রতিমার উপর। আর এই অসহায় মানুষের বলী দিতে রাজা মনস্থির করে বলে তার ধ্বংশ লীলা শুরু হয়ে যায়।

২০. মাইক কিংবদন্তি

এলাকার একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, পীরের বাড়ির আশেপাশে যদি কোনো মাইক বাজানো হয় আর মাইকটা যদি পীরের মাজারের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে মাইক বাজে না। কিন্তু অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলে মাইক বাজে। এলাকাবাসীরা বলতে চান এটি পীরের মাজেজা। তিনি যা পছন্দ করেন না তা বন্ধ করে দেন।

২১. বিশ্বাস মহল

বিশ্বাস মহল মহেশপুর পাঙ্গা গ্রামের ধারে অবস্থিত। এটি আনুমানিক ৬০ বিঘা জমির উপর অবস্থিত এক বিশাল বাগান বাড়ি। বিশ্বাস নামক একজন বিশাল ধনী ব্যক্তি একদিন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি চিকিৎসার জন্য পালকিতে করে শহরে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে তিনি যেখানে যেখানে থামছিলেন। সেখানে একটি করে কূপ ও মসজিদ তৈরি করেন। তার প্রমাণ এখনও এ জায়গাগুলোতে আছে। প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, ঐ মহল অথবা মসজিদের পাথর কেউ যদি নিজ কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসে তাহলে তার বিভিন্ন রকম ক্ষয়-ক্ষতি হয়। মোঃ জাহিদুল ইসলাম তিনি একজন স্কুল শিক্ষক। তিনি ভাংবাড়ি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি আমাদেরকে এই তথ্যটি দিয়েছেন। তিনি নিজেও এই পাথর সম্পর্কে কিংবদন্তিটি বিশ্বাস করেন। তিনি জানান তিনি এর প্রত্যক্ষদর্শী।

২২. বুড়া শিব/কাটা শিব মন্দির

অনেক দিনের পুরনো তাই এর নাম বুড়া শিব। প্রতি বছর পূজার সময় একটি করে শিশু অথবা যে কোনো বয়সের মানুষ দেবতার স্থানে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয় এবং সেই মরদেহের মাথা পুজার সময় নাচানো হয়। এক বৎসর এক মহিলার একমাত্র সন্তান তাকে নেয়ার জন্য দেবতা স্বপ্ন দেখায়। বলে, এ বছর তোর সন্তানের মাথা নিয়ে নাচানো হবে। এই স্বপ্ন দেখার পরে মহিলা আকুলভাবে কাঁদতে থাকে।

www.pathagar.com

এমন সময় এক দরবেশ সেই মহিলার কাছে আসে এবং মহিলাকে জিজ্ঞাসা করে তোমার কি হয়েছে, মহিলা বললো, আমার একটি মাত্র সন্তান দেবতার কুলে মারা যাবে। দরবেশ তখন বলে যে, দেখি কিভাবে মারা যায়। সে শিব মন্দিরের কাছে গিয়ে থামে। সে নির্দিষ্ট সময় আসলে দরবেশ তার লাঠি দিয়ে ঐ শিবের প্রতিমাটি আঘাত করে বা বাড়ি দেয়। তখন পাথরের প্রতিমাটি ফেটে যায় এবং সে সময় থেকে মন্দিরটির নাম হয় কাটা শিব। ঐ সময় থেকেই কোনো মানুষের বাচ্চা বা লোক মারা হয় না।

এখন পর্যন্ত ঐ স্থানে যে কোনো মৃত মানুষের মাথা এনে নাচানো হয়। মানুষের অজান্তেই কবরস্থান থেকে এই মাথা নিয়ে আসা হয়। একদিন চুলসহ একটি মাথা আনা হচ্ছিল এতে লাশের মালিক লাশটিকে নিজের ছেলের লাশ হিসেবে সনাক্ত করে থাকে। তখন লাশের মালিক পূজা কমিটির সাথে সমঝোতা করে। কর্তমানে পুরাতন বা বিকৃত মাথা এই পুজাতে নাচানো হয়। ১০/১২ কিলোমিটার দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এই পূজা দেখতে আসে। মাথা দিয়ে না নাচালে এই পূজা হয় না। গম্ভীরার মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি ঘুরে পূজার খরচ সংগ্রহ করা হয়। নববর্ষের আগের দিন এই পূজা হয়। সুইপাররা এই মাথা নিয়ে আসে এবং তাঁরাই এই মাথা নাচায়। তাদেরকে পূজা কমিটি টাকা দেয়। ১০০০/২০০০ হাজার টাকার মতো সুইপারদেরকে দিতে হয়। লেটো ও সুরি গানের মধ্যে সামাজিক কিছু বিশ্বাস ও সংস্কার ধরা পড়েছে। যেমন- হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে গোড়ামি, অসহায়ের দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে হেনস্থ করা, কিছু আচার-প্রথার বিষয়ও উঠে আসে যা আমাদেরকে সচেতন হতে শিক্ষা দেয়।

২৩. পীরপুকুর

সৈয়দ সুরকা আহ্মদ পীর এর মাজার এই পুকুর পাড়ে। এজন্য পুকুরটির নাম হয় পীর পুকুর। অনেকে ধারণা করেন, এই সুরকা পীর নেকমরদ পীরের মামা ছিলেন। এই পীরপুকুর পাড়ে বৈশাখ মাসের ৩ তারিখে প্রতি বছর জলসা হয়। এখানকার মানুষ বিশ্বাস করেন যে, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানত করলে পীর মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন। একবার এক হিন্দু ব্যক্তি, নাম আনন্দ। এই মানুষ পীর পুকুরে মাছ মারছিলেন। কিন্তু মাছ না পাওয়ায় সে পীরকে গালি-গালাজ করে এবং বলতে থাকে সে পীরকে বিশ্বাস করে না। লোকটি অন্য একদিন মাছ ধরতে আসে তার ছেলেকে সাথে আনে। মাছ ধরতে ধরতে হঠাৎ তার ছেলে হারিয়ে যায়। বাচ্চাটাকে এক মাস পাওয়া যায়নি। লোকটা তার ভুল বুঝতে পারে এবং পীরের মাজারে গরু মানত করে। বাড়ি ফিরে তার ছেলেকে দেখতে পায়। ২ একর ৭২ শতক জমির উপর এই পীরপুকুর অবস্থিত। প্রতি বছর এখানে বড়ো আকারের ওরস শরীফ হয়। মানতের উপাদান সাধারণত গরু, ছাগল, চাল, ডাল ইত্যাদি। মানত করা জিনিস রান্না করে উপস্থিত সবাইকে তবারক হিসেবে দেওয়া হয়। মাহফিল শেষে, শেষ রাত বা সকালে তবারক দেওয়া হয়। প্রায় ২-৩ হাজার মানুষ আসে এই মাহফিলে যোগ দেয়। সকল ধর্মের মানুষ এখানে মানত করে। তবে এখানে মাহফিলে কোনো মেলা বসে না।

www.pathagar.com

গ. ভাট কবিতা

গ্রামের সংঘটিত সমকালীন বিষয় নিয়ে লোককবিরা কবিতা লিখে তা প্রকাশ করেন লোকসমাজে সেই কবিতাগুলোকে লোককবিতা বলা হয়। নিচে ঠাকুরগাঁও জেলার বহুল আলোচিত একটি ঘটনা নিয়ে রচিত লোককবিতা দেওয়া হলো।

ত্যাগ করে স্বামী সন্তান
ডোমের মেয়ে হয়েছে মুসলমান
আমিরুল ও বুধিরানির সফল
প্রেমের কবিতা
ভাটিয়ালী গানের সুরে
প্রেম মানে না হাড়ি ডোম হিন্দু আর মুসলমান
যার জন্য যার পাগল রে পরান।
প্রেম করিল লাইলী মজনু রাখলো ইতিহাস
প্রেম করিয়া ঢাকার পড়ল গলায় ফাঁস।
ইউসুফ জুলেখার প্রেম কাহিনি আল কুরআনের বাণী
জামার কাপড় ধরে জুলেখা করছে টানা টানি,
তাই জুলেখা বিচারেতে হয়েছিল অপমান।
ঐ প্রেম করতে নিষেধ নাই বলছি সবার কাছে
এমন প্রেম কর না কেউ বিপদ হয় পাছে।
অনেক মানুষ পালিয়ে যায় নাবালিকা নিয়া
বিচারক দেখিয়া তাদের হাজতে আছে বর্তমান।
ঐ সারা দেশে কত প্রেমিক প্রেমিকা নিজ ধর্ম ছাড়িল
কলেমা পড়িয়া কেহ মুসলমান হলো।
আমার কাছে আছে তার অসংখ্য প্রমাণ
বেশি দূরে নয় দেখবেন যদি দিনাজপুরে যান
বেদ পুরাবন বাদ দিয়া পড়িতেছে আল কুরআন।
ঐ অনেক লোক প্রেম কবিতা কাছে চান
তাইতো আমি লিখে দিলাম এই কবিতা খান।
কবিতা পড়িলে পাপ হবে না জ্ঞান বাড়বে ভাই
দেশের ব্যতীক্রম ঘটনাগুলি কবিতায় প্রকাশ পায়
কবিতা খান লিখতে আমি হয়েছি বড়ো পেরেশান।
ঐ এসব কথা ইতি রেখে মূল ঘটনায় যাই
ঘটনাই সত্য ভাইরে সবাইকে জানাই।
আমার এলাকায় একটি বড়ো বাজার আছে
সেখানের এক প্রেম কাহিনি বলবো সবার কাছে
ঐ বাজারে এক ডোমের মেয়ে হয়ে গেছে মুসলমান।
ঐ কি বলব সে মেয়েটার রুপেরই বাহার
শ্যামবর্ণের রং তার দেখতে টল ফিগার

www.pathagar.com

মেথরের মেয়ে দেখি অতিব সুন্দর
যে একবার দেখবে তার কাড়িবে নজর
রূপ চেহারা সবই কিন্তু সৃষ্টিকর্তার অবদান।
যার জন্য যার পাগল রে পরান।

মূল কবিতা শুরু

রাখি রুপের কথা-২
আমি হেথা মূল ঘটনা ধরি
কবিতা খানা প্রকাশিতে আমার হইছে দেরি।
বলি সবার কাছে-২
আগে পাছে ভাবিয়া চিন্তিয়া,
মুসলমান মেথরের মেয়ে কেমনে করল বিয়া।
শুনেন এই ঘটনা-২
হরিপুর থানা ঠাকুরগাঁও জেলায়
ঘটনাটি ঘটেছিল খালেদার বেলায়।
তারিখ নাইকো জানা-২
ভাই সব জনা বলি সবার কাছে,
হরিপুর থানায় পীরগঞ্জ বলে একটি বাজার আছে।
সেথায় বসত করে-২
বাজারের পরে একটি মেথরের বাড়ি
তার নিকট ছিল ভাই আরোও কয়টি হাড়ি।
মেথরের নাম ছুটু-২
দেখতে খাটু টাকা পয়সা আছে,
৩টি ছেলে ২টি মেয়ে বলছি সাবর কাছে।
মেয়ের নাম বুধি-২
বলি সুধী শুনেন বন্ধুগণ,
হাট বাজারে বাপের সাথে থাকে সর্বক্ষণ।
মেয়ে বড়ো হলো-২
বিয়ে দিল অতুল দাসের সাথে
বিয়ে দিয়ে ঘর জামাই রাখিলেন তাকে।
পেশা ঝাড়ুদার-২
ছিল তার জমা নাই
হাটের তোলা নিয়ে তাঁরা সংসার চালায়।
এমনি দিনে দিনে-২
ক্ষণে ক্ষণে সময় চলে যায়
এরই মধ্যে তাদের ঘরে দুটি সন্তান হয়।
হঠাৎ পিতা মরে-২

www.pathagar.com

গেল পরপারে ছাড়িয়া সংসার
বাপ মরিয়া মায়ের উপর সংসারের ভার।
এখন মেয়ের কথা-২
রাখছি হেথা ছেলের কথা বলি
কেমন করে ধীরগঞ্জ আসিল সে চলি।
বাড়ি সিংহারি-২
জমিদারি আছিল বাবার
পিতার নাম শুনেন সবাই আলিমুদ্দিন সরকার।
ছিল জমা জমি-২
নয়তো কমি এলাকায় তাহার
কিছু জমি বিক্রি করে হয়েছে ফেলার (নিঃস্ব)।
তবুও আছে কিছু-২
নয়তো মিছু সংসার চালার মতো
নাগরের নদীতে জমি ভাঙ্গিয়াছে কত।
নাম তাঁর আমিরুল-২
করে ভুল জমি দেয় ঠিকা
এ কারণে ডাক নাম হয়েছে তার চিকা।
বয়স হবে পঁচিশ-২
কিংবা তিরিশ সঠিক জানা নাই
নায়কের চেহারা ছিল তাহার যে গায়।
আমিরুল বিবাহিত-২
শুনেন যত ভাই বন্ধুগণ
বর্তমান স্ত্রী আছে ছেলে মেয়ে তিন জন।
আমির চিন্তা করে-২
রাতের পরে শুয়ে বিছানায়
গৃহস্থি করে চলবে না আর দোকান করা চাই।
সংসার হইছে ভারী-২
চিন্তা করে চলবেনা আর শেষে
পীরগঞ্জের বাজারে একটি দোকান দিব বসে।
স্ত্রী ইহা শুনে-২
কয় তখনে জমি ঠিকা দিয়া,
পীরগঞ্জের বাজারে তুমি যাওনা চলিয়া।
কর দোকানদারি-২
পান বিড়ি সংসার চালাই আমি
সন্ধ্যা হলে দোকান হতে বাড়ি আসবে তুমি।
আমিরুল তাই শুনিয়া-২
যায় চলিয়া পীরগঞ্জের বাজার,

www.pathagar.com

বাড়ি হতে ঐ বাজার চার কিলোমিটার।
করে দোকান ভাড়া-২
হাড়িপাড়া হাটের দক্ষিণে
শহর হতে মাল পত্র আনিল সে কিনে।
করে দোকানদারি-২
দিন চারি মালপত্র সেল,
রাত্রি কালে বুধি রানি কিনতে গেল তেল।
দেখে রুপ চেহারা-২
দিশেহারা দোকানদার আমির
মনে ভাবে তাহার সাথে সঙ্গে লাগাবো খাতির।
দিল সত্তদা পাতি-২
প্রথম রাত্রি কাস্টমার নাই
যত্ন করে দিল তারে একটি পান বানায়।
আমির বলে তারে-২
শান্ত স্বরে তুমি কাহার
মাইয়া প্রতিদিন সওদা পাতি-২
প্রথম রাত্রি কাস্টমার নাই
যত্ন করে দিল তারে একটি পান বানায়।
আমির বলে তারে-২
শান্ত স্বরে তুমি কাহার মাইয়া
প্রতিদিন সওদা পাতি কিন কার লাগিয়া।
তুমি সকাল সাঝে-২
মাঝে মাঝে এসো মোর দোকানে
কোনো সমস্যা থাকলে পরে বলবে আমার সনে।
বুধি মুচকি হেসে-২
বলল শেষে ওগো আমির ভাই
তোমার বাড়িতে কে আছে আমি জানতে চাই।
আছে বউ ছেলে-২
বলছি খুলে মিথ্যা কথা নয়
তোমার মতো মেয়ে পেলে আর একটা বিয়ে করিব নিশ্চয়।
বউ হইছে রোগা-২
আর শোগা সদা ভারি মন
ঠিকমতো করে না বউ স্বামীর যতন।
বুধি রানি ইহা শুনে-২
কয় তখনে আমার অবস্থাও তাই
মনের মতো ছেলে হলে তার সঙ্গেতে যাই।
বাবা দিচ্ছে বিয়া-২

www.pathagar.com

ঘর জামাইরা আছি বোকার সাথে মনের মতো
ছেলে পেলে খাবে না তার ভাত।
আর এই অতুল দাস-২
করি প্রকাশ বাড়ি মঙ্গলপুরে।
পীরগঞ্জের বাজারে অতুল আসল কি প্রকারে।
থাকে বোনের বাড়িতে-২
ছোটো হতে জ্বালা।
বুধি এই বলিয়া-২
যায় চলিয়া বাড়িতে গমন,
আগামীকাল তোমার সঙ্গে করিব আলাপন।
নিয়া সওদাপাতি-২
রানি বুধি চোখ ইশারা দিল
ইশারা বুঝিয়া আমির মহা খুশি হলো।
এই ভাবে সংগোপনে-২
ঐ দোকানে প্রেমের আলাপ হয়
এ রুপে কিছু দিন তাদের চলে যায়।
প্রেম হইল শুরু-২
নাটের গুরু বুধি রানির মায়
মেয়ের নাম ভাঙ্গাইয়া কিছু খরচ পাতি খায়।
একদিন বুধি রানি-২
কিছু নাস্তাপানি খাওয়ায়
আশায় আমিরুল কে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানায়।
আর বলে আমার-২
সন্ধ্যার পরে থাকবে না মোর স্বামী
মনের আশা মিটাইব তুমি আর আমি।
আমির বলে তারে-২
শান্ত স্বরে তুমি
হিন্দুয়ানী মুসলমান হইয়া খানা কেমনে খাই আমি।
আর লোকজনে-২
যদি জানে রাখবে না মোর জান
তুমি হলে হিন্দু নারী আমি মুসলমান।
আইনে মাফ পাবনা-২
জেল জরিমানা নির্যাতনের কেস
জমি জমা বিক্রি করে তাও হবে না শেষ ।
আমি বিয়ের আগে-২
এ সব কাজে কভু যাব নয়
পরকালে আখেরাতে পাপ হবে নিশ্চয়।

www.pathagar.com

যদি কথা ধর-২
ওয়াদা কর যাব কোর্টে নিয়া
এফিডেভিড করে আমি করব তোমার বিয়া।
বুধি ইহা শুনে-২
কয় তখনে থাকব না এই জাতে ।
স্ব ইচ্ছায় যাব আমি ক্ষতি কিবা তাতে।
তুমি যাহা কর-২
রাখ মার স্বপিলাম জীবন
ত্যাগ করিয়া যাব আমি স্বামী আর সন্তান।
শুধু একটি ভয়-২
আমার হয় বড়ো সতিনের
সে যদি মানিয়া লয় তবে ভয় কিসের।
সতিনের কাজ করিব-২
খেটে খাব বাদি দাসী হইয়া
দুই কথা বলিলে আমি রহিব সহিয়া।
তাঁরা শপথ করেন-২
হাতের পরে দিন তারিখ ঠিক করিল
বুধি রানি গোপনেতে বাহির হইয়া গেল।
নিল টাকা কড়ি-২
আজ শাড়ি যার যাহা ছিল
বেলা ১০টার মধ্যে তাঁরা কোর্টেতে পৌছিল।
উকিল সব শুনে-২
কয় তখনে এই মেয়ে চালাক
প্রথমে দেও তুমি স্বামীকে তালাক।
স্বামী তালাক দিয়া-২
তাদের নিয়া কোর্টেতে উঠায়।
দেখিয়া মেজিস্ট্রেট তখন মেয়েকে শুধায়।
তুমি কি কারণে-২
মুসলমানের শনে আসিলে হেথায়
সত্য করে বলো তুমি করি তার উপায়।
বুধি জবাব দিল-২
ভয় না পেল হাকিমের সাথে
নিজ ইচ্ছাই এসেছি হুজুর ক্ষতি কিবা তাতে।
হাকিম রায় দিল-২
নিয়ে গেল কাজির বাসায়

www.pathagar.com

ঘ. লোকছড়া

লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন ছড়া। আগের দিনের মানুষ যেকোনো বিষয়কে কথার মাধ্যমে মিলিয়ে উচ্চারণ করতেন। যা মূলত ছড়া। ছড়াগুলো শিশুদের জন্য হলেও বড়োদেরও আনন্দ দান করে। এগুলো সাধারণত অর্থহীন, কিন্তু কোনো সময় ইঙ্গিতে অর্থ প্রকাশ করে।

১। মাগে মা কেলা পাকিছে
পাকোক পাকোক বেটি ঘুঘু হাগিচে,
তিন দিনকার সরা মাছলা মামী রান্ধিচে
মামীর চলন দেখে চান উঠিচে।

২। সালেহা গে সালেহা তোর মামি অসেচে
বাঁশের পালইত করে দিহি আনেছে,
দহিখান ত পড়ে গেল ধুলা উড়াছে,
তিন খান বইংঘা দে কান কুঁড়াছে,
ভাংগা ছামডা ঢোল বাজাছে,
রাজার বাড়ির কুকুরটা বাঘ বলেছে।

৩। শাশুড় না নন কাক করিম ডর,
আগুত খাম পান্তা পানি পাছুত কুড়াম ঘর।

৪। দিনডায় বেড়ালো ওলো ঢোলো করে
জোনাকত শুকালো ধান,
আনগে বেটি ছাম গাহিন,
তোর বাপে কুটুক ধান।

৫। একেত কিল মেকেত কিল সিদল দে পন্তা গিল,
গিলছিস তে গিল দেছু মারে কিল,
লাল নটী সিপাহির বেটি, কইনার দান।

৬। মাছের মধ্যে রুই, শাকের মধ্যে পুঁই,
ডাইলের মধ্যে ঠাকুরী, কুটুমের মধ্যে শাশুড়ি।

ঙ. লোককবিতা

এক.

ঝড় তুফানে নষ্ট করে মুছা ঘরের ধারী
যোগীর ধ্যান নষ্ট করে উপর চখা নারী।
লোহাকে নষ্ট করে যদি ধরে জারা
মাঞ্জিয়ারে নষ্ট করে মধুয়া কলার আরা।
ঘরের বউ নষ্ট হয় যদি বেড়ায় পাড়া
চোরের চুরি করা হয় না, যদি পায় সারা[৪]
কাঠকে নষ্ট করে যদি ধরে ঘুন

www.pathagar.com

কোঠা ঘরকে নষ্ট করে, যদি ধরে চুন
ফসলকে নষ্ট করে যদি হয় ভাই ঘাস
যুবক পুরুষ নষ্ট হয় যদি ধরে কাঁশ
ডাঙ্গা জমিক নষ্ট করে আইলের গোড়ায়
সুন্দরী বৌ নষ্ট হয় যদি বেড়ায় পাড়ায়।

দুই.

পুরান চাউলে পোকা ধরে ঔষুধ খাটে না পুরান জ্বরে
পুরান দিয়ে স্বচ্ছ বড়ো হয়।
পুরান দ্রব্য হয় না দর সাপের কুটি পুরান ঘর
পুরান বাসন অর্ধেক মূল্যে লয়।
দেখ পুরান নাই কিছুমাত্র অশুদ্ধ জল পাত্র
পুরান চালের কপাট নাইকে ঘরে
রদ হইয়াছে পুরান প্রথা পুরান জিনিস ভাঙ্গার কথা
পুরান গণনা কেহ নাহি পারে।
পুরান কথা কলঙ্ক বাড়া উঠে গিয়েছে পোট পারা
পুরান চুলে কলপ দিতে হয় ধনি
পুরান দাঁতে জোর না থাকে ঝালিসা ধরে পুরান চোখে
পুরান আইন রদ হলো এদাখী
পুরান জামাই শ্বশুর বাড়ি আদর পায়না বাড়ি বাড়ি
পুরান জলে অধিক শ্যাওলা বাদে
পুরান বাঁশে ধরে ঘুন পুরান কোঠায় খসে চুন
পুরান হলে বেশ্যা পরে ফাঁদে।
পুরাতনের আর নাহিক মজা রাজ্য ভ্রষ্ঠ পুরান রাজা
দেব পূজা পুরা ফুলে হয় না।
মারা পরেছে পুরান পথ এই কালে সব নতু মতো
দেম বিধবার বিবাহ বাকী রয় না।

তিন.

চৈত্র মাসে খাইতে মজা তেঁতুলের আম্বল
বৈশাখ মাসে খাবার মজা কলমীর জল
জ্যৈষ্ঠ মাসে খাইতে মজা গাছের পাকা আম
আষাঢ় মাসে খাইতে মজা কালো কালো জাম
শ্রাবণ মাসে খাইতে মজা খৈ আর কাঁঠাল
ভাদ্র মাসে খাইতে মজা গাছের পাকা তাল
আশ্বিন মাসে খাইতে মজা ডাব নারিকেল
কার্তিক মাসে খাইতে মজা বাড়ির পালন ওল
অগ্রহায়ণ মাসে খাইতে মজা নতুন ধানের ভাত

www.pathagar.com

পৌষ মাসে খাইতে মজা পুষনা পিঠার সাত
মাঘ মাসে খাইতে মজা গরম গরম পাক
ফাল্গুন মাসে খাইতে মজা কচি পাটের শাক।[১৩]

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ :

মুছা ঘরের ধারী- মাটির ঘরের ধোয়া মোছা বারান্দা
জারা- মরিচা
আরা- কলার কাইন
সারা- শব্দ

তথ্যনির্দেশ

১. নৃপেন্দ নাথ রায়, (৪৫), পিতা : মৃত : নারায়ন চন্দ্র সরকার, গ্রাম : ধন্দোগাঁও, ডাক : দৌলতপুর, থানা ও জেলা : ঠাকরগাঁও।
২. ঐ।
৩. কবীর চৌধুরী, লোকসাহিত্য (সংকলন) উর্মিলা প্রকাশনী, দশম খন্ড, পৃ. ১।
৪. মুহম্মদ আব্দুল হাফিজ, লোককাহিনীর দিকদিগন্ত, ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৬৮; ১ম সংস্করণ, ১৯৬৮, পৃ. ১৫।
৫. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম খন্ড, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৭৩ পৃ. ২৪৫-২৪৬।
৬ প্রাগুক্ত পৃ. ২৪৮।
৭. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, তদেব, পৃ. ৬৯৯।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯২-৬৯৩।
৯. মাটি দিয়ে তৈরি থাম। পুকুর কাটার সময় পানি পরিমাপের জন্য এটি রাখা হয়।
১০. বৃষ্টির পানি যে নালার ভিতর দিয়ে দীঘিতে এসে পড়ে।
১১. ডিভি একটি স্থানীয় শব্দ। ডিভির অর্থ হচ্ছে বান মারার পর সৃষ্ট ক্ষতস্থান। যা দেখতে পাখির বাসার মতো।
১২. ডেকচি- রাজা-বাদশাদের আমলে অনেক মানুষের জন্য রান্না করার বড় পাত্র। ডেকচি সাধারণত কাঁসার বা এ্যালুমিনিয়ামের হয়ে থাকে।
১৩. মিরা রাণী রায়, স্বামীর নাম : নৃপেন্দ্রনাথ রায়, বয়স : ৪২ বছর, শিক্ষা : - ৫ম শ্রেণি, ঠিকানা : গ্রাম : ধনোগাঁও, ডাকঘর : দৌলতপুর, উপজেলা : ঠাকুরগাঁও, জেলা : ঠাকুরগাঁও

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

মানুষ সৃষ্টিশীল জীব। শিল্প সৃষ্টির আনন্দে অনবরত মেতে থাকাই শিল্পীর অন্যতম গুণ। 'আনন্দ' শিল্পের উপাদান নয়, কিন্তু আনন্দদানে শিল্পী ও শিল্পের সার্থকতা। সুগঠিত শিল্পরূপমাত্রই আনন্দ দিয়ে থাকে। আনন্দদায়ক রূপনির্মাণ করার জন্য শিল্পী কৌশলে সৃষ্টি করেন শৈল্পিক সৌন্দর্য বা নান্দনিকতা- যা পরিমাপক যন্ত্রে ধরা পড়ে না, কিন্তু ব্যক্তি সত্তার উপর নির্ভর করে। শিল্পী কল্পনার সাহায্যে গড়ে তোলে যে শিল্পের জগৎ- যার রূপ নির্মাণের প্রেরণা আসে শিল্পীর আত্মপ্রকাশের কামনা থেকে। যে শিল্পীর প্রকাশ সফল বা সার্থক তাই সুন্দর এবং প্রকাশ হলো কল্পনার প্রকাশ। সমাজে প্রচলিত যে কোনো উপাদানের সাহায্যে শিল্পীর এই প্রকাশ ঘটে। রীতি-নীতি অনুযায়ী শিল্পের নানা বিভাগ রয়েছে। লোকশিল্পই মূলত এই বিভাগগুলোর ভিত্তিস্বরূপ।

সমাবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষ নিজেদের প্রয়োজনেই গঠন করেছে সমাজ এবং তার ফলেই গড়ে উঠেছে সামাজিক পরিবেশ। একই পরিবেশে অবস্থানকারী মানুষের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক সম্পর্ক— যা নিয়ন্ত্রিত হয় একটি সুনির্দিষ্ট ধারায়। সমাজবদ্ধ মানুষের সুনির্দিষ্ট আচরণ নির্দিষ্ট নিয়মের আবর্তে আবর্তিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে নিজেদের প্রয়োজনেই তৈরি করে নানা ধরনের শিল্পকর্ম। এই ধরনের শিল্পকর্মই লোকশিল্পের অন্তর্ভুক্ত। লোকশিল্প সংহত সমাজের সমষ্টি মননের সৃষ্টি। দৈনন্দিন প্রয়োজনে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে সহজলব্ধ উপাদানের সাহায্যে ঐতিহ্যগত ধারায় যে শিল্পদ্রব্য তৈরি করে— তাই লোকশিল্প হিসেবে চিহ্নিত। লোকশিল্পের প্রকাশ ঘটেছে কাঁথা শিল্পে, চিত্রশিল্পে, পোড়ামাটি শিল্পে, কাঠের শিল্পে, শোলা শিল্পে প্রভৃতি। আদিম সংস্কৃতি থেকে লোকশিল্পের ধারা সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। এখানে জাদু বিশ্বাসের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। বস্তুকেন্দ্রিক উপাদানের ক্ষেত্রে লোকশিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলার লোকশিল্পের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, ক্রমবিবর্তন ধারার ইতিহাস অত্যন্ত সুপ্রাচীন। এই শিল্পের সৃষ্টির ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায়, মূলতঃ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনেই লোকশিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রয়োজনের দিকগুলো পরিবর্তিত হয়েছে। দৈনন্দিন প্রয়োজনের সঙ্গে ধর্মীয় প্রয়োজন, জীবিকার প্রয়োজনেও শিল্প তৈরি হতে লাগল। লোকশিল্পের স্বরূপ বিশ্লেষণে দেখা যায়, শতবর্ষ পূর্বে বাংলার লোকশিল্পের সৃষ্টি, ব্যঞ্জনা, প্রচলন ও সামাজিক জীবনে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতর ছিল।

লোকাচার, লোকসংস্কার, জাদু বিশ্বাস এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে লোকশিল্প ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। লোকশিল্পের মধ্যে কল্পবৃক্ষ, কলকা কিংবা জ্যামিতিক নকশাগুলোতে জাদু বিশ্বাসের রূপরেখা নিহিত। নকশি কাঁথার মোটিফ জাদু বিশ্বাসের

www.pathagar.com

নিরিখে প্রবর্তিত। শঙ্খ শিল্পের মধ্যে বিবাহিত মেয়েদের হাতে শাঁখা ব্যবহার মঙ্গলের প্রতীক। শাঁখের আংটি প্রদানের মধ্যে রয়েছে যুবক-যুবতীর প্রেমের স্বীকৃতি, আর তা হারানো কিংবা ভেঙে যাওয়া হলো বিচ্ছেদের ইঙ্গিত। এই অজস্র লোকমনস্তত্ত্বের নানা দিক লোকশিল্পকে কেন্দ্র করে সমাজে প্রচলিত রয়েছে। লোকশিল্প কালের বিবর্তনে, বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসার, আধুনিক শিক্ষার আলোকপাত ইত্যাদির সংশ্লিষ্টতায় আজ হারিয়ে যেতে বসেছে কিংবা কোথাও কোথাও লুপ্তপ্রায়। এই লোকশিল্প শুধু প্রাচীনই নয় বরং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে, রীতি-বৈচিত্র্যে নয়তো বহুবিধ আঙ্গিক আজও সমুজ্জ্বল। ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, লোকাচার, ধর্মাচার, সামাজিক বিবর্তন, জাতিতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে সব মিলিয়ে লোকসংস্কৃতিতে লোকশিল্প অত্যন্ত গুরু দায়িত্ব পালন করে আসছে।

লোকশিল্পের জগৎ অন্বেষণে নৃতাত্ত্বিক ও জাতিতাত্ত্বিক উৎসমূলে দেখা যায় শ্রম-বিভাগ ও বিনিময় প্রথা উদ্ভবের পূর্বে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের সৃষ্টি অথবা বিকাশের গোড়াপত্তনে মানুষ তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদে স্বীয় মেধা-মনন, চিন্তা-চেতনা প্রকাশে কল্পনা ও ধীরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে লোক ব্যবহার উপযোগী পণ্য লোকশিল্প সৃষ্টি করেছে।

মানুষের ব্যবহারিক জীবনে দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন হয়। যা এ দেশের অর্ধ শিক্ষিত অথবা নিরক্ষর শিল্পীরা সহজ হাতিয়ার এবং হাত ব্যবহার করে লোকদ্রব্য উৎপাদন করে। অনেকে আবার রূপ-রস বৃদ্ধি অথবা অলঙ্করণ করে নান্দনিকতা বাড়ায়, আকর্ষণীয় করে তোলে এবং পর্যায়ক্রমে তা লোকশিল্পে পরিণত হয়। অর্থাৎ সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে মানুষ বিভিন্ন ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন এবং ব্যবহার করতে শেখে, অতঃপর নিপুণতা ও দক্ষতার কৌশল প্রয়োগ করতে থাকে, সাধারণ দ্রব্য সামগ্রী মানুষের শিল্প, লোকের শিল্প, লোকজ শিল্প তথা লোকশিল্প। ব্যবহারিক উপযোগিতার স্বাচ্ছন্দ্যতা, সুলভ মূল্য, সহজপ্রাপ্তি, সর্ববহুল ব্যবহার ইত্যাদি কারণে লোকশিল্প ধীরে ধীরে বাঙালির ঐতিহ্য হয়ে যায়। একই সাথে ধর্মীয় লোকাচার, ব্রতাচার ও লোকসংস্কৃতির প্রভাবে অন্যবিধ সামগ্রীও হয় সবর্ত্র আদৃত ও গ্রহণীয়। লোকশিল্প অতীতে সহজপ্রাপ্ততার কারণে দেশ-বিদেশেও রপ্তানি করে যথেষ্ট আর্থিক সমৃদ্ধি ও সুনাম অর্জন করে, যার অন্যতম উদাহরণ হলো ঢাকাই মসলিন। এছাড়া রয়েছে লোকচিত্রকলা, মৃৎপাত্র, গৃহস্থালি সামগ্রী, কাঠের শিল্পকর্ম, পাটের শিল্পকর্ম, শোলার শিল্পকর্ম ও ডোকরা শিল্পকর্ম। লোকশিল্প বাঙালির শত সহস্র বছরের নিপুণতার বর্ণময় দর্পণ।

লোকশিল্পকে সজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অনেকে বলেন লোকশিল্পের সংজ্ঞা লোকশিল্পের মধ্যে লুক্কায়িত। যেমন-এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা গ্রন্থে বলা হয়- Althouh the definition of folk-art is not yet firm, it may be considered as the art created among groups that exists within the frame work of a developed society............... সংজ্ঞা লেখতে হবে।

সমাজবদ্ধ মানুষের গৌরবের বস্তু তার সংস্কৃতি। পৃথিবীর সমস্ত এলাকার মানুষের পরিবেশ কেন্দ্রিক বস্তুগত ও ভাবগত সৃষ্টিকেই 'সংস্কৃতি' আখ্যা দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

বুৎপত্তিগত অর্থে সংস্কার থেকে এর উৎপত্তি। সম = সংযোগ, সমুচ্চ, সঙ্গত, শোভন ইত্যাদি অর্থে + কৃ (করা)+অ (ভাবে), বা মার্জনা। সেখান থেকেই স্ত্রী [+তি (ক্তিন -ভা) পরিষ্করণ, বিশোধন অর্থে।[1] অনুশীলনলব্ধ দেহ–মন–হৃদয় ও আত্মার উৎকর্ষই 'সংস্কৃতি'। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হলো সংস্কৃতি। এজন্য Robert Bierstedt বলেছেন, "Culture is one of the most important concept in contemporary social science." মানুষের স্বতন্ত্র পরিচয় এবং সভ্যতার মূলে রয়েছে সংস্কৃতি। প্রাণিকুলের মধ্যে একমাত্র মানুষই সংস্কৃতির অধিকারী। বস্তুত সংস্কৃতিই গুহাবাসী মানুষকে করেছে গৃহবাসী তথা নগরবাসী। মানুষ যা কিছু আবিষ্কার করেছে, জ্ঞানের সংযোজন ঘটিয়েছে সবই সংস্কৃতির ফলশ্রুতি। তাই মানুষের টিকে থাকা জ্ঞানের অগ্রগতি সাধন, সভ্যতার বিকাশ ইত্যাদি সবই সংস্কৃতির অবদান।[২]

R.Bierstedt তাঁর 'The social order' গ্রন্থে বলেছেন, "Culture is the complex that consist of everything we think and do have as a member of society."

Hoebel তাঁর 'Anthropology' গ্রন্থে বলেন "Culture is the integrated system of learned behaviour patterns which are characteristics of the member of a society."

সংস্কৃতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা দিয়েছেন E. B. Tylor তিনি বলেন, "Culture is that complex whole, which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society."

অতএব বলা যায় যে, লোকশিল্প আমাদের যুগযুগান্তরের জীবন বোধেরই শিল্পময় অভিব্যক্তি। শৈল্পিক রূপের প্রচ্ছায়ায় সৃষ্ট এসব শিল্পকর্মগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কর্মের অনুষঙ্গও বটে।

১. মৃৎশিল্প

লোকশিল্পের মধ্যে মৃৎশিল্পের ইতিহাস বেশ প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী। মৃৎশিল্পের সঙ্গে এ দেশের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। লোকশিল্পীদের নান্দনিক ক্রিয়াকর্মের পরিচয়ও এই শিল্পে বিধৃত। রোদে শুকিয়ে কিংবা অল্প উত্তাপে মাটি পুড়িয়ে তা দিয়ে পাত্র তৈরি করা ছিল মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক কারিগরি বিপ্লব। 'প্রত্নতত্ত্ববিদ ও নৃবিজ্ঞানীরা এই আবিষ্কারের গৌরব কোনো এক কৃষকের জায়া কন্যার প্রাপ্য বলে মনে করেন। কাদা মাটি হাতে টিপে ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটা এবড়ো থেবড়ো পাত্র তৈরি করে সেটি রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়েছিলেন আদিকালের সে মহিলা আবিষ্কারক(তো.আহমেদ)। সেই সুদূর অতীত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণির পেশাজীবী মানুষ এখনও মাটি দ্বারা বিভিন্ন সৌখিন ও নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরি করে চলেছেন। এ শিল্পের কারিগরি জ্ঞান শিল্পীরা বংশ পরম্পরায় ঐতিহ্যিকভাবে প্রাপ্ত। শিল্পীরা কবে থেকে এ শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে অনুমান করা যায় মৃৎশিল্প আর মানুষ সমবয়সী। সহজলভ্য এ

www.pathagar.com

জৈবিক পদার্থকে অঙ্গুলি স্পর্শে যেমন ইচ্ছা তেমন আকৃতি দেওয়া যায় বলে সেই সূচনাকাল থেকে মানুষ যে মাটি দিয়ে এটা ওটা গড়েছে আর ভেঙেছে তা সহজে অনুমান করা যায়। ভিতরে গর্ত বিশিষ্ট মৃৎপাত্রের ব্যবহার মানুষ কখন থেকে শিখেছে, তা সঠিক বলা যায় না। কাদামাটিতে পায়ের দাগ এবং বৃষ্টিতে তার পানি ধারণ ক্ষমতা এবং রোদে শুকালে তার একটি আকৃতি দেখে মানুষের মাথায় ধারণা আসে যে, এমন আকৃতির জিনিস সে নিজের তৈরি করে ব্যবহারের উপযোগী করতে পারে। আর সেই থেকে বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলায় বিশেষ করে সমীক্ষিত এলাকা টাঙ্গাইল জেলায়ও মাটির হাঁড়ি, সরা প্রভৃতি তৈরি করা হয়। এসব পাত্র পানি কিংবা নিত্য প্রয়োজনীয় কোনো জিনিসপত্র রাখার পাত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অতীতেও এগুলোর ব্যবহার যে সমাজে ছিল তার সন্ধান মেলে পাহাড়পুর মিউজিয়ামে।

মৃৎশিল্পে বাঙালির অতীত ইতিহাস লুকিয়ে আছে। এ শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত যারা তাঁরা পাল বা কুম্ভকার নামে পরিচিত। মূলত শ্রেণি বিভক্ত সমাজের উদ্ভব লগ্ন থেকেই এ জাতির উন্মেষ। এরা তখন থেকেই সমাজের নিম্ন শ্রেণি বলে অবহেলিত। বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয় যে, এদের তৈরি মৃৎশিল্পের সঙ্গে মানব জাতির সম্পর্ক গভীর এবং দীর্ঘদিনের। মানব সমাজের বিবর্তনের ইতিহাসে মৃৎশিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। তাইতো বিশ্ববরেণ্য নৃতত্ত্ববিদ লুই হেনরি মর্গান বলেছেন, বিভিন্ন জাতির বন্যাবস্থা থেকে বর্বর অবস্থার উত্তরণের মূল সূচনা হলো এই মৃৎশিল্পের আবিষ্কার। প্রায় প্রতিটি গ্রামের মানুষ আধুনিক প্রযুক্তিজাত আসবাবপত্রের পরিবর্তে এখনো মাটির তৈরি হাঁড়ি, পাতিল, কলস, খেলনা ইত্যাদি ব্যবহার করে। এসব মাটির পাত্রের শিল্পচিত্রে আবহমান গ্রাম বাংলার প্রতিফলিত। এসব চিত্রে লাঙ্গলবাহী কৃষক, ন্যূজদেহী ভিক্ষুক, নৃত্যরত রমনী, বিয়ের বর-কনে, মা শিশুকে দুখ খাওয়ানোর চিত্র, মা শিশুকে ঘুম পাড়ানোর চিত্র উদ্ভাসিত। আধুনিক শিল্পীরা সময় ও মানুষের চাহিদা অনুযায়ী ফুলদানি, ছাইদানি, ঘরের শোভা বর্ধনে বিভিন্ন ধরনের সৌখিন সামগ্রী যেমন-মাটির ফুল, ফল, বিভিন্ন বন্য প্রাণী ইত্যাদি তৈরি করে। ভারতের ইতিহাসে এক ধরনের পোড়ামাটির ভাস্কর্য দেখা যায় যা প্রায় সর্বত্র এবং সর্ব যুগে একই ধরনের। এগুলোর গঠন কৌশল খুব সরল এবং প্রত্যক্ষ। এগুলোকে ঐতিহ্যবাহী কালাতীত বা কালোত্তীর্ণ ধরনের ক্ষুদ্র প্রতিমা নামে পরিচিত করেছেন স্টেলা ক্রামিশাহ্। এই লৌকিক শিল্পের ধারা আজও দেশের লোকায়ত জীবনধারায় বহমান। একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন মৃৎশিল্প শুধু লোকসমাজের ব্যবহার্য জিনিসপত্র কিংবা শিশুদের খেলার সামগ্রী হিসেবে নয় বরং গ্রামীণ স্তর অতিক্রম করে শহরের নিয়ন ল্যাম্পপোস্টে ও নিচে বিশাল অট্টালিকায় স্থান পেয়েছে।

মৃৎশিল্প ব্যবহারিক জীবনে গৃহের শোভাবর্ধন করে শিশুর খেলনা হিসেবে ব্যবহৃত হয় এমনকি ধর্মীয় জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াচার পালন পূজা-অর্চনা, বিবাহ অনুষ্ঠানে, শবদাহে এবং মাঙ্গলিক কোনো অনুষ্ঠানে কাজে লাগে। অতএব সভ্যতার যতই ক্রমবিবর্তন ঘটুক না কেন মৃৎশিল্পের যথেষ্ট প্রায়োগিক সম্ভাবনা আছে। অতীতে যেমন এই শিল্পের চাহিদা ছিল তেমনি বর্তমানেও এর চাহিদা কম নয়। তবে এসব শিল্পগত ঐতিহ্য ধরে রাখতে গেলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

ঠাকুরগাঁও জেলার কুমারদের তৈরি মৃৎশিল্প পরিচিতি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এখনো অনুন্নত। শহর সভ্যতা গড়ে উঠলেও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ আজো গ্রামে বসবাস করে। সামগ্রিক গ্রামীণ জীবনে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের মানুষের সাথে মাটির নিগূঢ় সম্পর্ক এখনো রয়েছে।

মাটির তৈরি হাড়ি

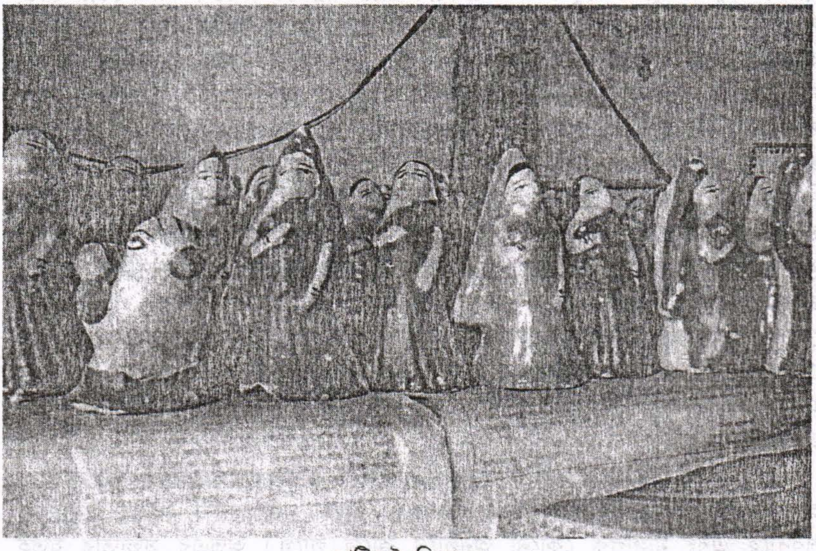

মাটির তৈরি পুতুল

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনো মাটির বাড়ি ঘরের দেখা মিলে। মাটির দেয়াল, মাটির মেঝে এবং মেঝেতে মাটির প্রলেপ।

www.pathagar.com

ঠাকুরগাঁও জেলার বেশিরভাগ কুমারদের বাড়ি মাটির তৈরি ধারণা হয়, মাটি এখানে সহজলভ্য হওয়ায় কুমার পাড়ায় সকল বাড়িই মাটির তৈরি।[৩]

ঠাকুরগাঁও জেলার কুমার সম্প্রদায়ের মানুষ মাটি দিয়ে নানা ধরনের জিনিস তৈরি করেন। যেমন : পূজার বা বিয়ের ঘট, প্রদীপ, সানজাল (ধূপদানি), ব্যাংক, ডুকি (লোটা ধরনের পাত্র) দইয়ের ছোটো পাতিল, কারেন্ট জালের শিকল, পোনা (চজাড়ি) ফুলের টব, পাট, স্পব, তোয়া (কড়াই ঢাকা) পশুন (হাড়ির ঢাকনি) হাড়ি পাতিল, মাটির সানকি প্রভৃতি। খোলসার মধ্যে আছে বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, হাতি, পুতুল, ঘোড়া, বাচ্চা-কোলে পুতুল, দেবতা, গণেশপ্রতিমা, ফুলদানি, ঘোড়ায় চড়া যোদ্ধা প্রভৃতি।

মাটির পাত্র তৈরির পদ্ধতি : মাটির তৈজস পত্রাদি

মাটির জিনিস মাটিতে ফেলে বা পুঁতে রাখলেও তার ক্ষয় হয় না। লোহা বা অন্য সামান্য ধাতু ক্ষয় পায়। বহু পুরাতন হাঁড়ি, যারা সেই হাঁড়ি ব্যবহার করেছিল সেই অতি প্রাচীন মানবকূল নির্মূল হয়েছে। কিন্তু সেই হাঁড়ি এখনও সেই মানব জাতির অস্তিত্ব, তার শিল্প জ্ঞানের সাক্ষ্য হয়ে আছে। কোথায় প্রাচীন মিশর খ্রিষ্ট জন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্বের হাঁড়ি প্রাচীন মিশরবাসীর নিত্য ব্যবহৃত কৌলালদের নিদর্শনস্বরূপ হয়ে আছে। মার্তিকের সামান্য বিনাশ আছে। লোনায় জর্জর হতে পারে। এটা মার্তিকের সামান্য গুণ। কিন্তু অসামান্য প্রয়োজন। জল আর স্থল না হলে মানুষ বাঁচে না। মাটির মানুষ মাটি নিয়ে কাজ করে। মাটি নিয়ে তাঁরা খেলা করে, মাটি নিয়ে তার পূজা। কিন্তু কেবল মাটি নিয়েও কোনো কাজ হয় চাই সরস মাটি, নমনীয় মাটি। একটি মাটির পাত্র তৈরি করতে গেলে মৃৎশিল্পীকে চাকার সঙ্গে একটি কাঠের তৈরি পিঁড়ি যুক্ত করতে হবে। চাকা ঘুরাতে আরম্ভ করে কাদামাটির তালকে পিড়ির কেন্দ্র বিন্দুতে লাগিয়ে হাত দুটিকে ভিজিয়ে নিয়ে কাদামাটিকে দুপাশ থেকে এমনভাবে চেপে ধরতে হবে যে কাদামাটির তলটি উপরিভাগে ছাটা একটা পাত্রে পরিণত হতে পারে। এ সময়ে কুমারের দুই কনুই তার শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে। বুড়ো আঙুল দুটি কাদামাটির উপরের দিক থেকে এমনভাবে চাপ সৃষ্টি করবে যেন সেখানে একটা ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। ছিদ্র তৈরি হলে কুমার তার বাম হাত দিয়ে কাদামাটির তলকে বাইরের দিক চেপে ডান হাতের ওজন বাম হাতে রেখে আঙুলগুলো ছিদ্রের মধ্যে আস্তে আস্তে প্রবেশ করে ছিদ্রকে বড়ো করতে থাকবে। ছিদ্র বড়ো হওয়ার পর কাদামাটির একটি নলের রূপ দেবার জন্য কুমার তার ডান হাতের তর্জনীকে কাদামাটির ভেতরের অংশের গায়ে লাগিয়ে বাইরের দিকে ঠেলবেন। দুই তর্জনীর দূরত্ব সামান্য রাখার জন্য বাম হাতের বুড়ো আঙুলকে ডান হাতের সঙ্গে লাগিয়ে রাখতে হবে। নীচে থেকে আরম্ভ করে কুমার তার দু হাত তুলে আনবেন যেন কাদামাটির তাল একটি নলের আকৃতি নেয়। নলের পুরুত্ব সমানভাবে বজায় রাখার জন্য হাতের চাপ প্রয়োগ করতে পারে। পরপর বাম হাত পাত্রের ভিতরের দিকে রেখে ডান হাতের সাহায্যে পাত্রের আকৃতি গঠন করতে হবে। তৈরি করার পর একটি ধারালো ছুড়ি দিয়ে পাত্রের তলা থেকে অতিরিক্ত কাদামাটি ছেঁচে পরিষ্কার করে পাত্রসহ পিঁড়িটিকে চাকা থেকে আলাদা একটি স্যাঁতস্যাতে বাক্সে সারারাত রেখে দিতে হবে। পাত্রটি যখন সহজে তোলা যাবে তখন সেটি তোলে উল্টে আবার পিঁড়ির উপর রেখে তিনটি মাটির চাবি দিয়ে পিঁড়ির সঙ্গে

www.pathagar.com

আটকে দিয়ে একটি ঘূর্ণন লাঠির উপর হাত রেখে তারের ফাঁস দিয়ে পাত্রের তলদেশের অতিরিক্ত কাদামাটি কেটে ফেলতে হবে এবং তলদেশ যেন একটি রিং এর উপর দাড়াতে পারে। পাত্রটি এভাবে তৈরি করার পর শুকানোর জন্য পাঁচ ছয় দিন রেখে দিতে হবে। ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে তবেই মাটির পাত্রটি পোড়াবার ব্যবস্থা নিতে হবে।

মৃৎ সামগ্রী পোড়ানোর পদ্ধতি : মাটির পণ্যকে আকার দেবার পর তাকে টেকসই করার জন্য পোড়াতে হয়। একে বলে পোনা দেয়া। প্রাচীন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে হাওয়া পোনা, ধুর, পোনা, টইক্কা পোনা ইত্যাদি।

রং-করণ : মাটির পণ্য পোড়ানোর পর এর বিভিন্ন রং হয়। যেমন : লাল মাটি পোড়ালে লাল, সাদা মাটি সাদা, কালো মাটির রং উজ্জ্বল লাল টেরাকোটা রং হয়। পোড়ানোর সময় ধোয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে পাত্রের রং কালোও করা যায়। এর বাইরে বর্তমানে মাটির পণ্য এনামেল পেইন্ট, জলরং, এ্যাম্বোশ ইত্যাদি ব্যবহার বাড়ছে। আরও আছে কালো টেরাকোটা রং। এই রং তিন ধরনের গাঢ় কালো, রুপালি কালো, বাদামি কালো। ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের মাটি প্রকৃতিগতভাবে কালো রঙের তাই আলাদা করে কালো রং করা প্রয়োজন হয় না। এ কাজ নারী-পুরুষ উভয়ে মিলেই করে। মাটি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং চাকের সাহায্যে কাজ ও পোড়ানো ইত্যাদি পুরুষেরা করে। পুরুষেরা কোনো পাত্রের মুখ থেকে শুরু করে পরে পেট ও নিচের অংশ শেষ করে চাকের সাহায্যে কাজ করে নিচের অংশ থেকে শুরু করে ক্রমাগত উপরের অংশ এসে শেষ করে এবং এটি ছরির সাহায্যে পিটিয়ে করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি সাধারণত কলস, বড়ো ঘট, মটকা তৈরির সময় প্রযোজ্য। কলস, মটকা, ঘট এই জিনিসগুলো সাধারণত তিন/চার প্রক্রিয়ায় বা পর্যায়ে পূর্ণরূপ পায়।

ফুলের টব : এটি তৈরির তিনটি ধাপ। প্রথমে চারা কাটা (গোলাকৃতির) তারপর ছাঁচে দিয়ে গোলাকৃতির করার পর সম্মুখে উঁচু করা হয় এবং শেষে হাতের আঙুলের তর্জনী বৃদ্ধার স্পর্শে নকশি করা।

মাটির ব্যাংক : কর্ণার (মেঘলায়) যে মেলাকৃতি থাকে তা এইভাবে করা হয়।

মাটির পুতুল তৈরির পদ্ধতি

(১) হাতে টেপলা পুতুল

পুতুল তৈরির উপযোগী কাদামাটির তাল থেকে তৈরি করা হয় সেটি তৈরিতে যে কাদামাটি লাগবে সেই প্রয়োজনমতো কাদা নিয়ে হাতের আগুন দিয়ে টিপে পুতুলশিল্পী তার মুলিয়ানামতো সেটিকে যথা রূপদান করে। সাধারণত এই পুতুলগুলো নিরেট ধরনের হয়ে থাকে এবং শিল্পীর রূপ সৃষ্টির দক্ষতা অনুযায়ী নির্মিত সে পুতুলগুলো স্ব-স্ব আকৃতি গ্রহণ করে।

(২) ছাঁচে তোলা পুতুল

ক. ছাঁচ তৈরি : প্রথম হলো ছাঁচ তৈরি। শিল্প প্রথমেই তার প্রার্থিত পুতুলটি তৈরি করে নেন নিরেটভাবে। এবার সেটিকে শুকিয়ে বা পুড়িয়ে নেবার পর (যদি গোলাকার ধরনের হয়) সেই পুতুলের সামনের দিকের অংশ একটা কাদামাটির মোটা অংশ

www.pathagar.com

প্রলেপ লাগিয়ে ছাঁচ তুলে নেওয়া হয়। এরপর পরবর্তী পিছনের অংশের জন্য এভাবে ছাপ তোলার ব্যবস্থা করা হয়। এখন ছাঁচ তোলার পর ছাঁচের এই দুই অংশটির মধ্যে যে অনাবশ্যক অংশ থাকে তা বাশের চাচারি দিয়ে চেছে সামনে সমান করে নেওয়া হয়। যাতে ঐ দুখোল অংশ পরস্পর বিশেষ জোড়া লাগে। ছাঁচ তৈরি হলে যথাযথভাবে পুড়িয়ে নেয়া হয় তার স্থায়ীত্বের জন্য।

খ. ছাঁচ থেকে পুতুল তৈরি : এবার ছাঁচে তোলা পুতুলের গড়নে প্রথমে নরম কাদা যাতে ফাট না ধরে এমন ধরনের মাটি সংগ্রহ পূর্বক সেটিকে কাদা নিয়ে সেই মাটির পরিমাণমত অংশ রুটি বেলার মতো মাটির রুটি তৈরি করে দেওয়া হয় এবং ছাঁচের উপর সরু বালির গুড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হয়। যাতে ছাঁচ তোলার পর সেটি জড়িয়ে না যেয়ে ঠিকমত বেরিয়ে আসতে পারে সেই জন্য এই ব্যবস্থা। এবার দুখোল পুতুলের ক্ষেত্রে তৈরি ঐ মাটির রুটিটিকে ছাঁচের এক খোল গর্তের মধ্যে ফেলে আঙুলের চাপ দিয়ে ছাঁচের অবয়বের সঙ্গে এক করে ফেলতে হয়, যাতে কোনো ফাক না থেকে যায়। এরপর ছাঁচের গা বেয়ে মাটির সে অনাবশ্যক অংশ বেরিয়ে থাকে তা বাঁশের চাচারি দিয়ে চেছে সমান করে নেওয়া হয়। এরপর ছাঁচ থেকে বের করা দুখোল অংশ সামান্য শুকিয়ে গেলে দুটিকে জুড়ে দেয়া হয় সামান্য জল লাগিয়ে। অবশেষে নিচের দিকের অংশ ফাঁক থাকার জন্য সামান্য মাটির রুটি দিয়ে ফাঁকা অংশটিতে জুড়ে দেওয়া হয়। এই হলো দুখোল ছাঁচে তৈরি পুতুল গড়নের কারিগর।

গ. পোড়ানো : এবার খড়কুড়ো বা শুকনো পাতা দিয়ে শিল্পীরা তাদের তৈরি ছোটো ভাটিতে তৈরি করা শুকনো পুতুলগুলো পুড়িয়ে নেয়। কুম্ভাকার যে পুতুলগুলো তৈরি করেন সেটি তাদের অন্যান্য মৃৎপাত্র ভাটিতে পোড়ানোর সময় তৈরি করা সে পুতুলগুলোকে একই সঙ্গে পুড়িয়ে নেয়।

ঘ. রং করা : সবশেষে প্রয়োজনমত রং লাগাবার পালা।

মৃৎশিল্পের কাঁচামাল ও উৎস

মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান কাদামাটি। সুতরাং কাঁচামাল হিসেবে সাধারণত এঁটেলমাটি, বালি, রং, খড় ও পানি ব্যবহৃত হয়।

প্রধান উপাদান কাদামাটি হলেও সকল মাটির গঠন একই রকম হয় না। মৃৎশিল্পের জন্য যে কাদামাটির ব্যবহার করা হয় তা এক বিশেষ ধরনের। অনেক সময় নদীর অববাহিকাতেই এই মাটি পাওয়া যায়। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন জায়গাতে কয়েক হাত মাটি খননের পরই এই মাটির সন্ধান পাওয়া যায়। যেসব জায়গাতে এই মাটির সন্ধান পাওয়া যায় সেসব জায়গায় দুই থেকে চারহাত পর্যন্তই এই মাটির স্তর দেখা যায়। ঠাকুরগাঁও জেলার টাঙ্গন, কুলিক, নাগর, পূর্ণভবা প্রভৃতি নদী বিধৌত। এছাড়া এখানে রয়েছে প্রচুর দিঘি এবং বিল। এখানে ছাই রংয়ের খুব শক্ত ধরনের এঁটেল মাটি পাওয়া যায়। মাটির তৈরি জিনিসগুলোর বর্ণ হয় কালো। প্রতিমা শিল্পীরা এই মাটিকে বলেন হরমাটি, আর কুমাররা বলেন কুমারমাটি।

রানীশংকৈল উপজেলার যুগীপাড়া গ্রামের সমলাদেবীর কাছ থেকে মাটি সংগ্রহের স্থান কোথায় তা জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন তাঁরা রামরায় দীঘির পাশে

www.pathagar.com

দয়ারবালি থেকে মাটি কিনে আনেন। ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার কুমারগণ টাঙন নদী থেকে মাটি সংগ্রহ করেন বলে জানান। সমীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়, সবগুলো এলাকার কুমারগণই বিল বা নদী থেকে মাটি কিনে নেন ট্রলি হিসেবে। এরপর তাঁরা ট্রলিতে করে মাটি বাড়িতে নিয়ে আসেন। রঙের জন্য বাজারের কৌটা রং ব্যবহার করেন।

মৃৎশিল্প তৈরির উপাদান ও উপকরণ

মৃৎশিল্প প্রস্তুত করতে হাতের দলটি আঙুলের কাজ সবচেয়ে বেশি। তাই দশটি আঙুলকে মৃৎশিল্প কাজের জন্য এক চমৎকার হাতিয়ার বলা হয়। মৃৎশিল্প তৈরিতে বিভিন্নরকম উপকরণ ব্যবহার করা হয় ।

যুগ যুগ ধরে এ সকল উপকরণ দ্বারা মৃৎশিল্প তৈরি হয়ে আসছে। আঞ্চলিক নামের ভিন্নতা থাকলেও এই উপকরণগুলোই মৃৎশিল্প তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

১. আথাল : স্থানীয় নাম আথাল। শুদ্ধ নাম আতাইল যা সিমেন্টের তৈরি। এটি দেখতে গোলাকার চাকতি আকৃতির। এর নিচের অংশ সমতল এবং উপরের অংশ কিছু গোলাকার। এর গভীরতা ৮ ইঞ্চি, ব্যাস ১৫ ইঞ্চি এবং ১.৫ ইঞ্চি। ওজন প্রায় ৪ কেজি গোলাকৃতির জিনিস তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়। যেমন : সরা, হাঁড়ি প্রভৃতি এই আথালের মাধ্যমে তৈরি করা হয়।

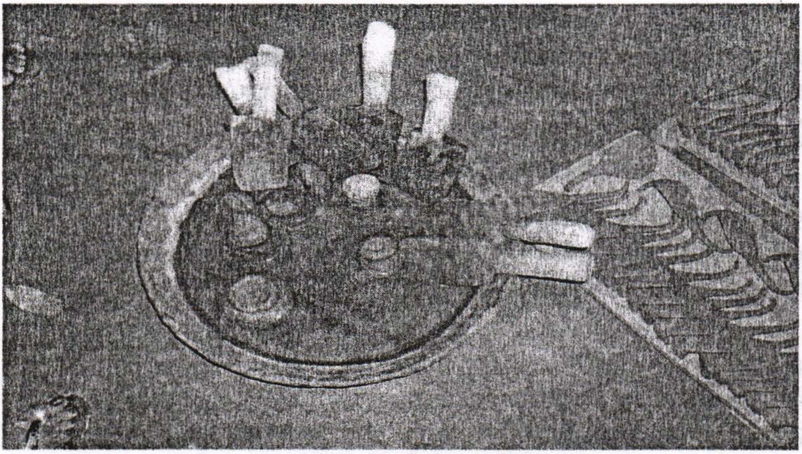

মৃৎ শিল্পের তৈরির যন্ত্রপাতি

২. পিটন : এটি কাঠের তৈরি। এটি দেখতে সরু ও লম্বা। মৃৎশিল্প আকৃতি দেবার সময় পেটানোর কাজে এটি ব্যবহার করা হয়। এর এক প্রান্ত সরু এবং অন্যপ্রান্ত চ্যাপ্টা। যে প্রান্ত হাত দিয়ে ধরা হয় সে প্রান্তটি সরু হয় এবং যে প্রান্ত দিয়ে আঘাত করা হয় তা চ্যাপ্টা হয়।

৩. পাথর : এটি পাথর দিয়ে তৈরি। শিল্প তৈরির পূর্বে এর দ্বারা ছেনা মাটির উপর আঘাত করা হয়।

www.pathagar.com

৪. ত্যানা বা ন্যাকড়া : এটি পুরাতন সুতির কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়। এটি শিল্পবস্তুর প্রলেপ দেয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। পাশে রাখা কাদাযুক্ত পানিতে এই ন্যাকড়া ভিজিয়ে পাত্রের উপর লেপে ফিনিশিং দেয়া হয়।

৫. কাঠের যন্ত্র : এটি ঢাকনা তৈরির সময় ব্যবহৃত হয়। এটি গোলাকার কাঠের পাটাতন। দেখতে অনেকটা বসার পিড়ির মতো। এর উপর ছেনা মাটির নরম দলা রেখে হাত দিয়ে চ্যাপটা রুটির আকৃতি দেয়া হয়। তারপর এর উপরে থাকা অবস্থায় সেটা মাটখোলা দিয়ে বেলা হয়।

৬. মাট খোলা : এটি কাঠের তৈরি। দেখতে রুটি তৈরিতে বেলনাকৃতির। ঢাকনা তৈরির সময় ছেনা মাটির দলা কাঠের যন্ত্রের উপর রেখে বেলতে এটি ব্যবহৃত হয়।

৭. ছোটো টোয়ারী : এটি দেখতে জর্দার কৌটার মতো। এটি কাঠের তৈরি। শিল্পবস্তু তৈরির সময় যখন অল্প পরিমাণ পানি লাগে সেটি এই টোয়ারির মাধ্যমে ঢালা হয়।

৮. করাইল বালু : শিল্প বস্তু যাতে সহজে ছাচ থেকে উঠানো যায় সে জন্য ছাচের ভিতরে এই বালি ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও কাঠের যন্ত্রের উপর দলা বেলার উপরে পূর্বে কাঠের যন্ত্রের উপর বালি ব্যবহার করা হয়।

৯. ছাই : উক্ত কাজে করাইল বালু ছাড়াও ছাই ব্যবহার করা হয়।

১০. চাকা : মৃৎশিল্প প্রস্তুতকর্মে অত্যন্ত অত্যাবশ্যকীয় জিনিস হলো চাকা। এটি মাটি, পাথর ও ইটের টুকরো কাঠ দিয়ে তৈরি। এটি দেখতে গরুর গাড়ীর চাকার মতো। এর ব্যাস ২ ফুট ৮ ইঞ্চি। ভিতরের অংশের ব্যাস ২ ফুট ১.৫ ইঞ্চি, ভিতরের অংশের পাশের অংশটা ৬.৫ ইঞ্চি চওড়া। এর পুরুত্ব ৪ ইঞ্চি, পরিধি ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি।

মৃৎ সামগ্রী প্রস্তুত প্রণালী

মৃৎ শিল্পীরা শিল্প তৈরির কাজকে কয়েকধাপে সম্পন্ন করেন। পর্যায়ক্রমে এ সকল ধাপ অতিক্রম করতে পারলে সৃষ্টি হয় একেকটি শিল্প।

পর্যায়গুলো হলো-

(ক) মাটি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
(খ) মাটিকে উপকরণ তৈরির উপযোগীকরণ।
(গ) পাত্রের আকৃতি দান।
(ঘ) রোদে শুকানো।
(ঙ) রং বা প্রলেপ দেয়া।
(চ) আগুনে পোড়ানো।

(ক) কুম্ভকারদের প্রথম কাজ হলো মৃৎশিল্পের জন্য এর প্রধান উপকরণ মাটি সংগ্রহ করা। এ কাজে এটেল মাটির প্রয়োজন হয়। বিশেষ বিশেষ জমিতে এঁটেল মাটি পাওয়া যায়। সাধারণত ৪/৫ ফুট মাটি খনন করার পর এঁটেল মাটি পাওয়া যায়। ঠাকুরগাঁওয়ে বিল বা নদী থেকে মাটি উত্তোলন করার জন্য কোদাল ও খণ্ডা ব্যবহার করা হয়। একটি মাটির কুপের গভীরতা ৯/১০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। এখান থেকে শিল্পীরা মাটি কিনে নেয় ট্রলি বা ভ্যান প্রতি ৮০০ টাকা করে। দুই বা তিন জন মিলে

www.pathagar.com

তাঁরা একটি ট্রলি অথবা অনেকে এককভাবে মাটি এনে থাকেন। সাধারণত ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে তাঁরা মাটি সংগ্রহ করেন। জমি থেকে মাটি সংগ্রহ করার পর সংরক্ষণ কাজ শুরু হয়। বাড়ির আঙ্গিনায় এক পার্শ্বে স্তুপাকারে মাটি সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সংগৃহীত মাটি পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখা হয় এবং চারদিকে বাঁশ বা কলাগাছ দিয়ে বেড়া দেয়া থাকে যেন বৃষ্টির পানিতে মাটি ধুয়ে না চলে যায়।

(খ) দ্বিতীয় ধাপে মাটিকে পাত্র তৈরির উপযোগী করার জন্য পরিমাণমতো মাটি কোদালের সাহায্যে প্রয়োজন অনুসারে কেটে নেয়। পানি দিয়ে মাটিকে ভিজিয়ে নরম করা হয়। মাটি লোহার কাঁচি দিয়ে পাতলা করে কেটে কেটে ছেনা করে এরপর তাতে প্রয়োজন মতো বালু মিশিয়ে পা দিয়ে মাটিকে মাড়ানো হয়। মাড়ানোর সময় মাটির মধ্য থেকে পাথর, কাঁকড় ধান, কাঠের টুকরো ইত্যাদি বের করে নেয়। এভাবে কয়েকবার মাটিকে মাড়ানো হয় কাজের উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত। এরপর পাত্র তৈরির সমপরিমাণ মাটি গোল তৈরি করা হয়।

(গ) সাধারণত তিনভাগে ভাগ করে থাকেন। যথা : ১. চাকার মাধ্যমে, ২. আথাইলের মাধ্যমে, ৩. শুধু হাত ব্যবহার করে। চাকার মাধ্যমে সাধারণত পানির কলস, ফুলদানি, ফুলের টব এ জাতীয় জিনিস তৈরি করা হয়। যেমনঃ- চাকার মাধ্যমে কলস তৈরি করার সময় ছেনা মাটি থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মাটি চাকার উপর রাখা হয়। তারপর শিল্পী দুই বা চাকা দুই দিকে বিছিয়ে দিয়ে এমনভাবে বসেন যেন চাকাটি তার দুই পায়ের মধ্যখানে থাকে। তবে উল্লেখ্য যে এই চাকাটি এক টুকরো পাথর কিংবা শক্ত কাঠের উপর বসানো থাকে। তার পাশে একটি পাত্রে কিছু পানি রাখা থাকে। যাতে শিল্পী প্রয়োজন মতো তার হাত ভিজিয়ে নিতে পাড়ে। এরপর তিনি ডান হাত দিয়ে চাকাটিকে গায়ের জোরে ঘুরিয়ে দেন। চাকাটি ঘুরতে থাকে এবং শিল্পী চাকার উপর রাখা কাদার হাতের কৌশলে নানা রকম শিল্পকর্মের আকৃতি দেন। এ কাজটি করার সময় তিনি মাঝে মাঝে তার পাশে রাখা পানির পাত্রে হাত ভিজিয়ে নেন। এভাবে চলতে থাকে একের পর এক শিল্পকর্ম প্রস্তুতের কাজ। এরপর আথাইলের সাহায্যে বিভিন্ন পাত্রের আকৃতি দেয়া হয়। ধুলঝাড়ি উজ্জ্বলকোঠা পাল পারায় অধিকাংশ মৃৎশিল্পীরা আথাইলের সাহায্যে পাত্রের আকৃতি দিয়ে থাকেন। প্রথমে আথাইলে মাটি গুটিয়ে রেখে তার উপর হাত দিয়ে পাত্রের আকৃতি দেওয়া হয়। আথাইলে মাটি বসিয়ে হিলের পাথর (শিলের পাথর) দিয়ে ঠেঁসে ঠেঁসে ছাচের সাথে মিলিয়ে নেয়া এবং মাটির তৈরি বৌকা দিয়ে ফিনিশিং বা মসৃণতা আনা হয়। মসৃণ করার কাজে হস্তনৈপুণ্যই যথেষ্ট। আথাইলের উপর মাটির গুটি বসানোর পূর্বে অবশ্যই বালু দিয়ে নিতে হবে যাতে তৈরিকৃত পাত্র খুব সহজেই ছাঁচ থেকে সরিয়ে নেয়া যায়। প্রায় ১৫-২০ মিনিট ধরে একজন শিল্পী পাত্রের প্রাথমিক আকৃতি দেন। প্রাথমিক আকৃতি শেষে উঁচু নিচু বা আল দিয়ে বর্ডার তৈরি করা হয়। বর্ডার দেবার কাজে পুরোনো কাপড়ের ন্যাকড়া সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

www.pathagar.com

ঢাকনা তৈরির কাজ একটু অন্যরকম। গোলাকার একটি কাঠের পাটাতন ঢাকনার আকৃতি দানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই পাটাতনের উপর মাটির দলা রেখে রুটি আকৃতি তৈরি করা হয়। দেখতে রুটির বেলনের মতো তা দিয়ে বেলা হয়। এটি হাত ও দলা দিয়ে বানানো হয়।

(ঘ) চূড়ান্ত পর্যায়ে পাত্রকে নির্ধারিত আকার দেওয়া হয় এবং মসৃণ করার কাজ শেষ হওয়ার পর পাত্রগুলো রোদে শুকাতে দেওয়া হয়। সাধারণত আঙ্গিনা বা খোলা জায়গায় পাত্রগুলো শুকানো হয়।

(ঙ) প্রয়োজন অনুযায়ী পাত্রগুলো রোদে শুকানো হয়। শুকানো শেষে পাত্রে রং দেওয়া হয়। বর্তমানে রং দেওয়ার জন্য বাজারের কৌটা রং ব্যবহার করেন শিল্পীরা।

(চ) কুমার সম্প্রদায় পাত্র পুড়ানোর চুলাকে পাইন বা পোন বলে অভিহিত করেন। চুলা তৈরির জন্য প্রথমে সমতল গর্তে রাখা হয়। পরে গর্তের চারপাশে উঁচু মাটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাঁশের চটা দিয়ে ঘন বেড়া দেওয়া হয়। বেড়া দেওয়ার সময় সামনের দিকে মাঝখানে একটু ফাঁকা রাখা হয় যেন জাল দেওয়া যায়। অতঃপর মুখটি রেখে পুরো বেড়া মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। চুলার উপরের দিকে ও অনুরূপ বাঁশের ও মাটি দিয়ে ছাউনি দেওয়া হয়। এই ছাউনির মাঝখানে ফাঁকা রাখা হয় যাতে আগুনের তাপ উপরে দিকে বের হতে পারে। তৈরিকৃত পাত্রগুলো চুলার উপরে সারিবদ্ধভাবে রাখা হয় এবং পাত্রের ফাঁকে ফাঁকে খড়কুটা ও গাছেল ডাল ইত্যাদি রাখা হয়। এরপর লাকরি দিয়ে ধীরে ধীরে আগুন জ্বালানো হয়। সমগ্র পাইনে আগুন ধরে গেলে নিচ থেকে জ্বালানি দেওয়া বন্ধ করা হয়।

২. প্রতিমাশিল্প

বাংলার দেব দেবীদের প্রতিমা প্রধানত মৃত্তিকায় গঠিত হয়। সে সকলের সৌন্দর্য দর্শক মাত্রকেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে। দেবদেবীর ধ্যানানুসারে প্রতিমা গঠিত হয় এবং বাংলার দূর্গা প্রতিমার মতো বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক প্রতিমা সম্বলিত দৈবী প্রতিমা সচরাচর লক্ষিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার এই মাতৃপ্রতিমার বর্ণনা করেছেন "দশভূজা দশ দিকে প্রসারিত যেখানে নানা আয়ধরূপে নানা শক্তি শোষিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত ধীর কেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্ ভূজা নানা প্রহরণধারিণী, শত্রুবিমর্দিনী ধীরেন্দ্রপৃষ্ঠ বিহারিণী দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপী বামে বানী বিদ্যাবিজ্ঞানদারিনী সঙ্গে বলরূপী কার্তিকের, কার্য সিদ্ধিরূপী গণেশ" সে প্রতিমা দেখলে ডাকতে ইচ্ছা হয়। ''সর্বমাঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বাথসাধিকে। শরণ্যে এম্বকে গৌরি নারায়নি! নমোহস্ততো" কালি, লক্ষ্মী, সরস্বতী এই সকল দেবীর ও কার্তিকের গণপতি প্রভৃতি দেবতার প্রতিমা এত ধ্যানা যুগ যে, সে সকলে কোনোরূপ ত্রুটি থাকে না।

www.pathagar.com

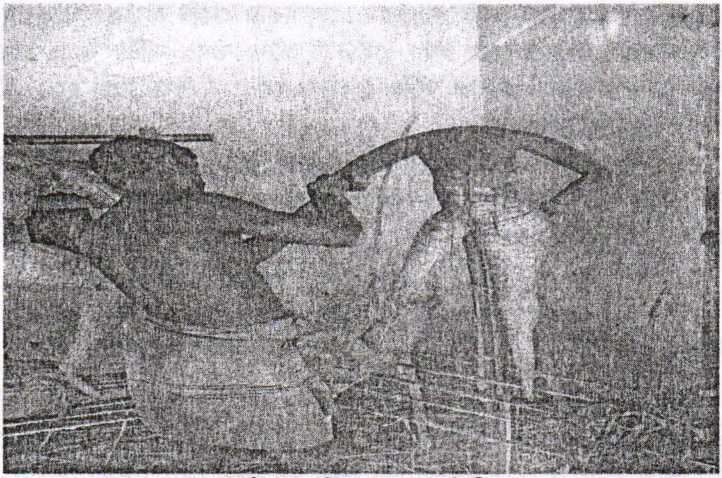

প্রতিমা তৈরিরত অবস্থায় শিল্পী

প্রতিমার রয়েছে প্রচুর জনপ্রিয়তা। হিন্দু ধর্মবলম্বীদের তৈরি হয় প্রতিমা। এ সকল প্রতিমার সাথে জড়িয়ে রয়েছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় ভাবনা। পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মনে করেন, বদুলিয়ার জমিদাররাই প্রথম ব্যক্তি যিনি পূজার উদ্দেশ্যে দূর্গা তৈরি করেন। যদি এটা সত্য হয় তবে এ প্রথার প্রাচীনত্ব আট বা নয়শত বছরের। কে.এম বর্মা বলেন, প্রতিমা শিল্প বর্তমানকালে আমরা যে রূপে বাংলায় দেখে থাকি সেটা এক সময় আকস্মাৎ উৎসব নয় বরং অতি প্রাচীন ঐতিহ্যের চলমান ধারা যেটা অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়েছে। সমীক্ষিত অঞ্চলের মৃৎশিল্পী শ্রী লক্ষণ রায় মালাকার এই শিল্পের সাথে জড়িত আছেন। অনেক বছর যাবৎ বংশ পরম্পরায় তাঁরা ঐ পেশার সাথে জড়িত। তার পূর্ব পুরুষরাও প্রতিমা তৈরি করতো। তাঁরা কয়েকটি ধাপে প্রতিমা তৈরি করে থাকেন। যেমন-প্রাথমিক কাঠামো দান-চূড়ান্ত আকৃতি দান-রঙ দেয়া- সাজসজ্জা।

প্রথমে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে কাঠামো তৈরি করা হয়। যার উপরে ধানের খর বাঁধা হয় এটি করতে এক দিন সময় লাগে। এটি তৈরি করার পর মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। এই কাজগুলো চলে অত্যন্ত ধীর গতিতে। মাটির কাঠামো তৈরি হয়ে আস্তে আস্তে চলে এর চূড়ান্ত আকৃতি দান। যখন পুরো কাঠামোটা তৈরি হয়ে যায় ছাচ ব্যবহারে তখন সঠিক ফলাফল অল্প সময়ে নিশ্চিত। হাতগুলো হাত দিয়েই নির্মিত এবং মুদ্রা ও প্রতিটি আঙ্গুলের সৌন্দর্য পুরো হাতের কমলতায় নির্মাণ হাতের স্পর্শে নির্মাণ করে থাকেন। এভাবেই ধীরে ধীরে বিভিন্ন অংশের আকৃতি দিতে থাকে শিল্পী। প্রতিমাটি একটি কাঠির সাহায্যে মসৃণ করা হয়। রঙ করার পূর্বে রোদে শুকানোর সময় বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দিতে পারে সেগুলো মেরামত করা হয়। ফাটলগুলো মাটি দিয়ে ভরাট করে মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। মাটির গুলানো পানির ন্যাকড়া ভিজিয়ে তা

www.pathagar.com

লাগিয়ে দেয়া হয়। পুরোটিতে আবার এঁটেল মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। এই প্রতিমা তৈরি করতে ১০ দিন সময় লাগে।

প্রতিমা গড়ার কাজ শেষ হলে তা রং করার পূর্বে কাঠামোতে সাদা প্রলেপ দেওয়া হয়। অতীতে খড়ি মাটি দিয়ে এই রং করা হতো। এখন বাজারের রং ব্যবহৃত হয়। দেব-দেবী অনুযায়ী বিশেষ রং দেওয়ার রীতি আছে।

যেমন দূর্গার বিভিন্নরূপ মনসা হয়ে থাকে হলুদ। কালি কালো রঙের। ব্রাশের সাহায্যে এ রং করা হয়। ছোটো বড়ো বিভিন্ন আকৃতির ব্রাশ রয়েছে। এরপর প্রতিমাকে রোদে শুকানো হয়।

প্রতিমা রং করা হয়ে গেলে চলে এর সাজসজ্জার কাজ। পোশাক গয়না পরানো হয়। লক্ষণ রায় বলেন পূর্বে এগুলো মাটি দিয়েই তৈরি করা হতো এখন এগুলো বাজার থেকে কিনে আনা হয়। শোলার কাগজের উপর পুথির কাট সিট চুমকি দিয়ে ভিজিয়ে এগুলো পাট পাট করে ভাজ করা হয়। মঙ্গল কামনা, প্রশান্তি লাভে দেবতা কল্পনায় প্রতিমা শক্তি ভূমিকা পালন করে থাকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাজে। বাংলার প্রতিমা শিল্প সম্পর্কে জি.জি. এম বাউডের মন্তব্য হলো- The lay figures of kartikeya made for his annual festival by the potters of Bengal, are offen twenty seven feet height। এছাড়া প্রতিমার সৌন্দর্যের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয় প্রকৃতি বিভিন্ন গড়নে সাদৃশ্যের ভিত্তিতেই যেন প্রতিমা পূর্ণতা পায়। এর মূল শক্তি হলো বাস্তবধর্মীতার সাথে বাস্তব থেকে বিমূর্তায়ন, পার্থিবের মধ্যে আধ্যাতিকের সংমিশ্রণ, নান্দনিকতার সাথে পবিত্রতার সমন্বয়।

৩. চুনশিল্প

পেশাজীবিদের মধ্যে চুন উৎপাদনকারী চুনারি অন্যতম। সাধারণত চুন উৎপাদনকারীকে চুনারি বলা হয়। পান খাওয়া বাংলার নারী-পুরুষের একটি শখ, অনেকের কাছে পান খাওয়া নেশার মতো। গ্রাম বাংলার অতিথি আপ্যায়নের পান একটি বিশেষ সামগ্রী, পান খাওয়ার জন্য চুন প্রধান উপাদান, যারা চুন তৈরি করে তাদেরকে চুনারি বলা হয়। চুনারি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। শামুক ও ঝিনুক থেকে যারা চুন তৈরি করে তাঁরা চুনারি হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের খুলনা, বরিশাল, যশোর, ফরিদপুর অঞ্চলে বেশিরভাগ চুনারিদের বাসস্থান। চুনারিরা ভূমিহীন। চুন তৈরির জন্য পরিশ্রম করতে হয় প্রচুর। চুনের ডালি মাথায় নিয়ে অথবা বাঁকে ঝুলিয়ে গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চুন বিক্রি করতে হয়। ধান, চাল, নগদ পয়সার বিনিময়ে চুন বিক্রি করে। চুনারিগণ পুকুর, বিল, খাল নদী হতে ঝিনুক সংগ্রহ করে সেগুলো পুড়িয়ে চুন প্রস্তুত করে। এ ব্যবসাতে তাঁরা পারদর্শী। অন্য কাজ তাঁরা বেশি করে না। মুসলমান চুনারিরা পেশার কারণে সাধারণ মুসলমান সমাজভূক্ত হতে পারে না। সাধারণ মুসলমান সমাজ তাদের সাথে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় না। চুনারিরা হাট বাজার পানের দোকানের পাশেই চুন বিক্রির জন্য বসে। চুন সুরকির সাহায্যে দালান তৈরি করা হয়। রসায়ন শিল্পেও চুন ব্যবহার করা হয়। চুন তৈরি এখন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হচ্ছে। ফলে গ্রামের চুনারিদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে।

www.pathagar.com

যুগী

সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় পানের ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। এই পান দ্বারা অতিথি আপ্যায়নের রেওয়াজ প্রাচীন বাংলা থেকে আধুনিক বাংলায় স্থানান্তরিত হয়েছে। বাংলাদেশ গ্রাম প্রধান ও দারিদ্র দেশ। বাঙালির অতিথি পরায়নতার কথা সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের জানা। অতিথিকে পান সুপারি দিয়ে আপ্যায়ন শুভ কাজেও এর ব্যবহার আছে। শ্রীকৃষ্ণের কীর্তনেও জানা যায়, বড়োই কৃষ্ণের দেয়া তাম্বুল রাধাকে তাম্বুল পাঠায় "কর্পূর বাসিত রাধা খাহ তাম্বুল, কাহকঞ্চির বচনে তোক্ষে দে আনুকূল"। তাম্বুলে থাকে পান সুপারি চিনি ফুল প্রভৃতি দ্রব্যাদি। পান-চুন গ্রাম বাংলায় লোকগান প্রচলিত। যেমন : পান খাইতে চুন লাগে।

চুন প্রস্তুত প্রণালী : ঝিনুক আহরণ

নদীতে মাছ যেভাবে ধরে সেভাবে জাল দিয়ে ঝিনুক শামুক আহরণ করা হয়। স্থানীয় ভাষায় ঝিনুককে বলা হয় সিতু ভুড়ি বের করা।

আহরিত 'সিতু' থেকে বাঁশের শক্ত মাটি দিয়ে অথবা লোহা দিয়ে ভুড়ি বের করা হয়। ঝিনুকের ভেতরে যে মাংসল পদার্থ থাকে তাকেই ভুড়ি বলে। এগুলো হাঁস-মুরগির প্রিয় খাবার। ঝিনুকের খোল থেকেই চুন তৈরি হয়। তাই ভুড়ি বের করার পর খোলটি ভালোভাবে বাছা হয়।

সিদ্ধ করা : ঝিনুকের খোল সিদ্ধ করা হয়। ডেকচিতে করে সিদ্ধ করতে ২ ঘন্টা সময় লাগে।

শুকানো : সিদ্ধ 'সিতু' বা খোল এরপর রোদে শুকাতে হয়।

পোড়ানো : সিতুগুলো এরপর কুটি বা পইন বা চুলাতে দীর্ঘক্ষণ পোড়ানো হয়। ভোর ৫.০০টা থেকে দুপুর ১২.০০ টা পর্যন্ত চুলায় পোড়ানো হয়। পোড়ানোর জন্য আম বা কাঠাল কাঠের খড়ি প্রয়োজন।

গরম পানিতে ঢালা

দীর্ঘ সময়ব্যাপী পোড়ানোর ফলে ঝিনুকের খোল সাদা রং ধারণ করে। এখানে খোলা বাছা হয়। বাশের চালুনি দিয়ে কালো রঙের খোলা বা সিতুগুলোকে আলাদা করা হয়। এগুলো কালো চুন নামে পরিচিত। 'কালোচুন' জমিতে সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পৃথক করা সাদা খোলাগুলো গরম পানিতে ঢাকা হয়। তখন তা ফুটতে শুরু করে। এ সময় বাঁশের কাঠি বা লাঠি দিয়ে নারা হয়। ধীরে ধীরে তা চুনে পরিণত হয়।

চুনের রং

চুনের রং সাদাকরণের কাজে কলা বা কাঁচা খোসা ব্যবহার করা হয়।

৪. নকশিকাঁথা

আবহমানকাল থেকে গ্রাম বাংলার মানুষেরা খাটকে শয়নোপযোগী তথা শীত নিবারণের জন্য কাঁথা ব্যবহার করে। সকলে এই নকশিকাঁথা তৈরি করে না কিন্তু ব্যবহার করতে আনন্দ পায়। উপহার হিসেবেও নকশিকাঁথাগুলো ব্যবহার করা হয়ে

www.pathagar.com

থাকে। আপনজন, সাহেব-সুবাহতা, মোড়ল মাতব্বর কিংবা বিশেষ কোনো কাজ সাধনের জন্য আনন্দাপ্লুত হয়ে এটি উপহার হিসেবে দিয়ে থাকেন।

নকশিকাঁথা বিবিধ

ক. জ্যামিতিক ছকে প্রস্তুতকৃত সাধারণ কাঁথা।
খ. বিভিন্ন ছবিযুক্ত নকশিকাঁথা।

বাংলাদেশে ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলা ও হরিপুরে নকশিকাঁথার প্রচলন দেখা যায়। বিশেষতঃ অভিবাসিত যে সকল মানুষ মালদহ, রাজশাহী মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছেন তাঁদের মাঝেই নকশিকাঁথার তৈরি প্রচলন দেখা যায়। নকশিকাঁথাকে তারা সুজনী বলে থাকেন। সাধারনতঃ নতুন অতিথি, জামাই-বেহাই বেড়াতে আসলে চৌকি কিংবা খাটে তোষকের উপর নকশিকাঁথা বিছিয়ে বিশেষ সম্মাননা প্রদর্শন চলছিল। নকশিকাঁথা সাধারনতঃ গাদু তরুলতা, পাখি কিংবা জ্যামিতিক নানা দক্ষতার সাথে সুতার কাজ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়।

নকশিকাঁথার উপকরণ

১. সূক্ষ্ম ব্যবহৃত কিংবা কম মূল্যমানের শাড়ি
২. মধ্যম গোছের সূঁচ/সুঁই
৩. বিভিন্ন রঙের সুতো
৪. সেলাইয়ের কাজের জন্য বাঁশ নির্মিত বড়ো টুকরি/চাঙ্গারী/ধামা
৫. সেলাইকারিনী/কারিগরের বসবার জন্য বাঁশ/দড়ির তৈরি টুম সদৃশ খাট। স্থানীয়ভাবে ঐ খাটকে তাঁরা মাইচ্যা বলে থাকেন।

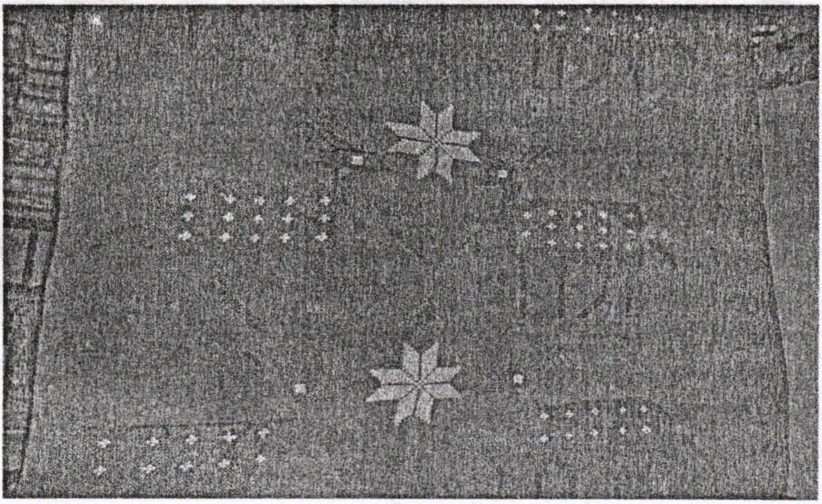

নকশিকাঁথা

www.pathagar.com

সাধারণত: গৃহবধূরা সকাল ও দুপুরের কাজ শেষ করে খাওয়া-দাওয়া শেষে কাঁথা সেলাইয়ের জন্য টুকরি নিয়ে বসে। একাধিক রমণী খোশগল্প, হাসি-তামাশায়ও হয়ে মনের মাধুরী মিশিয়ে অত্যন্ত ধীরে অথচ নিশ্চিত থাকতে সেলাই এর কাজ করে থাকেন। সবচাইতে মজার ব্যাপার হলো এর জন্য কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। বংশপরম্পরায় মায়ে ঝিয়ে, ননদ-ভাবী, জাত্র মিলে কাজটি করে থাকে এবং এরই মধ্যে প্রশিক্ষণ কাজটি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

একটি নকশিকাঁথা তৈরিতে কমপক্ষে ৬/৭ মাস সময় লাগে। যেহেতু কাজের ফাঁকে কাজটি করা হয় সে কারণে সময়টা একটু বেশি লাগে। একটি কাঁথা তৈরিতে ২টি নতুন শাড়ি, ভিতরে কিছু পুরাতন অথচ পরিষ্কার কাপড়ের প্রয়োজন হয়। সমস্ত কাঁথাটি সেলাইয়ের অন্তত এক কেজি থেকে দেড় কেজি সুতার প্রয়োজন হয়। এসব সুতাকে তাঁরা 'ধাগা' বলে। ধাগার সরু পাট বিচ্ছিন্ন করে। শাটগুলো 'লর' বলা হয়। কয়েকটি নিয়ে একটি মোটা ধাগা তৈরি হয়। ধাগাটি সূচে লাগিয়ে বুদ্ধিমত্তা ও ধৈর্য্যের সাথে সেলাই করা হয়।

৫. শোলাশিল্প

শোলাশিল্প অর্থাৎ শোলার কাজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশের সর্বত্র শোলা পাওয়া যায়। পুকুরে জলাভূমিতে ডোবায় শোলা উৎপন্ন হয়। শোলার চাষ এখনও আমাদের দেশে জনপ্রিয় হয়ে না উঠলেও শোলার কাজ অত্যন্ত জনপ্রিয়।

শোলা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের নক্সা করা দ্রব্যাদি তৈরি হয়। যেমন হিন্দুদের বিয়েতে বর কনের মাথায় টোপর, গলার মালা প্রভৃতি। ঘর সাজানোর জন্য সোলার প্রয়োজন অত্যাধিক। শোলার ফুল শোলা কেটে কেটে লেম, কারুকার্যময় ছবি প্রভৃতি তৈরি করা যায়। তাছাড়া শোলা দিয়ে ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের বিভিন্ন প্রকারের খেলনা তৈরি করে অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।

শোলার চাষ বৃদ্ধি করলে, কিংবা সরকারি পর্যায়ে সোলার চাষাবাদ করলে শোলা রপ্তানি করেও অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যেতে পারে। রিন্টু রায় শোলার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

৬. কারুশিল্প

কারুশিল্পী হিসেবে আমাদের সমাজে হিন্দু, হাড়ি বা ডোম শ্রেণির লোকেরা বাঁশ জাত দ্রব্যাদি তৈরি করে। কারুশিল্পের মধ্যে কুলা, ঢাকি, চ্যাংগাড়ি, ডুলি, পলো, চাটাই, ফুলের ডালা, ধামা, খৈ চালনি, পাখা, মাছ ধরা ঢেহর, বাঁশের ছোটো খাট বসার জন্য ইত্যাদি তৈরি করে। কারুশিল্পীদের তাঁতীও বলা হয়ে থাকে। এটি সাধারণত তাদের বংশগত পেশা।

৭. দারুশিল্প

কাঠ বা কাঠ জাতীয় দ্রব্যাদির সমন্বয়ে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তৈরি করে। তাঁরা সমাজে কাঠ মিস্ত্রী বা ছুতোর হিসেবে পরিচিত। চেয়ার-

www.pathagar.com

টেবিল, খাট-পালঙ্ক, বেঞ্চ, আলমারি, আলনা, শোকেস, প্রভৃতি তৈরি করে। এসব জিনিস তৈরি করতে দারুশিল্পীরা বিভিন্ন প্রকার কাঠ যেমন- সেগুন কাঠ, কাঁঠাল কাঠ, মেহগনি কাঠ, বাকাম কাঠ, ইউকেলিপ্টাস আরও অনেক। তবে আগের তুলনায় আধুনিকযুগে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। আগে এ রকম একটা নকশা করা হতো না তার তুলনায় এখন অনেক বেশি করা হয়। অর্থাৎ বর্তমানের তুলনায় তখন ছিল অত্যন্ত নগণ্য।

তথ্যনির্দেশ

১. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, পৃ :২০৮৮।

২. এ. এইচ. এম. মোস্তাফিজুর রহমান, মোঃ ইকবাল হুসাইন, সমাজ ও সম্প্রদায়, লেখাপড়া ৩৮/২, বাংলাবাজার ঢাকা, পৃ:৩৩।

৩ আলোকচিত্র- ৯ ও ১০।

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

প্রাচীনকালে ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের সাধারণ নারীরা পরিধান করতেন 'ফোতা' 'বুকনী' বা 'পাটানী' নামক রঙিন চারকোণা একটি মাত্র বস্ত্র খণ্ড। কেবল কোচপলিয়া-রাজবংশী উপজাতিই নয় বরং মুসলমানদের ক্ষেত্রেও প্রচলিত ছিলো এ ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ। কেউ কেউ ব্যবহার করতেন 'আগরণ' ও 'ফোতা' নামক উপরে ও নিচে দুই খণ্ড বস্ত্র। অভিজাত মুসলিম রমনীদের মধ্যে খাটো কামিজ, সালোয়ার ওড়না, সিল্কের শাড়ি, কাঁচুলি এবং অভিজাত মুসলিম পুরুষদের সাদা পাগড়ি, লম্বা ঢিলা জামা, গলাবন্ধ, টুপি ইত্যাদি পরিধান করতে দেখা যেতো। দরিদ্র পুরুষগণ সাধারণভাবে পরিধান করতেন 'লেংটি'। কিছুটা অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা হাঁটু পর্যন্ত ধুতি ব্যবহার করতেন।

ভদ্রলোকের শীতবস্ত্র ছিল অ্যাণ্ডির চাদর, বুনাত শাল, তসর অথবা গরদের বস্ত্র। এগুলো ছিল সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। তেঁতুলিয়া অঞ্চলে রেশমি বস্ত্রের আমদানির সংবাদ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ অঞ্চলেও রেশমি বস্ত্র প্রচলিত ছিল।[১৫] তবে সাধারণ পুরুষ পরিধান করতেন ধুতি, চাদর ও পিরান। মুসলমানরা ধুতি এবং পাজামা পিরান-লুঙ্গি উভয়ই ব্যবহার করতেন। কৃষকগণ সাধারণভাবে লেংটিই ব্যবহার করতেন। কিন্তু কোথাও বেড়াতে গেলে ব্যবসায়ীদের মতো পরিধান করতেন স্বল্পমূল্যের পরিষ্কার জামাকাপড়।[১৬]

একেবারে প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে সেলাইবিহীন বস্ত্র পরিধানের রীতি প্রচলিত ছিল। পুরুষেরা রাখতেন লম্বা বাবরীচুল। পাদুকা ব্যবহারের প্রচলিত তেমন একটা ছিল না। ধনী লোকেরাও পরতেন কাঠের পাদুকা বা খড়ম। নারীরা পাদুকা ব্যবহার করতেন খুব কম। তাঁরা গলায় পরতেন ফুলের মালা, খোঁপায় গুজতেন ফুল। স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত। দরিদ্র স্ত্রী লোকেরা পরতেন দস্তার খারু, গলায় প্রবালের মালা। মধ্যবিত্ত রমনীরা পরতেন রূপোর অলংকার। প্রচলিত অন্যান্য অলঙ্কারের মধ্যে ছিল পায়ে-বাগ, ছড়া, মল, হাত-কাটাবাজু, চুড়ি বালি, গলায় তাবিজ, মালায়- সিঁথি পাটি, কানে মাকড়ি ও নাকে নোলোক।

মানব বিকাশের উষালগ্ন থেকেই সে প্রতিদিন নিত্য নতুনের সঙ্গে সখ্যতা গড়ার চেষ্টায় রত। সে আলোকেই সে এখন আধুনিক। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি শষ্য উৎপাদন ও বিকিকিনি অপেক্ষাকৃত সহজতর হওয়ায় নিজেকে পোষাকিভাবে উপস্থাপন করার জন্য পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবহার হয়ে থাকে।

রানীশংকৈলউপজেলায় হিন্দু-মুসলমান, আদিবাসী, বহিরাগত অর্থাৎ নানা ধর্মের-বর্ণের মানুষের বসবাস। ভিন্নতার কারণে পোষাক পরিচ্ছদের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

উপজেলার মুসলমান পুরুষেরা সকলেই বাড়িতে, আশে-পাশে লুঙ্গি পরিধান করে থাকে। গায়ে সার্ট, মুরব্বি মুসলমানেরা পাঞ্জাবি ব্যবহারে অভ্যস্থ হয়ে উঠেন।

এলাকাটি হিন্দু অধ্যুষিত হওয়ায় পৃথক বর্ণনায় জানাতে হচ্ছে, হিন্দু সম্প্রদায়ের বেশীরভাগ পুরুষেরা স্থানীয়ভাবে এবং বাড়িতে লুঙ্গি ব্যবহার করে থাকে। অন্য একটি অংশ হাটে-বাজারে বাড়িতে হাটুর উপরে মার্কিনের এক খণ্ড কাপড় এখনও পরিধান করছে।

পরিবর্তনের ধারায় স্থানীয় আদিবাসী পোশাক-পরিচ্ছদেও এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক বিশেষতঃ নারীদের পোশাকে পরিলক্ষিত হলেও পুরুষদের মধ্যে লুঙ্গি, ফুল-প্যান্ট, শিশুদের রাবার প্যান্ট, বড়ো মেয়েরা পায়জামা-কামিজ পরিধান করে থাকে।

মুসলমান নারীরা শাড়ি-ব্লাউজ পরিধান করে থাকে সার্বক্ষণিকভাবে, মুসলমান মেয়েরা পায়জামা-কামিজ, ছোটো মেয়েরা ফ্রক পরিধান করে থাকে।

হিন্দু রমনীরা শাড়ি-ব্লাউজ পরিধান করে গ্রাম শহরতলীতে কিন্তু নিভৃত পল্লীতে অবস্থাভেদে এখনও এক কাপড়ের বুকনী ব্যবহার করে থাকে।

বুকনী পরিহিত অবস্থায় এক আদিবাসী নারী

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-মণ্ডলী, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ফুলপ্যান্ট, টি-সার্ট, মেয়েদের পাজামা-কামিজের প্রচলন বেশি। স্থানীয় হাট-বাজারে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পুরুষেরা সাধারণত লুঙ্গি কলারওলা তিন পকেটওয়ালা সার্ট এর ব্যবহার খুব বেশি পরিলক্ষিত হয়।

কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এমন গ্রামীণ মানুষেরা, হিন্দু-মুসলমান আদিবাসী সকলেই একটি বিষয়ে অভিন্ন তাহলো : হাটে-বাজারে, সকল স্থানেই কাঁধে গামছার ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষনীয়।

www.pathagar.com

লোকসংগীত

লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রধান অংশ লোকসংগীত। ইংরেজি প্রতিশব্দ (Folksong) সাধারণভাবে দীর্ঘদিনে মুখে মুখে প্রচলিত ও সমাজে নিজস্ব ধারায় স্বীকৃত গানগুলোই লোকসংগীত নামে প্রচলিত। লোকসংগীতের রূপ ও বিষয়গত বৈচিত্র্য লোকসংগীতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আঞ্চলিক পরিবেশ, আঞ্চলিক ভাষার মধ্য দিয়ে আঞ্চলিকতা লক্ষ্য করা যায়। ঝুমুর, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, সারি, জারি, বাউল প্রভৃতি লোকসংগীতের অন্তর্গত। লোকসংগীতে সুরের ও ভাবের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিকতা লক্ষ্য করা যায়। ঝুমুর, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, সারি, জারি, বাউল, প্রভৃতি লোকসংগীতের অন্তর্ভুক্ত। লোকসংগীতে সুরের ও ভাবের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে বিষয়ের ব্যঞ্জনা রয়েছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগীতের বিষয়গত বিশ্লেষণে পাওয়া যায় প্রেম, সামাজিক, ব্যক্তি সম্পর্কিত, হাস্য রসাত্মক, রাজনৈতিক, প্রকৃতিগত, দেশপ্রেমমূলক, বিদ্রুপাত্মক প্রভৃতি। লোকসংগীতের প্রতিপাদ্য তার বিষয়ের তুলনায় সুরের উপর নির্ভরশীল।

লোকসংগীত আবহমান মানব সমাজের সৃষ্টিশীল চেতনার স্বাক্ষর বহন করে। অঞ্চলভিত্তিক লোকসংগীত খুঁজে পাওয়া যায় সমাজ ও জীবন প্রণালির নানা অনুষঙ্গ, লোকবিশ্বাস, লোকপ্রথা ও অন্যান্য ঐতিহ্যগত বিষয়। কালের বিবর্তন ধারায় সঙ্গতি রক্ষা এখনো লোকসংগীত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ শৈল্পিক আবেদন ছড়িয়ে দেয়। সে কারণেই লোকসংগীতের জনপ্রিয়তা এখনো তুলনা নিবৃত্ত।

বিষয় ও ভাবের ক্ষেত্রে লোকসংগীতের অঞ্চলভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। শুধু অঞ্চলভিত্তিকই নয়, সমাজের নানা স্তরের মানুষেরা নানা প্রকৃতির লোকসংগীতের চর্চা করে থাকে। এভাবে লোকসংগীত আদিকাল থেকেই শত ধারায় উৎসাহিত হয়ে প্রান্তিক মানুষের জীবন চর্চাকে অনুপ্রাণিত করছে। অর্থাৎ মানব জীবনের সঙ্গে সংগীত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আদিমকালের শিকার সংগ্রহ, পরবর্তীকালের কৃষি এবং সামগ্রিকভাবে জীবন চর্চার উপলক্ষ্যে জনজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের ব্যঞ্জনা, গোষ্ঠী এবং তার অন্তর্গত ব্যক্তির সুখ-শোক, আনন্দ-যন্ত্রণা-ক্রোধ-প্রশান্তি সবই প্রতিমা মন্ত হতে পারে সংগীতে। জনজীবনে বিভিন্ন যুগ পর্যায়ে বিচিত্রতর জনগোষ্ঠী ও ধর্মের প্রভাবে এদের সংগীতে এসেছে বৈচিত্র্য, সময়ের বিবর্তনে রূপান্তর, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে প্রচুর। স্পষ্টত সমীকৃত এলাকা টাঙ্গাইল জেলার সংগৃহীত লোকসংগীতে তাই লক্ষণীয়। সমীকৃত এলাকা থেকে যেসব লোকসংগীত সংগৃহীত হয়েছে তা উল্লেখপূর্বক বিশ্লেষণের প্রয়াস পাবো।

১. বারোমাইস্যা

ভারত উপমহাদেশে প্রায় সকল ভাষাতেই বারোমাসি ছাড়া গান আছে তবে বাংলা সাহিত্যেও কম নয়। আধুনিক সাহিত্যে বারোমাসির ব্যবহার নেই ঠিকই, কিন্তু

www.pathagar.com

মধ্যযুগে এর ব্যাপকতা এতো বেশি ছিল যে, তখন বারোমাসিবিহীন বাংলা কাব্য খুব কমই দেখা যায়। বারমাসি সংগীত সম্পর্কে বলতে গিয়ে ড. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য বলেছেন- বারোমাসি বলতে বুঝায় ছয় ঋতু বা বারো মাসের পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে মানব-মানবীর বিচিত্র ও বিশিষ্ট মানসপ্রতিমা। কেউ কেউ বলেছেন– লৌকিক ধারায় বারোমাইস্যাগুলো স্ত্রীলোকের সুখ দুঃখের রোজনামচা।

বারোমাইস্যা গানে মূলত বিরহ-মিলন প্রভৃতি প্রায় অবস্থার সংশ্লেষ লক্ষ্য করা যায়। তবে লক্ষ্যণীয় যে, বারোমাইস্যা গানগুলো নারীকে নিয়ে হলেও এগুলো পুরুষরাই রচনা করেছে এবং সে কারণে এতে দেহকেন্দ্রিক আবেগ প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন এরূপ একটি বারোমাইস্যা সংগীত–

বন্ধু আইলো না আইলো না
আমারে দেখিতে বন্ধু আইলো না
তালের পিঠা বানাইয়া কারে বা খাওয়াই
ডানে বামে চাইয়্যা দেখি
আমার মনের মানুষ নাই
বন্ধু আইলো না আইলো না
আমারে দেখিতে বন্ধু আইলো না
ভাদ্র মাস চলিয়া গেল
আইলো রে আশ্বিন
গোয়াল ঘরে যাইয়া দেখি আমার
গাই হইছে গাভীন
গাইরে আইলো দুধে হইলো
মাগনোরে ছানা
কত লোকে খাইলো গেলো
আমার প্রান বন্ধু খাইলো না
বন্ধু আইলো না আইলো না
আমারে দেখিতে বন্ধু আইলো না
আশ্বিন মাস চলিয়া গেল
আইলো রে কার্তিক
যৌবনের জ্বালা আমার দেহে যে অধিক
কার্তিক চলিয়া গেল
আইলো রে অগ্রহায়ণ
অগ্রহায়ণেতে ফসল আমার খেতে আমন ধান
আমন ধানে ভাজলাম আমি মুড়ি চিড়া খৈ
গাছে পাকা সবরি কলা গামছা বান্ধা দই
বন্ধু আইলো না আইলো না
আমারে দেখিতে বন্ধু আইলো না
অগ্রহায়ণ মাস চলিয়া গেল পৌষে দিল দেখা
বাসরো সাজাইয়া আমি বসে রইলাম একা

www.pathagar.com

মাঘ মাসেতে বন্ধু আইতো যদি না লাগিতো কাথা
বন্ধুয়ারে বুকে লইয়া দূর করিতাম ব্যথা
মাঘ মাস চলিয়া গেল
আইলো রে ফাগুন।
ঘুষিয়া ঘুষিয়া জ্বলে আমার যৌবনের আগুন
ফাগুন মাস চলিয়া গেল
আলো চৈত্রিক মাস
ঘরের ভাত ফুরাইয়া গেল
এখন করি হায় হুতাস
বারো মাসে ষড়ঋতু পার হইয়া যায়
বাবু সুনীলের যৌবন গেলো কার আশায়
বন্ধু আইলো না বন্ধু আইলো না আইলো না
আমারে দেখিতে বন্ধু আইলো না
আসতো যদি প্রাণের বন্ধু দুঃখতো থাকতো না
বন্ধু আইলো না বন্ধু আইলো না
আমারে দেখিতে বন্ধু আইলো না
শীত গেল বসন্ত ঐনা এলোরে
সামনে ফাগুন মাস
বিরহিনীর মনের আগুন জ্বলে বারো মাস
দূর দেশে চাকরি ঐ না করে রে
সাধু সওদাগর
কোন রমনী খাওয়াইয়া রাখছে কাঞ্চা দুধের সর ॥

স্বামী তার সহধর্মিনীকে একা রেখে দূরে কোথাও চলে গেছে। বহু দিন অতিক্রান্ত হয়, কিন্তু প্রাণপ্রিয় স্বামী আসে না। স্বামীর জন্য বিরহিনী নারীর নানা আয়োজন। অর্থাৎ তার হৃদয়ের বিচিত্র ভাব ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রকাশ পেয়েছে। দিনের পর দিন অপেক্ষা করার পর যখন অপেক্ষার অবসান ঘটেনি তখন নারী তার রূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে বলে- ডালিম রসে টলমল যৌবনকে সে আর ধরে রাখতে পারবে না। কারণ আশে পাশে অনেক কাকের দল, নারীর সেই যৌবনের অমৃত রস পানের অপেক্ষায়। এ বিষয়গুলো মূর্ত হয়ে উঠেছে সংগীতের সুর-মূর্ছনায়। যেমন–

বিদেশেতে যাইবা ঐ না বন্ধু আমি যাইবো না
থুইয়া যাইবা নতুন যৌবন বন্ধু আইসা পাইবা না
চারা গাছে ঐ না বন্ধু রে
ডালিম রসে টলমল
আশেপাশে ঘুর ঘুর করে রসিক কাকের দল
বন্ধু যদি আসতো ঐ না বাড়ি রে
যৌবন করতাম দান
সোনা দিয়া বাইন্ধা দিতাম বন্ধুর দুইটি কান।

www.pathagar.com

অর্থাৎ বলা যায়- নারীরা সর্বদাই চেয়েছে তার প্রিয় স্বামীকে কাছাকাছি রাখতে। যখনই কোনো কারণে কিংবা জীবিকা নির্বাহের তাগিদে দূরে কোথাও গিয়েছে তখন বিরহী নারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে বারোমাইস্যা গানগুলো। নারীর মনের আবেগজনিত এই গানগুলোর আবেদন অতীতে ছিল বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কারণ সর্ব যুগের সর্ব মানব মনের আবেদন এতে প্রতিফলিত।

পৃথিবীর আদিম ধর্মবিশ্বাসের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা দেখেছেন, কোনো কোনো গোষ্ঠী জগৎ নিয়ন্তা এক শক্তিধর আত্মার কল্পনা করা হয়েছে যাকে মানা বলা হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলার সংগৃহীত একটি সংগীতে পাখির রূপকে অদৃশ্য এক আত্মার অস্তিত্বের কথা ব্যক্ত হয়েছে। যেমন–

এত ভালো বাসলাম যারে
সে কেন এমন করে
কার ছলনায় পড়ে বন্ধু
বাড়ায় বুকের যন্ত্রণা
হৃদয়ের ধন ময়না টিয়া
আমারে না বলিয়া
কার নিড়েতে রও ঘুমাইয়া
করে আমার সাথে ছলনা ॥

উপর্যুক্ত সংগীতে 'ময়না টিয়া' আত্মার রূপকে ব্যবহৃত হয়েছে। আত্মার চিরপ্রশান্তির জন্য খোদাকে অনেক বেশি ভালোবেসেছে। কিন্তু সেই ভালোবাসাতে ছিল শুধু ছলনা। ফলত আত্মাকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। এ আত্মার ধারণা শুধু বাংলার লোকসংগীতে আছে তা নয়, জাভা বর্নিওসহ পৃথিবীর অনেক স্থানেই আদিবাসীদের মধ্যে এমন ধারণা আছে যে, আত্মা পাখির মতো। এমনকি তাঁরা চাল বা শস্য ছড়িয়ে মুখে পাখি ডাকার মতো সুর করে আত্মাকে ধরে রাখতে সচেষ্ট হয়।

কোনো জাতিগোষ্ঠীর মনোজাগতিক গঠন অনেকটাই নির্ভর করে তার সমাজ কাঠামোর ওপর। কারণ সমাজ কাঠামো প্রত্যক্ষভাবে তার চিন্তা-চেতনার জগতকে প্রভাবিত করে। অনার্য বাংলার সমাজ ছিল মূলত স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম সমাজভিত্তিক কৌম সমাজ, যার প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি। আর এই কৃষিজীবী মানুষের চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে লোকসংগীতে। যেমন–

ধান গেলো মরিয়া
ধানের ছোবা ধরিয়া
সোনার দেওয়া নামো লো
কবীর গেলো গামিয়া ॥

বৃষ্টি সংক্রান্ত সংগীতে গ্রামের অধিকাংশ মেয়েরা অংশগ্রহণ করে। সংগীত পরিবেশনের সময় তাঁরা বৃষ্টি দেবতার সন্তুষ্টি লাভের আশায় নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করে থাকে। তাদের বিশ্বাস রুষ্ট দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য এ আয়োজন। অবশ্য তাদের এই বিশ্বাসের মূলে ব্যাখ্যা আছে। উল্লেখ্য যে, মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সওদাগর পালায় বেহুলা-

www.pathagar.com

লক্ষ্মীন্দরের বাসর ঘরে যখন লক্ষ্মীন্দর সাপের দংশনে মারা যায় তখন, মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরে পেতে বেহুলা দেবতার উদ্দেশ্যে নৃত্য পরিবেশন করেন এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণপ্রিয় স্বামীর জীবন ফিরে পায়। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে বৃষ্টি নামানোর সংগীতে শুধু নারীদের অংশগ্রহণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত। কারণ নারীদের সঙ্গে জমির উর্বরা শক্তির সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে।

২. ধুয়াগান

ধুয়াগান টাঙ্গাইল জেলার ঐতিহ্যবাহী গান। ঐতিহ্যবাহী এ গানের স্রষ্টা গ্রামীণ লোকের শিল্পীমন। লোকসমাজে এ গানের প্রচলন কবে থেকে তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে একথা বলা যায় যে, কৃষি নির্ভর লোকসামজে ধুয়া গানের প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। ঠাকুরগাঁও অঞ্চলেও এর প্রচলন রয়েছে। লোকেরা যখন মাঠ ফাঁটা রোদ্রে কাজ করতে করতে দেহে কর্মক্লান্তি চলে আসে তখন মনে প্রফুল্ল, কর্মে চাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনার জন্য উচ্চ সুরে কণ্ঠে আওয়াজ তুলে ধুয়া গান পরিবেশন করে। ধুয়া গানের নামকরণ সম্পর্কে তথ্য নিতে গিয়ে জানা যায়, পাট ধোয়ার সময় এক ধরনের গান পরিবেশিত হতো। মূলত 'ধোয়া' শব্দ থেকে ধুয়া গানের নামকরণ করা হয়েছে। বাড়ি থেকে দূরের কোনো মাঠে লোক যখন কাজ করতে যায় তখন সবাই একসঙ্গে একই সুরে গান ধরে। পাশের অন্য ক্ষেতের লোকেরা সে গান শুনে তাঁরাও গান গাইতে শুরু করে। এক পর্যায়ে শুরু হয় গানের মাধ্যমে প্রশ্ন-উত্তরের পালা। পূর্বে এ গানের প্রতিযোগিতা মাঠ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকলেও সময় ও মানুষের রুচির চাহিদা তথা চিত্তবিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ধুয়া গানের স্থান হয় লোকসমাজে। এ গানের আসর বসে বাড়ির উঠানে, কিংবা বাড়ির পাশে খোলা কোনো মাঠে। ধুয়া গানের রস আস্বাদন করার জন্য আসরে আগমন ঘটে সমাজের সকল শ্রেণির, সকল বয়সের মানুষদের।

ধুয়া গানের পালা গাওয়ার সময় গায়কগণ দু'দলে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক দলে একজন করে মূল গায়েন এবং সহযোগী হিসেবে তিন-চারজন দোহার থাকে। এক দল গানের মাধ্যমেই প্রশ্ন করে, আরেক দল গানের মাধ্যমেই সেই প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং গানের মধ্যে তাঁরা প্রশ্ন করে অন্যেরা জবাব দেয়। এভাবে চলতে থাকে প্রশ্নের পালা। প্রশ্নের বেড়াজালে যদি কোনো দল হেরে যায় তখন সেই দল পরাজয় বরণ করে। জয়ী দলকে দর্শক শ্রোতা কিংবা গানের আয়োজকরা অনেক সময় পুরস্কৃত করে থাকেন। এক সময় ধুয়া গানের গায়েনদের বেশ কদর ছিল। দূর-দূরান্ত থেকে আয়োজকরা গানের বায়না নিতে আসতেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য দিন দিন ক্রমান্বয়ে এ গানের জনপ্রিয়তা কমে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ হিসেবে প্রাথমিকভাবে যে বিষয়টি লক্ষিত তা হলো পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগ্রাসন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মোহে জীবন ঘনিষ্ঠ নিজস্ব সংস্কৃতিকে পশ্চাতে ফেলেছে। অথচ অতীতে এই সংস্কৃতি ছিল চিত্তবিনোদনের অন্যতম মাধ্যম।

শিল্পীরা আসরে গান পরিবেশনের সময় অত্যন্ত সাদামাটা পোশাকে অর্থাৎ ধুতি আর লুঙ্গি পরিধান করতেন। এ গানে যে সব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতো সেগুলোর মধ্যে

www.pathagar.com

অন্যতম হলো খোল, জুড়ি, একতাঁরা, খঞ্জরি ইত্যাদি। গানের তালে তালে শিল্পীরা হালকাভাবে শরীর দুলিয়ে নৃত্য পরিবেশন করেন।

ধুয়া গানের বিষয়বস্তু বহুবিধ। মানব জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা এ গানে উঠে আসেনি। ধর্মীয় অনুষঙ্গ, সামাজিক রীতি-নীতি, প্রাকৃতিক প্রসঙ্গ, ঐতিহাসিক প্রভৃতি বিষয় ধুয়া গানের মূল বিষয়বস্তু হিসেবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। যেমন- প্রাকৃতিক দূর্যোগের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত গানে–

ওরে সন তেরোশো পনেরই সনে
আল্লাহ গজব দিলেন সংসারে
মা রমজানের আট-ই তারিখে এ হে ... এ ... হে
ওরে গুরু গুরু কলে আই রে তুফান
বুধবারের দিন বৈকালে
ঘর-দরজা নিল উড়াইয়া
লা- ইলা- কলেমা পড়েন
তুফানে কিছু না মানে এ... হে ... হে
ওরে কি বলব ভাই দারুন তুফানের কথা
গাছ বৃক্ষের নাই পাতা
টিনের ঘর ভাই নিয়ে গেলো কোথা
আলিমুদ্দী ভাইবা বলে তুফান দিছে বিধাতা
কি বলব ভাই দারুন তুফানের কতা
তাল তলার ঐ চরের মধ্যে কি গজব দিছে বিধাতা।

অর্থাৎ এ গানটিতে প্রাকৃতিক দূর্যোগের নিষ্ঠুরতার দৃশ্য ফুটে উঠেছে। এক কথায় প্রাকৃতিক দূর্যোগের কবলে পড়ে মানুষের শেষ সহায়-সম্বল হারিয়েছে। সব কিছু হারিয়ে তাই ব্যথিত মন গানের মাধ্যমে সেসব দুঃখ-কষ্টের কথা বর্ণনা করে নিজেকে হাল্কা করেছে। অনেক সময় প্রাকৃতিক দূর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে লোকসমাজ বিভিন্ন অলৌকিক শক্তি কিংবা কোনো দেবদেবী বা ধর্মাশ্রিত বাণী সম্বলিত গান পরিবেশন করে। লোকসংগীতের এই উপবিভাগে ধর্ম ও লোককাহিনির সংমিশ্রণ ঘটেছে। খণ্ড খণ্ড শাস্ত্রীয় ধর্মের আদলে বা কাহিনি পরম্পরা বর্ণিত অশাস্ত্রীয় এ সংগীত মানুষকে আবেগঘন করে তোলে। আবেগ প্রবণ লোকসমাজের চিত্ত সবসময় কল্পনার নীলাকাশে বিচরণ করতে চায়। তাই ধুয়া গানের মধ্যে লোকমনের বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। যেমন-

ওরে নছিমুদ্দি কয় মালেক সাই-ই
তোমার নাম বিনে আর গতি নাই
কামের কারণ ঘুরিয়া বেড়াই আ --আ
ওরে তোমার আছে গো বরকত
কোরআনেতে বাই শুনতে পাই
দু হস্তে দুই খঞ্জনি বাইবার

www.pathagar.com

খঞ্জরিতে তাল মিলে না বাই
ওরে এক অঘাটের পুরুষ জলে নামাইছিল
ডুব দিয়ে কন্যা হইলো
সওদাগর আইসা তারে ধইর‍্যা নিল
ওরে পুরুষ হইয়ে নামলাম জলে
কন্যা হইয়া উঠলাম নায়ে
বারো বছর খাইলাম বাণিজ্যের সদাই
সেই কোনো জনা ছিল গো
বয়াতি বলে দেও আমায় ॥

তাহলে সহজে অনুমান করা যায় যে, এ গানটিতে আল্লাহর মাহাত্ম এবং জলে নামার পর কন্যা হয়ে নৌকায় ফিরে আসা নিঃসন্দেহে অলৌকিকতা বিষয় পরিস্ফুটিত।

৩. জারিগান

এক.

খুমিয়া দিখি যাই
যাদের বুকের রক্তের বিনিময়ে
স্বাধীনতা পাই।
কোনো যুগে খুন করিয়া খুনিয়া নাম নিলে
৭১ এ হাজার হাজার মানুষ খাইলে
তোমার বুকের স্বচ্ছ জলে
লাল রক্তে নাম লেখালে
তাইতো তোমার ফুলে ফুলে
তেদীয়টা সবজাই।
আজো তোমার খুজে নারিদের ঠিকানা
স্ত্রী খুতো স্বামীর অসিছ সন্তান খুজে মা
মা বলে কইরে বাছা
সবাই এল খুই কোষা
পথ চেয়ে বসে আছি
তোমারি আশায় ॥

দুই.

যখন দূর আকাশে লাল সূর্য আলোর কুষণ ভরে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তোমায় মনে পড়ে।
যখন লাল সবুজের পতাকাটি
আকাশে উড়ো
সাত কোটি বাঙালির বুকের মাঝে রাখা

www.pathagar.com

সব কিছু উজার করে দেশকে ভালোবাসা,
তোমার বুকের রক্তে কৃষ্ণ চূড়ায়
রক্ত জাবায় ঝরে ॥
ভুলিনিতো আমরা তোমায় কভু ভুলবোনা
তোমার মহত্ব আর দেশ প্রেমের হয় না তুলনা
তুমি যুগে যুগে থাকবে জেগে
বাঙালির অন্তরে॥
কথা-মালেক
মাইকেল চন্দ্র রায়
বড়ো বড়ো ভাবী গে
ওমোর সোনার ভাবী গে,
ওগো স্পর্শ লম্বা যা মসুই
বারণীর বাজারে ॥
ওগো নেকমরদ পছিস যাকে
ভোরটা কান্দরত মেলা লাগছে
মুই যাছু তোর বহিনের তাহনে
ও মোর বড়ো ভাবী গে ওমোর সোনার ভাবী গে
দেরি হলে তোর বহিনবডা
যাবে গে বিগড়ে ॥
ওগে লোকলা কামাকে আলা ভুলা
তোর বহিনে কহে বেহা পাগলা
মোক কয়া কহে চোখের ইশারা
ওমোর বড়ো ভাবী গে ওমোর সোনার ভাবী গে
টপ করে দে টাকালা মোক
বেলা যায় পরে।[১]

জারি : জন্ম নিবন্ধন

এক.

শুনেন দেশের জনগণ ভাই-বন্ধু ভগ্নিগণ
জন্ম নিবন্ধনের কথা শুনেন দিয়া মন গো -২ বার
ছেলে কিংবা মেয়ে হলে জন্ম তথ্য না থাকিলে
স্কুলেতে ভর্তি করা হবে প্রথম দায় (আরো) -২ বার
ভোটার হতে বয়স লাগে সঠিক জন্ম তথ্য লাগে
নাম পরিচয় শিক্ষা দীক্ষার লাগে বিবরণ (গো) - ২ বার
দেশে কিংবা বিদেশ গেলে পাসপোর্ট- ভিসার কাজে
চাকুরিসহ অনেক কাজে জন্ম তথ্য চাই (আরো) -২ বার
জন্ম তথ্য না থাকিলে অফিস কিংবা আদালতে

www.pathagar.com

ধুকতে হবে পদে পদে তাইতো প্রয়োজন গো॥ -২ বার
সিটি করপোরেশন ইউনিয়ন অফিস ক্যান্টনম্যান্ট
পৌরসভার হইতেছে ভাই জন্ম নিবন্ধন (আরে) -২ বার
তাইতো বলি ভাই বোনেরে নিজেসহ ছেলে মেয়ের
করুন তবে সবাই মিলে জন্ম নিবন্ধন গো ॥ -২ বার (শিল্পী : মাইকেল)

আ : পল্লিগীতি (স্যানিটেশন)
ওমুই আর যামুনা পুকুর পাড়ে
ঝোপ ঝারে বাশ তলায়
নদীর পাড়ে যাইয়া দেখি
ভাগুর খাড়ায় রয়
ধানের আইলে জোঁকের বাসা
সেথায় যাবার নয়
মোক দেখিয়া চেংরা গুলা
টেরা চোখে চায় ॥
হবুর বাপে পুকুর পাড়ে মাছ মারে ছিপ দিয়া
এদিক ওদিক চাইয়া শেষে আইছু ফিরিয়া
ও মুই কুন খানে বা যাও
ঝোপের ভিতর কয়েবা আছে সলা খাঁকারী দেয় ॥
শেওড়া গাছে ভুতের বাসা কইছে ময়নার মাও
উদিক দিয়া গেলে নাকি ধরবে উড়লি বাও
ও মুই কি করি উপায়
বাড়ি আসুক পুটির বাপে কথা করার নও ॥
দুই.
এসো ভাই দেশ গড়ি, সংসার করি জন্ম নিয়ন্ত্রণ করি
এসো ভাই দেশ গড়ি ॥
ছেলে হোক মেয়ে হোক দুই সন্তানই যথেষ্ট
একটি হলে ভালো হবে থাকবেনা আর কষ্ট
পরিকল্পিত সংসার
সকলের দরকার
অল্প হলে বুঝবে শেষে ভেবে দেখা জরুরি।
কুড়িতে বুড়ি হলে স্বাস্থ্য বেশি হয়ে যায়
দিনে দিনে শয্যা শায়ী মাতৃ মৃত্যু বেড়ে যায়
সংসার হবে ঝালাপালা
অনটনে হবে কানা
দিনে দিনে বাড়বে জ্বালা বাড়বে খাটা খাটুনি
তাইতো বলি ভাই বোনরা কর জন্ম নিয়ন্ত্রণ
সংসার হবে সুখের থাকবেনা ভাই অনটন

www.pathagar.com

দেশ হবে সোনার বাংলা
থাকবেনা ভাই হামলা মামলা
তোমার আমার এই দেশ, দেশকে সবাই ভালোবাসি

তোমরা পাচারকারীর ফান্দে পইরোনা ও বন্ধুরে॥
ভাল মন্দনা বুঝিয়া
অপাত্রে মন দিয়া
কর্মদোষে হইয়া দোষী কপাল দুষণা ও বন্ধুরে ॥
কেউবা আসে বর সাজিয়া
গার্মেন্টস এর কেউ চাকরি নিয়া
কেউবা বিদেশ যাবার কথা কয়
মিষ্টি কথার মন মজাইয়া
সরলে সরল মিশাইয়া -২ বার
সরলে গরল মিশাইয়া -২ বার
আখেরে নিঃস্ব করে দিয়া যন্ত্রণা ও বন্ধুরে।
ভদ্র বেশি শয়তান
করে কত শত ভান
(যেন) ভাজা উল্টে খাইতে জানে না
(তাঁরা) দেশে কিংবা বিদেশেতে? -২ বার
শিশু নারী পাচার করে -২ বার
অন্ধ করে বন্ধ ঘরে হয় ঠিকানা ও বন্ধুরো।
ছেলে যাই সাইকেলেতে বাপকে বলে হাইটা চল
বাঙালি বাবুদের নব শিক্ষার ফল।
বাপের মাথায় ধানের আটি
বেটার পায়ে ঠেকেনা মাটি
শুধু করে ঝগড়া ঝাটি
পাপের চোখে ঝরছে জল
বাঙালি বাবুদের নব শিক্ষার ফল।
বাপ ধরেছে হালের মুঠা
বেটা ঘুরে বেড়াই খাটা খাটি
পাপ খাইছে ছাতুর মুঠা
বেটার মুখে মেওয়া ফল।
বাঙালি............
বাপ চেচিছে, পাটের শাক
বেটার মনে হচ্ছে রাগ
বাপকে বলে বাড়ি হতে ভ্যাগ
ও আমায় লজ্জা দিচ্ছে বন্ধুর দল
বাঙালি..................

www.pathagar.com

বেটা করেছে নতুন বিহা
শুয়ে থাকে বউকে নিয়া
শুধু তাকাই জান্না দিয়া
কখন বাপে জুড়ছে হাল।
বাঙালি........... ।[২]

৪. পল্লিগীতি

এক.

তলার উপর দিয়ে এলা
বানাও মহল আকাশ ছোঁয়া
ভূমিকম্পে ভাংবে যেদিন
তোমার সাধের বালাখানা
কেমনে যাবিরে মনা
সাড়ে তিনহাত জমি ছাড়া বেশি পাবি না।
যতই বাড়ে টাকা কড়ি
বাড়ে তোমার বাহাদূরী রে
জায়গা-জমি, গয়না-গাটি (২ বার)
সঙ্গে যাবেনা রে মনা ॥
যেদিন তোমার সময় হবে
মুহূর্তনা বিরাম পাবেরে
অন্ধকার মাটির তলে (২বার)
হবে বিছানা রে মনা ॥[৩]

দুই.

আমার শ্বশুর বাবার সাত বেটি
বড়োটার হইছে গতি
এতলা শালীর জামাই কোথায় পাই
কেন যে হইলাম বড়ো জামাই
ছয় শালীর যন্ত্রণায়
শ্বশুর বাড়ি যাওয়াই হইল দায় ॥
১ম শালী দেখতে কালো, পাত্র চায় অতি ভালো
২য় শালীর মাথায় চুল নাই
৩য় শালী কলেজ পড়ে, ব্যাটা ছেলের পোষাক পড়ে
পড়া ছাইরা প্রেম করে বেড়ায় ॥
৪ নম্বর টার ট্যারা চোখ, ৫ নম্বর টার ম্যালায় রোগ
দিনে দিনে হাড্ডি হইয়া যায়

www.pathagar.com

ছোট্ট শালী কম শোনে, চুন চাইলে নুন আনে
কমে বাতাইলে কাম ছাড়ে পালায় ॥
ছোটো একখান শালা হইছে, বড়াবড়ি আকাশ পাইছে
এতলা বেটির বিয়ার নাম নাই
শ্বশুর বাড়ি একলা গেলে, শালীরা সব বায়না ধরে ॥[৪]

তিন.

ফুলের নামে নাম রেখেছিলাম
ফুলের নামে তোমায় ডেকেছিলাম।
ফুলের সুবাস যখন ছড়ালে তুমি
তখন তোমায় আমি হারালাম ॥
আজো উঠে রবী শশী
তাঁরাদের সাথে জ্বলে জোনাকি
তোমার সখীরা সবে নানা রূপ সাজ সেজে
গেয়ে যায় আনন্দের গান-
(আর) আমি শুধু একা একা আঁখি ভিজালাম।
আজো বাজে বাঁশের বাঁশী
তার মাঝে খুজি তোমার হাসি
অভিমানী অভিমানে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে
দিয়ে গেলে ধুপেরই ঘ্রনি-
(আর) কষ্টের মালাখানি আমি পড়লাম ॥[৫]

চার.

তুমি যখন বিয়ার সাজে
আমি তখন কেয়া কোচে
তোমায় আশীর্বাদ করে যেতে পারিলাম না
বুকে পাথর বান্ধিয়া
সবকিছু ভুলিয়া ঢাকার উদ্দেশ্যে
হইলাম রওয়ানা ॥
আসনে বসিয়া চোখের জল মুছিয়া
কত কথাই মনে যায় পড়িয়া
বৈশাখের ঝড়ের দিনে
আসিতে আম বাগানে
ভিজিয়া হইতাম সারা দুইজনা ॥
পাড়াত কারো বিয়ে হইলে আসিতে আমার
কাটাইতাম সারা রাত গল্প করিয়া
নবান্নের উৎসবে আসিতে পিঠা নিয়ে

www.pathagar.com

খাইতাম পিঠা বসে দুই জনা ॥ (শিল্পী : সিদাম চন্দ্র রায়)

পারিলে করিও ক্ষমা না পারিলে ঘৃণা দাও
কলঙ্কেরি বোঝা লইয়া
আমাকে মরিতে দাও ॥
দিনে দিনে মাস গেল
মাসে মাসে বছর হইল জেল
বছর শেষে বছর গেল
তবু তোমার দেখা নাই
আমাকে যন্ত্রনা দিয়া - ২ বার
না জানি কি সুখ পাও ॥
চিঠিপত্র কতই দিলাম
একটির না উত্তর পাইলাম
আছো কীনা আছো বন্ধু
তোমার আগের ঠিকানায়
শেষ দেখা দিও বন্ধু
আমার মরণ বিছানায়ে।
(আ : মালেক, শিল্পী : মাইকেল)

পাঁচ.

ওরে বৈশাখী
কি যাদু করিল
সাঁঝের বেলা তোর আঙিনায়
বারে বারে আসি ॥
চৈত্র শেষে দিনগুলো
কখন জানি আসবে শুনি
বাজিয়ে মাদল ছড়িয়ে ঝিলিক
হাওয়ায় কাপুনি।
সাজিয়েছি তোর বাসর ঘর
কি অপরূপ মনে হয়-
রকমারি দিয়ে
তোর বিছানা পাতি ॥
নানা রকম দোকান দিয়ে
বসছে আজব মেলা
ফুচকা, পুরি, মিষ্টির দোকান
নাগর দোলায় খেলা
রং বাহারী রঙের মেলায়
লাল নীলের নানান খেলায়

www.pathagar.com

৮২ বাজারে বসছে ॥(শিল্পী : মাইকেল)
॥ আমা॥

নারী হয়ে জন্ম নিয়েরে ও বিধি
করেছি কি পাপ
জন্মকালে পাই সবার
শুধুই অভিশাপ ॥
ছেলের মুখে দুধের বাটি
মেয়ের ভাগ্যে জোটে আঁটিরে
জন্ম থেকে বঞ্চনায়
কেমনে মানুষ হয়রে ॥
টাকা কড়ি যৌতুক দিয়ে
তবেই নারীর হয় যে বিয়ে রে
তবু স্বামীর মন ভরে না
গাড়ি বাড়ি চায়রে ॥
দুনিয়াতে মহান যারা
নারীর পেটেই ছিলেন তাঁরারে
তবু কেন মা জাতি
পায়না সুবিচার রে ॥
(শিল্পী : মাইকেল)

আজকে যারা শিশু সন্তান
তাঁরাই হবে দেশের প্রধান
তাইতো শিশুর খেয়াল রাখা চাইরে দেশের ভাই
সকল শিশুর যত্ন নেওয়া চাই রে দেশের ভাই
শিশু যখন মায়ের পেটে, শিশুর খাদ্য মায়-জোগাবে
তাইতো মায়ের সুষম খাদ্য চাই
দশ মাস দশ দিন পরে, মায়ের কোলে শিশু হাসে
সে হাসিতে কষ্ট ভুলে যায়রে ॥
শাল দুধ হয় অমূল্য ধন মহান আল্লাহই করছে এ দান
রোগ প্রতিরোধ পুষ্টি গুণ রয়
শাল দুধ শিশু খেলে রোগ ব্যাথি দুরে যাবে
বাড়বে শিশু কোনো বাধা নাইরে
জন্ম থেকে ছয় মাসে শুধুই মায়ের দুগ্ধ খাবে
মায়ের দুধে বিকল্প তো নাই
ছয় মাস পার হইলে, বাড়তি খাবার দিতে হবে
শাকসবজি আর খিচুড়ি যেন পাবে
হলুদ ফল আর সবুজ শাক ছোট্ট মাছ ভিটামিন এ
আয়োডিন লবণ তেলে পুষ্টি পাই

www.pathagar.com

সুষম খাদ্য শিশু খেলে সময় মতো টিকা নিলে
আদর স্নেহ শিশুর বিকাশ হয়রে।
ওরে মাছে ভাতে বাঙালি
চাষীর পেটে কেন খালি
ওরে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মঙ্গার হাতছানি সখের বাঙালি
সোনার বাংলায় একোন দৃশ্য দেখি ॥
(ও ভাই) কৃষি হলো প্রধান পেশা
খরা বন্যায় সর্বনাশা
তাইতো পেশায় উন্নয়ন চাই
আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি জমি আবাদ করে-২ বার
গোলাভরা শস্য পেতে
জৈব সার প্রয়োগ করি ॥
(ওভাই) রাসায়নিক সার ও বিষে
ক্ষতিকর প্রয়োগেতে
দিনে দিনে জমির শক্তি ক্ষয়
জংলালতা, কচুরীপানা, গোবর আর আবর্জনা
মাটির গর্তে নিয়ম মতে,
রাখেন সবাই সবাই ঢাকি ॥
(ওভাই) হাইব্রিড শস্য বীজে
ফসল ভাই দ্বিগুণ ফলে
খাদ্যের অভাব হবে সমাধান
পতিত জমি আবাদ করে, খাদ্য ঘাটতি পুরণ করে
সোনার বাংলার মিলে মিশে
এসো এ দেশ গড়ি ॥

৫. বিয়ের গান

বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামের মতো ঠাকুরগাঁও জেলার গ্রামাঞ্চলেও বিয়ের দিন ধার্য হলে, বিয়ের এক সপ্তাহ পূর্ব থেকেই শুরু হয় বর ও কনের বাড়িতে মহিলাদের সমবেত কণ্ঠে গান গাওয়ার ধুম। হলুদের গান, বরযাত্রার সময়ের গান, বর আগমনের গান, বর কনে বিদায়ের গান, বর বধূ বরণের গান ইত্যাদি। কনের বাড়িতে যে সকল গান গাওয়া হয় সে সকল গানের মূল উপজীব্য হলো কনেকে বড়ো করে দেখানো এবং বরকে কনের তুলনায় ছোটো করে উপস্থাপন। অন্যদিকে বরের বাড়ির গানে প্রকাশিত হয় এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। এই গান হয় রসিকতার ছলে, হাস্য রসের উদ্রেক ঘটাবার মানসে। বিয়ের যিনি ঘটক থাকেন তাকেও উপহাস করা হয় অনেক গানে। এ ছাড়া কনেকে সুখে রাখার আবেদনও জানানো হয় গানের মাধ্যমে বর বা বরের পিতা মাতার প্রতি। এখানে বিয়ের গানে কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো :-

www.pathagar.com

বেটি হইল মোর পূর্নিমার চাঁন,
জুলাই হইল মোর কালুয়ারে লাল,
মনটাতো হছে জার বিজার,
দিলটাতো হছে জার বিজার।
ঠাকুরগাঁও হতে সাবন মাঙ্গামু,
কালুয়াক বসায়া ঘসিমুরে লাল,
মনটাতো হছে জারবিজার।
বেটি হইল মোর মেটটিক পাস,
জুলাই হইল মোর গজুয়ারে লাল,
মনটাতো...........জারবিজার ॥
ঠাকুরগাঁও হতে মাষ্টর মাঙ্গামু
গজুয়াক বসায়া পড়ামুরে লাল,
মনটাতো...........জরবিজার।

বর এলে মহিলারা এভাবে গেয়ে গেয়ে নাস্তানাবুদ করে বর বেচারাকে।

আরও গায় :

১.

'নাকটা কেনে টিমকাছি - টিয়ানাকা, ।
চশমা দান চাহাচি - টিয়ানাকা নশা।
হাত কেনে নড়াছি - টিয়ানাকা নশা।
ঘড়ি দান চাহাচি - টিয়ানাকা নশা।
গতর কেনে কুড়াছি - টিয়ানাকা নশা।
জামা দান চাহাচি - টিয়ানাকা নশা।

২.

সাল্লুক মাটির কল্লারে মোর ধরে থকা থকা,
দুলাহা ভাবী চোর রে মোর কল্লা চুরি কোরলে-
কইনার ভাইটা হুঁশিয়ার রে মোর চোরক হাতে ধরলে
এক কড়ার বাড়িয়ে রে মোর কল্লা আদায় কোরলে।

ছেলে পক্ষই বা কম যায় কিসে। বউ নিয়ে আসার সাথে সাথে গলা ধরাধরি করে গায়িকা মহিলারাও চড়া গলায় গাইতে থাকে :

তোর বাপ তো কহিল্ল ছুটু ছুটু গে,
বাড়িত আনে দেখু মুই বুড়ি জাকড়ি গে।
তোর মাও তো কহিল্ল গরো গরো গে
বাড়িত আনে দেখু মুই হাঁড়ির তলি গে।
তোর ভাই তো কহিল্ল চিকন - চাকনগে
বাড়িত আনে দেখু মুই মোটা ধুমসী গে।

আরও গায় :

৫০০ টাকিয়া দামের শাড়ি খান,

www.pathagar.com

তাহ মিনতির হয় কে না।
চল দাদা-চল বাবা হামরা বাড়ি ঘুরিয়া যাই
গাবরি মাইয়া-গাবরি কইনা, হামরাতো কইনা জুড়িম নাই
৩০০ টাকিয়া দামের বালাউজ
তাহ মিনতির হয় কে না।
চল মাসি-চল পিসি হামরা বাড়ি ঘুরিয়া যাই,
গাবরি মাইয়া-গাবরি কইনা, হামাতো কইনা জুড়িম নাই ॥[৬]

আধুনিক শিক্ষিত পরিবারে বিয়ের গানের প্রচলন কমতে শুরু করেছে। অনেকটা গেয়ো মনে করে এই সকল গানকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এখনকার স্কুল বা কলেজ পড়ুয়া মেয়েরা এই সব গান আর গাইতে জানে না। গাইতে বললে একটু সলাজ হাসি দিয়ে এড়িয়ে যায়।

৬. সংগৃহীত গান

এক.

এক সের চাউলের দুই সের পানি
একলা ঘরে রান্না করতে না পারি আমি
সাধের ননদ তোমার ভাই ক্যানে বিদেশি
বিড়াল দেখে চমকে উঠি
সাধের ননদ তোমার ভাই ক্যানে বিদেশি
ঘরে আছে আমের কুশি
স্বামীর মুখে নাইরে হাসি
সাধের ননদ তোমার ভাই ক্যানে বিদেশি।[৭]

দুই.

ছেলের বাবার বড়ো বুদ্ধি
পইরা বেড়ায় লেডিস ঘুড়ি
ময়না রহে দেখিয়া
তোমার ভুলিব নারে চেংড়া বাবুড়ি ছাটা।[৮]

তিন.

চালের কুটুরা বাইগে
জলের ভুমুকা
একটা সিন্দুকে বাইগে
কয়টা তালা
এইটা কথার উত্তর দেরে
চেংগেরা ছালা
এইটা কথার উত্তর দিতে না পারিলে
খাবে কান মলা।[৯]

www.pathagar.com

চার.

কারো যার হাতে শুনা যাছে
সাইকেল লাগে তোকে
আইএ বিএ পাশ করিলে
তামানে দিল হয় তোকে
ওয়ানেতে ফেইল করিয়া
দিমাক দেখাছিস মোকে
কারোয়ার হাতে শোনা যাচ্ছে
গরুনাগে তোকে
বড়ো লোকের ছেলে হলে
দেওয়া গেল হয় তোকে
গরিবের ছেলে হয়া দিমাক
দেখাছিস মোকে
কারোয়ার হাতে শুনা যাচ্ছে
ঘড়ি লাগে তোকে
অফিসের বাবু হইলে
তামানে দিন হয় তোকে
পড়াশুনা না করিয়ায়
দিমাক দেখাছিত মোকে ॥[১০]

পাঁচ.

কুশার বাড়ি গে জোরে ময়না বলে
ময়নার বুলি শুনিয়া গেলাম জামাই বেচেবা
বড় জামাই বেছালেন সাধু সওদাগর
ছোটো জামাই বেছালেন গে বাইজের জন খাটা
কেমনে রহিম গো বাপু দুঃখ যায়
এক ছটাক তেল আনিলে গো বাবু হাট ঘুরিবার কয়
মোহ বাপের বেটি জল দিধা করিম
তয় মুই নুন হাট ঘুরায়া দিম
কেমনে রহিম গো বাপু জন খাটার ঘরে
এক ছটাক হলোদি আনিলে গো ক্ষাপু
মোহ বাপের বেটি, জল দিধা করিম
তয় মুই হলোদি হাট ঘুরায়া দিম।
কেমনে রহিম গো বাপু জন খাটার ঘরে
এক ছটাক মরিচ আনিলে গো বাপু হাট ঘুরিবার কয়

www.pathagar.com

মোহ বাপের বেটি জল দিধা করিম
তয় মুই মরিচ হাট ঘুরিয়া দিম।
কেমনে রহিম গো বাপু জন খাটার ঘরে
এক ছটার পিয়াজ আনিলে গো বাবু হাট ঘুরিবার কয়।
মোহ বাপের বেটি, জল দিধা করিম
তয় মুই পিয়াজ হাট ঘুরিয়া দিম।[১১]

ছয়.

ও মোর তিস্তা নদীরে দেখিতে চমৎকার
মায়ে বাপে বেচিয়া খালে, মোকে বানিয়া ভাতার
ও মোর বাণিয়া ভাতার রে
হাতের বালা গড়ায় দে
বালার ভারতে না পারু বেড়িবার
পিঠিত করিয়া নে
ও মোর তিস্তা নদীরে দেখিতে চমৎকার
মায়ে বাপে বেচিয়া খালে মোক বানিয়া ভাতার
ও মোর বানিয়া ভাতার রে
ও মোক ঝুমুকা গড়ায়া দে
ঝুমুকার ভারতে না পারু বেড়িবার
ও মোক পিঠিত করিয়া নে।
ও মোর তিস্তা নদীরে দেখিতে চমৎকার
মায়ে বাপে বেচিয়া খালে মোক নাবালক ভাতার
ও মোর নাবালক ভাতার রে
মোক তুই শাড়ি কিনিয়া দে,
শাড়ির চিপনতে না পারু বেড়িবার
ও মোক পিঠিত করিয়া নে।
ও মোর তিস্তা নদীরে দেখিতে চমৎকার
বাপে মায়ে বেচিয়া খালে মোক নাবালক ভাতার
ও মোর নাবালক ভাতার রে কিনিয়া দে
নোলোকের ভারতে না পারু বেড়িপার
ও মোক পিঠিত করিয়া নে।
ও মোর তিস্তা নদীরে, দেখিতে চমৎকার
বাপে মায়ে বেচিয়া খালে মোক নাবালক ভাতার
ও মোর নাবালক ভাতার রে
তুই মোক কোমড়ের বিছা কিনিয়া দে
বিছার ভারতে না পারু বেড়িবার
ও মোক পিঠিত করিয়া নে।[১২]

www.pathagar.com

৭. রাধামনি রায়ের গান

এক.

কাঁচ কাঁচ হলুদ গে, করে দক মক
যেন মতন দেখেন গে পূর্ণিমার চাঁন
সেন মতন দেখেন গে আবার মুখ ॥
যেন মতন দেখেন গে হান্ডির তলি
সেন মতন দেখেন গে ফেন্নির মুখ ॥[১৩]

দুই.

উত্তরে দখিণে পামুড়ি টাংগাইসুগে
তারি তলে কাসাই মাটাইসুতো ॥
এলায় আসিবে দোভাতারির বেটি গে
আসিয়া চাহিবে বাবার বয়স ঘারা গে
নাহি দিম বাবার বাসঘরা গে ।[১৪]

তিন.

ঝাড়বাড়ি জংগল গে বাড়ি কিসের বাইজন কাজে
আরে-কিসের সাজনি সাজে ।
সাটিয়া গায়ের মণ্ডলিয়ার বেটা
সাদি করলে যাছে আরে বেহা করনে যাছে ।
নটকিয়া ধরে হীরা নটি শুরু কোমরের ধুতি
ছেইরা দেয় ছেইয়া দেয় গে হীরানটি শুরু কোমরের ধুকি
মায়ে না শুনিলে হীরানটি এ মাইরন মারিবে ।
বাফে না শুনিলে হীরানটি দু গাইলন গাইলাবে ।
ভাইয়ে না শুনিলে গে হীরানটি নিকিলায়া দিবে ।[১৫]

চার.

বড়ো বাঁশের বড়ো আগালি গে শিবচনী কইনা
এত লোক থাকিতে গে তোর ভাইয়ে করেহা গে শিবচনী কইনা ।
বড়ো বাঁশের বড়ো আগালি গে শিবচনী কইনা
এত লোক থাকিতে গে তোর কাকা কারুহা গে ।
এত লোক থাকিতে গে তোর ভাউজে কারুহা গে শিবচক্রী কইনা[১৬]

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ :

হলদা-হলুদ
দমমক- উজ্জ্বল
হান্ডি-হাড়ি
ফেন্নি- মেয়ের/কন্যার
পামুড়ি- সামিয়ানা
কানাই- হরদিবাটা

www.pathagar.com

দোভাতারির বেটি-(গালি অর্থে) যে মেয়ের মায়ের বিদ্যা।
শিবচনী- গালি অর্থে ব্যবহৃত শব্দ
কারুহা- ঘটক
আগালি- আসা
বগধা- বলদ
দহতে- জলে
ফালালে- ফেলে দেওয়া
মন ভাকুলেচে- মন আকুল হয়।

পাঁচ.

বাবারে বগধা বেচা টাকালা দহতে ফালানো
বাবারে ভাইচতি কইনা আসরায়নি চাহেছে
মন ভাকুলে চে
বাবারে সারা পথে আসেছে ওজরে গোজরে
বাবারে বাড়ির কাল আসিয়া মাতা কলে হেটো
মন ভাকুলেচে ॥[১৭]

(ফুল বাবু রায়, পিতার নাম : মৃত. শলু রাম রায়, বয়স : ৪০ বছর, শিক্ষা : নাই, ঠিকানা : গ্রাম : দৌলতপুর, ডাকঘর : দৌলতপুর, উপজেলা : ঠাকুরগাঁও, জেলা : ঠাকুরগাঁও।)

ফুলবাবু রায় প্রতিমা তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। হিন্দুদের দেব দেবী প্রধানত মাটি ক্রয় করে তৈরি করা হয়। খড় কাঠ বাঁশ এর কাঠামো তৈরি করে মাটি দিয়ে তা প্রতিমার আকৃতি করা হয়। বৎসরে নানা প্রকার দেব দেবী পূথিত হয়। কথায় বলে বারো মাসে তের পার্বন। প্রধান প্রধান দেবতাদের মধ্যে দূর্গা, লক্ষী, স্বরস্বতী, কালী, নারায়ন, কার্তিক, গণেশ, বুড়ি, শীতলা, মহাদেব, কৃষ্ণদেব, ব্রহ্ম, বিষ্ণু মহেশ্বর, রাম, দোল, স্নান যাত্রার প্রতিমাসমূহ অন্যতম। এসব প্রতিমা তৈরি করতে মৃৎশিল্পীরা সারা বৎসর ব্যস্ত থাকেন। আমাদের দেশের তৈরি প্রতিমা বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। তাছাড়া মাটির দৈবী ছোটো পুতুল তৈরি করে অনেক মৃৎশিল্পী অনেক অর্থ উপার্জন করে থাকেন।

৮. অদিবাসীদের গান

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় সাঁওতাল, ওরাও, পাহাড়, মুসার প্রভৃতি আদিবাসীদের বসবাস। এরা বাঙালিদের সাথে সহাবস্থান করেও এদের নিজেস্ব ভাষায় সংগীত চর্চা করে থাকে। আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালদের বিয়ে ও উৎসবের সময় নিজস্ব ভাষায় সংগীত গেয়ে ও নেচে সব অনুষ্ঠান উদযাপন করে থাকে। এরা সাধারণত দল বেঁধে সমবেত কণ্ঠে নেচে গেয়ে থাকে। এরা মাদল ঢোল নাকাড়া বাজিয়ে নাচের সাথে গান গায়। মেয়েদের গানের সাথে বাজানো হয় মাদল আর পুরুষদের গানের সাথে বাজানো হয় ঢোল আর নাকাড়া। এদের গানের সুর সম্পূর্ণ আলাদা। সাঁওতালদের একটি বিয়ের গান নিচে তুলে ধরা হলো–

www.pathagar.com

"মারাং বুরু চটলে গুলাজ বাহাকো হেছে ইয়েদা,
ইংমাকো ইদিংকান গাতে মা
লুম তিহো আকায়ে বাহায়ে তেপে হিচে ইয়েদা ॥[১৮]

এই গানের বাংলা করলে দাঁড়ায়, বড়ো পাহাড়ের উপর দিয়ে নিয়ে কনেকে নিয়ে যাচ্ছে শ্বশুর বাড়ি। তখন যারা পাহাড়ের ফুল সমেত মল্লিকা গাছের ডালগুলো কেটে ফেলেছিলো তাদের উদ্দেশ্য করে কনে বলছিলো তাকে তো নিয়ে যাচ্ছে তাহলে কে এই গাছের ফুল খোপায় পড়বে। এই গানে ফুটে উঠেছে সাঁওতাল কনের পিতার গৃহ ত্যাগ করার করুণ বেদনা। সাঁওতালরা তাদের সোহরাই, বাহা, কারম, দাসাই প্রভৃতি উৎসব উদযাপন করে থাকে নেচে গেয়ে। এসব উৎসবের সময় নতুন কাপড় পরিধান ও উন্নত ভোজের আয়োজন করে। এখানে সোহরাই উৎসবের একটি গানের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো, এই গানে ছোটো ভাই তার দিদিকে উদ্দেশ্য করে গাইছে-

'দ্যেই না দ্যেই মুরাং দেই, দেরাছে দ্যেই না
উড়ুং লেনমে হাঁতি লেকান পরপ দ্যেই না ছেটেরাকানা।
উত্তরে দিদি গাইছে-
তি আনতেম ছাবে ইয়াছে,
জাংগা ওয়ানেতে ওরেয়া হাতিলে কানা
পরক দেইনা উরুং চালাকা ॥[১৯]

এই গানে সাঁওতালদের আর্থিক অনটনের কথা প্রকাশিত হয়েছে। যখন সোহরাই উৎসব এলো তখন ছোটো ভাই আনন্দে আপ্লুত হয়ে বড়ো দিদিকে ডেকে বলছে দিদি বড়োদিদি শিঘ্রই বের হয়ে এসো। পর্ব চলে এসেছে। ছোটো ভাই জানে পর্ব এলে ভালো খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান হবে, সে নতুন পোশাক পড়বে। এই প্রত্যাশায় তার দিদিকে ডাকছে। কিন্তু দিদি জানে আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা, তাই ভাইয়ের কথার জবাবে বলে পর্ব এসেছে আসুক, তার কি পা আছে যে পা ধরে রাখা যাবে। এ ধরনের গান অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যে চর্চা হয়ে থাকে।

চান্নিরে চান্নি তোর জলম কুণ্ঠে
তোর জলম ঐ হাড়ির বাড়িতে
হাড়ি বানাইছে সারস্তে নিছে
আজ চান্নির গন্ধ্যা অধিবাস রে
কুলারে কুলা তোর জলম কুণ্ঠে
তোর জলম হাড়ির বাড়িতে
হাড়িয়ে বানাইছে খারস্তে নিছে
আজ কুলার সন্ধ্যা অধিবাস রে।
গোচারে গোছা তোর জলম কুণ্ঠে
তোর জলম ঐ কুমারের বাড়িতে
কুমারে গসাইছে খারস্তে নিছে

www.pathagar.com

আজি গোছার গন্ধ্যা অধিবাস রে
পচিরে পেচি তোর জলম কুষ্ঠে
তোর জলম কুমারের বাড়িতে
কুমার বানাইছে গারস্তে নিছে
আজ পেচির সন্ধ্যা অধিবাসরে। [২০]

৯. গায়ে হলুদের গান

আস বাবা আস কুড় মাখোরে
হামার বাবার কে কুড় দেছে মলানের ডালি।
আপন মায়ে কুড় দেছে মলানের ডালি
আস বাবা আস কুড় মামরে
হামার বাবার কে কুড় দেছে মলানের ডালি
আপন বাবায় কুড় দেছে মলানের ডালি
আস বাবা আস কুড় মামরে।
আপন কাকা কুড় দেছে মলানের ডালি
আস বাবা আস কুড় মাখরে।[২১]

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ :

চান্নি- কনের প্রতীক নাম
জলম- জন্ম
কুষ্ঠে- কোথায়
হাড়ি- যে ঢাক বাজায়
গারস্তে- গৃহস্থ
গোছা- প্রদীপ
সরাইছে- তৈরি করছে
পেচি- মাটির এক প্রকার ছোটো খাট
কুড়- হলুদ,
মলানের ডালি- সাজানো ডালি

১০. বিয়েতে যাওয়ার গান

বিহাতে যাছেন চান জোগোতে ঘুরেন রে
হায় বাছা সোনার চান।
বসিবার যে দিলে চান ঝারিয়া বসেন রে

www.pathagar.com

হায় বাছা সোনার চান।
পান যে দিলে চান সাজে যা খান রে
হায় বাছা সোনার চান।
বিড়ি যে দিলে চান ধরেয়া খান রে
হায় বাছা সোনার চান।[২২]

কনের বাড়ির গান:

এক.

হলদীয়ে ঘুরেছে মাটি এখানে
আসিলরে ফেন্না শেষ রাতি।
আসিয়া পাতিল খাড়া, না সহে ফেন্নির ভাড়া
ভাঙ্গিয়া পড়িল রে ফেন্না তোর খাড়া

দুই.

বাঁশ বাড়িরে সন্দেয়া তুই কাটিলু বাঁশরে রসিয়া
গোড়ে আগালেরে ছাটিয়া ওতুই বানালু বাঁশিরে রসিয়া।
বাঁশির বাজন শুনিয়া ফেন্নি[৮] নাই রইল ঘরে রে রসিয়া।
শাল বাড়িরে সন্দেয়া ও তুই কার্তিলু শালরে রসিয়া
গোড়ে আগালে ছাটিয়া ও তুই বানালু দোতরারে রসিয়া
দোতরার বাজন শুনিয়া ফেন্নি নাই রহিল
ঘরে রে রসিয়া।[২৩]

তিন.

বাড়ির পশ্চিম পার্শ্বে এক খটু বাইগন
হে দেম বাইগন জালা সে জালা
যাত গে ফেন্নী বাইগন তুলিকা
গরেয়া আনেক বিচ্ছি করে কাঁটা
ঠেংগের উপর ঠেং দিয়া কিনিলাম কাটা
হে দেম বাইগন জালা সে জালা।[২৪]

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ :

বিহাতে- বিয়েতে
চান- পাত্রকে আদর করে ডাকা
জোগোতে- তাড়াতাড়ি, সকাল সকাল
ঘুরেন- ফিরে আসা
ঝারিয়া- ঝেরে
সাজেয়া- তৈরি করে
ধরেয়া- জ্বালায়ে
এখানে- এখানে
ফেন্না- বরের প্রতীক নাম

www.pathagar.com

পাতিল- বসাল
খাড়া- শোয়ার খাট
ফেন্নি- কনের প্রতীক নাম
ভাড়া- ওজন/শরীরের ভাড়

চার.

রিলল নদী মা মোর বিরল বহে গে
মাঝ নদীতে ফেন্নী খারো করে গে
খারো করিতে ফেন্নীর হারাইল জোরকানের সোনা গে
জোর কানের সোনা
তুই কি করলু সে ফেন্নী
পেটের ডোক তোর বাপ বেচেয়া খাইসে গে
জোর কানের সোনা গে
জোর কানের সোনা।[২৫]

পাঁচ.

চাল হাতে পারেয়া আছিনু পাকা কুমড়ারে
হিল্লচা মাছ দিয়া,
ভালয় আসিল ফেন্নী তাক গণিয়া
খসলাখান চিরিয়া গেইসে ছোয়ায় মুতিয়ারে
হে দেখ আসিয়া
দুইজনে গাথিম খসলা জনাকত বসিয়া
হে দেখ আসিয়া ।[২৬]

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ :

সন্দেয়া- প্রবেশ করে
কাঠিলু- কেটে ফেলা
রসিয়া- রসিক
গোড়ে- গোড়াতে
আগালে- আগাতে
ছাটিয়া- কেটে
বানালু- তৈরি করা
ফেন্নী- কনের প্রতীক নাম
দোতরা- এক প্রকার বাদ্য যন্ত্র
পার্শ্বে- দিকে
এক খটু- একটি ছোটো জমি
বাইগন- একটি ছোটো জমি
জালা- কচি
তুলিকা- কচি

www.pathagar.com

ফিন্দাইল- তুলতে
গরেয়া- বিধে গেল
বিন্দিশ্বর কাটা- সূচের মতো লোহার কাঁটা
ঠেং- পা
বিলল নদী- গ্রাম্য ছোটো নদী
বিরল- মোহ
বহে- প্রবাহিত হয়
ফেন্নী- রুনের প্রতীক নাম
খারো- দাঁড় করানো
জোর কানের- দুটো কানের
করলু- করল
ভোকে- ক্ষুধায়
বেচেয়া- বিক্রয় করে
খাইসে- খেয়েছে
চাল হাতে- ঘরের চাল থেকে
আচ্ছিনু- রান্না করলাম
হিল্লচা- ইলিশ মাছ
ফেন্না- বরের প্রতীক নাম ফেন্না
তাক গনিয়া- ঠিক সময়ে/যথা সময়ে
খ খান- গ্রামে তৈরি খড়ের মোটা মাদুর
চিরিয়া গেইসে- ছিরে গেছে
ছোয়ায়- ছোটো ছেলে মেয়ে
মুতিয়া- প্রস্রাব করে
গাহিম- গাথা বা তৈরি করা
জনাকত- জ্যোৎস্নাতে

ছয়.

নিমার গাছটা ফুল ফুটিসেরে
বাঙ্গার মতন ফটক ধরিসে
আন্ধন ঘরের দক্ষিণ আশ্বত ফেন্নীটা আছি
ঢাকি নাইতে ঢাকা দিব
কুলা নাইতে আওডাল দিব।[২৭]

সাত.

আমের গাছটা দোফেরেংগা
পাতারী ঝরঝরায় দাদা, না যায় চিনা।
ফল ছিরিয়া মারনু ঝাটা
ফেন্না ভেরুয়া, চুড়া খাবুতে আসিম অবেলা।
একজনে ভাজেছে খলা, দুই জনে ভুগছে চুড়া
দোতদালং দিয়া

www.pathagar.com

হামার চুড়া আলারে ভালো৷
চুড়া খাবুতে আসিম অবেলা
এতই খিলাছু। এতই খিলাছু, তাহ ডেংকেরা
চুড়া খাবুতে আসিম অবেলা। [২৮]

আট.

ছিকো ছাকো মাইগে মুই মরিয়া গে যাও
এইটা কেমন গাভুড়া গে
এইটা বরের মাথাটা
ঢাড কাউয়ার ভাষাটা
ছিকো ছাকো মাইগে মুই মরিয়া গে যাও।
ছিকো ছাকো মাইগে মুই মরিয়া গে যাও
এইটা কেমন গাভুড়া গে
এইটা বরের পিঠখান
ধান ভাঙা পিড়াখান
ছিকো ছাকো মাইগে মুই মরিয়া গে যাও।
ছিকো ছাকো মাইগে মুই মরিয়া গে যাও
এটা কেমন গাভুড়া গে
এটা বরের নাকটা
দোতরা বাজাবার মাখুটা
ছিকো ছাকো মাইগে মুই মরিয়া গে যাও।
ছিকো ছাকো মাইগে মুই মরিয়া গে যাও
এইটা কেমন গাভুড়া গে
এইটা বরের দুইটা কান
ধান পছুড়া কুলা খান
ছিকো ছাকো মাইগে মুই মরিয়া গে যাও।[২৯]

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ :

শিমা- সিম গাছ
বাঙ্গাঁ- এক জাতীয় তুলা
ফটক- ছোটো ফল
আচ্ছন ঘরে- রান্না ঘরে
পাশ্বত- পার্শ্বে
ফেন্নী- কনের প্রতীক নাম
ঢাকি- এক প্রকার ডালি
আওডাল- আড়াল
দোফেরেংগা- দুটি ডাল দুদিকে বের হওয়া

www.pathagar.com

ফেন্না ফেরুয়া- বরফে গালি দেওয়া (ভীরু বর)
চুড়া- চিড়া
খাবুতে- যদি খাও
অবেলা- অসময়ে
খলা- যে পাত্রে চিড়া তৈরি হয়
ভুকাছে- তৈরি করছে
দোতদালং- ছাম এর গাইন
খিলাছু- খাওয়ানো
ডেংকেরা- স্বাস্থ্যহীন ছেলে।
গাভুড়া- বরকে গালি দেওয়ার ভাষা
ঢাড কাউয়ার- এক প্রচার বড়ো কাক
ভাষাটা- কাকের বাসা
মাগুটা- দোতরা বাজানোর যন্ত্র
পছুড়া- ধানঝারা

নয়.

ধুতি পিন্ধা নেরের বেটা আইসছে কয় জনরে
নেওতো ধুতি কারিয়া ডিকিম ডাকাম করিয়া।
সুট পিন্ধা নেরের বেটা আইসছে কয়জনরে
নেওতো সুট কারিয়া ডিকিম ডাকাম করিয়া।
খড়ি পিন্ধা নেরের যেটা আইসছে কয়জনরে
নেওতো খড়ি কারিয়া ডিকিম ডাকাম করিয়া।[৩০]

দশ.

ডেগরে টানগে, ডেগরে টান
আনিসি জুতার ঢাকি। বাড়ি ভরাইস না কেন?
যতয় নাগিবে ততয় নিম
তাহত মাইক পিন্ধিবা দিম।
ডেগরে টানগে ডেগরে টান
আনিসি কাপড়ের ঢাকি, বাড়িতে ভরাইনা কেন?
যতয় নাগিবে ততয় নিম
তাহত মাইক পিন্ধিকা দিম।
ডেগরে টানগে ডুগরে টান
আনিসি সুটকার ঢাকি, বাড়িতে ঢুকাইস না কেন?
যতয় নাগিবে, ততয় নিম।
তাহত মাইক খিলাকার দিম।[৩১]

www.pathagar.com

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ :

ডেগরে টান- ঘুরে এসে
ঢাকি- ডালি
ভরাইস - কেন আনিস না/প্রবেশ করাস না
নাগিবে- লাগবে
মাইক- মেয়েকে
পিন্ধিবা- পরাব
সুটকার- শুকনা মাছ
পিন্ধা- পরিধান করা
নেরের বেটা- নারিয়ার বেটা
ডিকিম ডাকাম- কাড়াকাড়ি করে

এগার.

কাঁচা গুয়ার ঘন ঘন বেধা
সাজি ভরি ভরি পান
তোর গে ফেন্নির মার এতই সুনাম
তোরগে ফেন্নির মাওক দেখি আইলু
ছাগলের ঝাঁকে ঝাঁকে নাং
তোর গে ফেন্নির সার এতই সুনাম।[৩২]

বারে.

পর্যতের গোরে গোরে গে ছিটে আইনু বাঙ্গা
বাঙ্গা তুলিতে সাপে করিলে দংশন
শ্বশুরকে মানেক পারো গো পারো
ভাশুরক মানেক পাঁঠা।
শিরের সোয়ামিক মানেক
এক জোড়া হালের বকধা
শ্বশুর কান্দে রঙ্গে রঙ্গে গে
ভাসুর কান্দে শোকে
শিরের সোয়ামি কান্দে বুকে হাত দিয়ে।[৩৩]

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ :

পারো- কবুতর
পাঠা- ছাগল
সোয়ামি- স্বামী
বকধা- বলদ

www.pathagar.com

কাঁচা গুয়া- কাচা সুপাড়ির
বেধা- সুপাড়ির থোকা
নাং- উপপতি

১১. মেয়েলি গীত

মেয়েলি গীত : গ্রাম সমাজে কলের গান বা গ্রামোফোন কোম্পানির মাইক প্রচলিত হওয়ার আগে বিশেষতঃ বিয়ে অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যও জীবন্ত করে তোলার ক্ষেত্রে মেয়েলি গীতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

মেয়েলি গীতের বাণী বা কথার তারতম্য ঘটে বিয়ের অনুষ্ঠানে অনেকগুলো পর্যায় রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে যেমনঃ হলুদের অনুষ্ঠান, কনের বাড়িতে, বরের বাড়িতে, কনের বাড়িতে বরযাত্রীর উদ্দেশ্যে, আবার কনে যখন বরের বাড়িতে আগমন করলো, অর্থাৎ চূড়ান্ত পর্যায়।

গায়ে হলুদের গান :

হলদা রে হলুদ তোর জলম কুনবে
মোর জলম গিরোস্তের বাড়ি
গিরোস্ত কাটিবে, পাসারি বেচিবে
আলোক চিত্র

কনের বাড়িতে বরের আগমনে–

কনের পক্ষ বরকে উপলক্ষে গীতের বাণীঃ

কনে পক্ষ :

ইডা দুলাহার পিঠিখান
খড়ে করা পিড়াখান
ছিকো ছিকো মা মুই করিয়ানা যাও।
ইডা দুলাহার মাথাডা
টেট কুয়ায়ার ডাষাডা
ছিকো ছিকো মা মুই মরিয়ানা যাও।

কনে পক্ষ :

মাথাডা কেনে লড়াছি
টুপি দান চাহাছি
টিয়া নাখা।
চোখলা কেনে টিমকাছি
চশমা দান চাহাছি
টিয়া নাখা।
হাতখান কেনে লড়াছি
ঘড়ি দান চাহাছি
টিয়া নাখা।

www.pathagar.com

পালা কেনে লড়াছি
জুতা দান চাহাছি
টিয়া নাখা।

কনে বরের বাড়িতে আসার পর বরের বাড়ির গীত :

বরপক্ষ :

বইরাত দে সাজিজে গাদালে গাদালে
অধিক বইরাত দেখে বুড়ি তোর
বাপ রহিল লুকাইগে।
কেনে গে বাপু তোঁরা লুকাই রহিলেন গে
যাইল মোস্তেই উলানী দিবে
নুকা নিয়ার বেটি গে।

বরপক্ষ :

ঘর বেদি ঘটক তুই
কেমন ঘটকালি করলো
আধা বয়সি কইনাডা
গলাত বানিয়া দিল
কইনার গালা হালিয়া পরে।
ঘর বেদি ঘটক তুই
কেমন ঘটকালি করলো
পাড়া বেড়ানি কইনাডা
গলাত বানিয়া দিল ভাই
গলা হালিয়া পরে৷

নববধূ বরের বাড়িতে এসে এই গীতের দলের আক্রমনের প্রথম শিকারে পরিণত হয়। শ্বশুর বাড়িতে পা রেখেই নববধূ বুঝতে পারে বাপের বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ির পার্থক্য।

বরপক্ষ :

বাতির উপর বাতিগে বাবা
বাতি খালে ঘুনে গে বাবা
এমন বহু বেশালেন গে বাবা
ওগে বাবা ঝাকে নাহি মিশলে
মাছ হাটিত নেজালেন গে বাবা
ওগে বাবা মাছ বেচি সভে গে বাবা
চামড়া হাটিত লেগলেন গে বাবা
ওগে বাবা চামড়া বেচি সভে।
বাতির উপর বাতি গে বাবা
বাতি খালে ঘুনে গে বাবা।

www.pathagar.com

বরপক্ষ :

তোর বাপে কহে ছোটো গে বুড়ি
তোর মাও কহে ছোটো
বাড়ি আনে দেখনু গে বুড়ি
তুই নাড়া তালের গাছো রে বুড়ি ॥

কনেপক্ষ :

সাতো বেটি বেহালেন গে বাবা
সাতো নদীর পাড়ে
হামাকো বেহালেন গে বাবা
তিস্তা নদীর পাড়ে
কী হালে রহিমুগে বাবা
সঙ্গে না দিমু গো বেটি
বুড়ি না দাদি
বুড়ি না দাদি গে বাবা যাবে সে মরি
তিস্তা নদীর পাড়ে বাবা কি হলে থাকিস গে
সঙ্গে না দিমু বেটি
ছোটো না ভাই
ছোটো না ভাই বাবা যাবে স্কুল পড়িবা।
তিস্তা নদীর পাড়ে বাবা কি হালে রহিমুগে।

কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা কন্যা সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয় মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নেন। উপরোক্ত গীতে দেখা যায় সাত কন্যাকে পিতা সাত নদীর পাড়ে বিয়ে দিয়েছিল। এক সময় নদীকেন্দ্রিক জীবন-জীবিকার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দূর-পথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নদী পথই ছিল একমাত্র পথ।

১২. মরমি গান

এসো ইনশান করি গুনগান
একি সুরে বাঁধি প্রাণ
সে রহিম সে রহমান
সে যে আল্লাহ, জপ তার নাম।
লা ইলাহা মোহাম্মাদুর রাসুল্লাহ
নামায রোজা হজ্ব যাকাত
কররে রোজা হজ্ব ইবাদত
কররে আল্লার ইবাদত
নবীর প্রেমে আসেকান হও
পাবিরে জান্নাত।
পাঠ কর আল কুরআন।
না হলে হবে পেরেশান।

www.pathagar.com

তোমার দরজা খোলা আছে
ক্ষমা চাও মালিকের কাছে
তারিনামে দেহ তরী, কররে অর্পন
থাকবে না ভাবর জ্বালাতন
করলে আল্লার গুণগান।
দোস্ত খোদা নবী আমার
তিনি যে দয়ার ভাণ্ডার
মলিন বলে শেষের দিনে, তিনি জামিনদার।
নামাজ কায়েম কর ইনশান
করি আল্লার গুণগান ॥[৩৪]

১৩. বাউল সংগীত

ধ্যান করিলে নয়নখুলে
দেখতে পাবে মহাজন-২
ধ্যান করিলে নয়নখুলে
ধ্যানের ঘরে জ্ঞানের আলো
ও তাই অজ্ঞানীরা সব হারাইলো
কানতে কানতে জনম গেল
পাইলো না মৌখার দীদার
ধ্যান করিলে নয়ন খুলে।
হু হু শব্দ না শিখাইতে
কলেমা দিলো সিনার সাথে
মানুষে মানুষ বিরাজে
খুঁজে নেওয়া ভীষণ দায়।
ধ্যান করিলে, নয়ন খুলে-
এই মানুষের এতই শক্তি
ফেরেস্তারা করে ভকতি
ভকতি না করিয়া আযরায়িল
শয়তান হলেন দুনিয়ায়
ধ্যান করিলে নয়ন খুলে ॥[৩৫]

১৪. নটুয়া গান

বন্দনা :

কোথাকার মিরদোংগে, বাজে মিরদোং মালে
সান, ডানে দেবি-কালি, বামে হনুমান।
পুরুবে বন্দনা করি ধর্ম নিরাঞ্জন, তাহারে চরণে

www.pathagar.com

শতেক প্রণাম।
উত্তরে বন্দনা করি কালিমার চরণে
তাহারে চরণে শতেক প্রণাম।
পশ্চিমে বন্দনা করি পিরো নয় গম্বর
তাহারে চরণে হাজারো প্রণাম।
দক্ষিণে বন্দনা করি গঙ্গা মার চরণ
তাহারে চরণে শতেক প্রণাম।
আসরে বন্দনা করি দশো বাবার চরণ
তাহার চরণে শতেক প্রণাম।
গান : হায়রে সখি চাউল কইশু, চুড়া কইশু,
দহির দিশু বাইনা,
শনিবারে অধিবাস মঙ্গলবারে বেহা।
গান : টাকা নিশু, পয়সা নিশু টপলা বান্ধিয়া,
ব্যবসা না করিবা যাচু শিরকল্লার বাজারে।
শ্লোক : চার পায়ে খুটুর মুটুর
দুই ভাই বসিয়া ঠাকুর
দুই ভাই ঝটপটি বাজায়
এক ভাই পাখা ডলায়। উত্তর : গরু
গান : হাইরে সখি ঘোটো নিশু,
বাড়ি নিশু আরো, চালোন কুলা,
টিয়া কাকোই নিশু
আরো বেলি মালা।
গান : ছায়া নিশু, ব্লাউজ নিশু
আরো জড়া শাড়ি।
পাচ পখোরির ঘোংগোর নিশু
আর একটা হরতকি।
শ্লোক : শুতে আছু মুই।
ঘর সন্ধালো তুই,
দেখবা আসিবে মোক
ধরে লাগাবে তোক।
উত্তর : ঢেহর ও মাছ।
গান : পানো নিশু, গুয়া নিশু
টকরি ভরাইয়া
যুগির ঘরের চুনো নিশু
পাতিরো ভরাইয়া।
গান : যত আছে বেশি পাটি
ও মুই কিনিয়া কনু সারা।

www.pathagar.com

কুরো কাসাই মেথি নিশু,
টপোলা বান্ধিয়া।
শ্লোক : হলো ধন ধীর
সাগরতে ডুবে
কিছুক্ষণ যায়া
শোলার মতোন ভাসে।
উত্তর : ব্যাঙ
গান : হাইরে সখি যত আছে ইস্ট কুটুম
ও মুই নিমোতনো কইশু
শনিবারে অধিবাস
মঙ্গলবারে বেহা।
গান : হাইরে সখি মরুয়া গারু সারি সারি।
ও মোর নিকরের ছাউনি
তাহার তলে বসায় দিশু
সোনার ঘট বাড়ি।
শ্লোক : উপরোতে পরে
কেকের কেকের করে
দুই যাং শের কাটায় শলিমোর
খকর-মকর করে।
উত্তর : রিং-চুয়া বাশ।
গান : ঘোট বসাও বাড়ি বসাও
আরো চালন কুলা
তাহার তলে বেহা হবে
রাধা-কৃষ্ণ দিয়া।
গান : সকল সখি বসায় দিলে
ওমোর মারুয়ারে তলে।
নাওউয়া মাংগানু কি কামানু।
কে বা না আসিয়া ঢালিল জল
কুদদ্দিয়া না উঠিয়া নাওউয়া
চলে গেল ঘর।
শ্লোক : শ্যাম সুন্দরী মাইকিনা
ভিরে বসে কাছে।
টুকরার বেলায় কেকেট মেকেট
ঢুকায় দিলে খিলখিল করে হাসে।
উত্তর : চুড়ি।
গান : ব্রামন আনিয়া মুই বেহাত বসানু
ওমোর উলুলুই মঙ্গল দিয়া।

www.pathagar.com

রাধা-কৃষ্ণের হবে রে বেহা
উলুলুই মঙ্গল দিয়া।
শ্লোক : কড় নাই কাশাই নাই
গন্ধে মলমল
বেহা নাই সাদী নাই
বেরছানী ঘর ঘর।
গান : কইনার মাও দান করে
সোনার আংটি দিয়া।
কইনার রূপ দান করে
পাঁচ কাপড়া দিয়া।
রাধা কৃষ্ণের বেহা হচে
উলুলই মঙ্গল দিয়া।
গান : কইনার মামা, দান পারে
হাতের মোহন বাঁশি।
রাধা কৃষ্ণের বেহা হচে
উলুলই মঙ্গল দিয়া।
শ্লোক : নেপটা ভি চেপটা
গোল ককটা
নাক টনটেন দুই আলী
বিচৎছে কাতিখান গে শালী।
উত্তর : পান, সুপাড়ি, চুন শর্তা
গান : কইনার মামি দান করে
পায়ের নুপুর হাতের বালা
রাধা কৃষ্ণে বেহা হচে
উলুলই মঙ্গল দিয়া।
গান : বেহাতে উঠিয়া নিয়া গেল বহুরার ঘর
আটকায় ধরল দুয়ার।
কেহ চায় শাড়ি, কেহ চায় সুতি।
অত দিবা না পারিয়া
কৃষ্ণ না যায় ভাঙ্গিল দুয়ার।
ত্রিশাল কেটি দেবতা ছুনারে বসিল।
রাধা-কৃষ্ণ যায়য়া ভক্তি করিল।
ভক্তি পাইয়া দেবগণ আনন্দিত হইল।
সকল সখী মিলে ঘরে ফিরিল।
শ্লোক : আগালখান হবর-ঝবর

www.pathagar.com

গোরা খান হুপসা
গোরের পাকে কি কছে ছোয়া
উপর পাকে নিকছে ডিমা ॥ উত্তর : কলা গাছ
গান : ঘরে ঘরে বাধেরা করারে পুছারি
হে সখী কে কে যাবে এজল ভরনে।
সকল সখী সঙ্গে লইয়া যায় রাধে।
এজল ভরনে।
সকল সখীর আনন্দিত মন।
গান : হাতে নিয়া কাকতে কলসি
হে রায় রাধে এজন ভরনে।
শ্লোক : মাঠের গরু কাঠের গাই
গালা কঠিয়া দুধ খাই।
মাথাডা হবর-ঝবর
নেংগর ঠাই নাই। উত্তর : খেজুর গাছ।
গান : উরুয়া উঠাইয়া বিরুয়া পাকালে
হে সখী বিরুয়া বসাল সারি সারি
কলসি ভরাইয়া কাঁধে
বিরুয়া বসলো কলসি বসাল সারি সারি।
গান : এক খানি এক খানি বস্ত্র।
রাখিল খুলিয়া।
ঝাপ দিল যমুনার জলে।
হে সখী সকল সখীর উলঙ্গ বাহার।
হুচা হুচি ডুবা ডুবি সিনান করিল।
হে সখী সকল সখীর উলঙ্গ বাহার
শ্লোক : হেকর কুজা খুঁদে মাটি
দশ খান ঠেং তিন খান কাটি।
উত্তর : লাঙ্গল, হালুয়া গরু।
গান : চড়ার উপর হয়া কৃষ্ণ
ঘটের উপর লুকাইয়া রাখিল
কৃষ্ণ সকলের বস্ত্র।
গান : কি হইল কি হইল
সখী আমার কপালেন
বস্ত্র সকলং হারাইল
ঘর যামু কেমনে।
শ্লোক : ঝাকতে শালি বাহির কনু
নাশাই নুশাই কলাত বসানু
দুই গালে দুই চড় মারে দিনু

www.pathagar.com

কমরটা ভাঙ্গে দিনু
বিচত ধরিয়া লাগে পড়নু।
উত্তর : পানিতে পাট ধোয়া।
গান : দেও দেও কৃষ্ণ জিহে।
আমার বস্ত্র।
আমরা সকল সখীগন।
তোমার নন্দন।
গান : হাতনা তুলি প্রভু
জোড় করি হাত
বস্ত্র না দেও প্রভু
পরিধান করি।
শ্লোক : চামড়ার ভিতর চামড়া ঢুকে
চামড়া পালে সুখ
ঠেলে দিয়া টানে নিলে
মেলে থাকে মুখ। উত্তর : চামড়ার জুতা।
গান : এক খানি বস্ত্র
দিচু ফেলিয়া
আপনা আপনি বস্ত্র
নেহুত চিনিয়া।
গান : আপনা আপনি বস্ত্র
লিলতে চিনিয়া।
হে সখী আপন বস্ত্র করি পরিধান
বস্ত্র না পরিয়া সখালা আনন্দিত হন।
শ্লোক: নাক থেন থেন
নাক থেন থেন,
রুই মাছের তেল
নিজের তানে আন্ধিনুবাড়িনু
মোর ভাসুরের পাতন গেল।
উত্তর: ঘেংগড়
গান : কাকতে কলসি নিয়া ফিরিয়া গেল ঘর।
আলুয়া আতপ চাউল।
পঞ্চ গাভীর দুধ
যায় বাধে ঐ শিব পুঁজতে।
গান : ধুপ ও সিন্দুর কেলা নিল হাতত।
করিয়া সোনার চালন নিন কাকত।
করিয়া হে রাধে যা শিব পুজিবা
আলুয়া আতপ চাউল কলা প্রসাদ

www.pathagar.com

মখিল এক পুরিয়া সিন্দুর
শিবের মাথায় ঢালিল।
শ্লোক : চার ঠেংগিয়া ঝাপিল জলে
নিংঠেঙ্গিয়া বসিল চড়ে
দুনেঙ্গিয়া নিগেল ডালে
বিচার করছে ঠোটে মুখে।
উত্তর : মহিষ, মাছ, চিল জলের মধ্যে।
গান : উলুলই মঙ্গল দিয়া শিবলা পুঁজিল
সকল সখীর আনন্দিত মন।
ঘর মুছিল রাধে চন্দ ছিটালো
বাড়ি শুদ্ধ করিল, হাড়ি পাতিল মাজিয়া।
গান : চুলাতে বসাইয়া দিল হাড়ি
তিন মুঠি চাউল হারিতে খিয়াইয়া দিল।
এক লে ঝিকে ভাত পুটক ধরাইল।
শ্লোক : নাগরতে উৎপত্তি
সাগরেতে ভেস
কাপে জড়িল কইনা
কেটায় কড়িল পেট
উত্তর : টেপা মাছ
গান : এখেতো ধালুয়া ভাত পুটুক কো ধরানো
গাও মেরা দিয়া সাইয়া
নিন্দোতে পারাইল।
গান : ভাত শাগো আইন্ধা শরো ধনি
হইগেলো তোয়ার কেশে যাগামু
ও মুই নিন্দের কুমার
গান : ভাত হলো খর খরা ও মোর
তিয়ন হলো বাসি।
ঘন আটকা দুধের উপর
পইরা গেল মাছি
শ্লোক : এক ভাই সন্যাসী
এক ভাই বৈরাগী
এক ভাই ভাবে
পেট হয়ে গেল খালি।
উত্তর : পানি কুমড়া
গান : উঠ উঠ মহা প্রভু
চেতন কর গাঁও
পুস্পের পালঙ্ক পাইয়া

www.pathagar.com

কতই নিদ্র যাও।
গান : ডাকাইয়া উঠায়ালে রাধে
কহিবে ডাংগর গালি।
হেট লই উঠাইলে লোকে।
কহিবে ভাতার মারি।
চন্দন না ঘুলু ঘুলু কটরা ভরানু
চন্দনের ছিটাতে স্বামীকে জাগানু।
শ্লোক : বাপ ঝাটাং পাঠাং
মাপাতাড়ি
ভাই গুদুম গান্ধাম বহিনী সুন্দরী
উত্তর : মিষ্টি কুমড়া, ফুল, পাতা।
গান : চন্দনের ছিটাতে স্বামী হওয়া গেল চেতন।
উটিয়া না মহা প্রভু মখো পালি নিলো।
কমলার আসনে চাপিয়া বসিল।
গান : খাও খাও মহা প্রভু
খাও অন্ন জল
পান গুয়া খাইয়া
তুষ্ট কর মন।
গান : নাহি যামু ভাত রাধে নাহি খামু শাক
তোমারে না অনুতাপে।
যামু বসবাস।
শ্লোক : হাতছে, পাওছে
জাড়ে ককড়া।
হাত নাই, পাও নাই
সুন্দর খপড়া
উত্তর : বানর, চচু পাখি।
গান : কিনা দোষ পালেন প্রভু
কিনা অপরাধ
কিশেরো কারণে প্রভু
যাবেন বনবাস।
গান : বুরিয়া শ্বাশুড়ি মাগো
মিনতি করু।
তোরে বেটা অনুরাগী
মানায় মোর।
শ্লোক : হাত নাই পাও নাই
নই আমি হাতি
পরের উপকার করি

www.pathagar.com

তবু খাই লাথি।
উত্তর : ঢেঁকি।
গান : আপনা আপনি সায়া (স্বামী)
আপনে মানাবেন যায়য়া
হে সখী পরের সায়া কেশে মানামু।
গান : ফাটোক তো ধরতি মা।
তাহার তলে যাউ
আনতো বিষুয়া পাতা
ওষুধ বটিয়া খাউ।
শ্লোক : চার পাও হাপ-ঝাপ
মাথায় নাই
হাইরে বাপ।
উত্তর : চৌকি।
গান : হাইরে সখী গাছে মধ্যে সরিষারে
ওমোর গাছে পাতে দানা।
যে দিন হতে স্বাইয়া গেছে
ওমোর দিনে আনধি হারা।
গান : হায়রে সখী গাছে মধ্যে শিমুলিয়া
ওমোর গগন চারি ডাল;
সেই ডাল ভাজিয়া পরে
ওমোর অভাগীর কপালে।
শ্লোক : দুই-পাও কুড়ি আঙুল নাকটা
পাও পিষ্ঠে মাথাড়া
চক্ষু বর্ণ মুখও ছে
উত্তর : মানুষ।
গান : সখীরে সগোল ফুল ফুলি,
না ফুটিল বেল।
যে দিন হতে স্বামী হাড়িয়ে
মাথাত নাই মোর তেল।
গান : হায়রে সখী সগোল ফুল ফুলি,
না ফটিল কাশি,
যে হতে স্বামী ছাড়িয়া গেইসে
মুখোত নাই মোর হাসি।
শ্লোক : তুইরে বুড় পাকিশী
পাকার তল ঢুকিশি

www.pathagar.com

চার মাথা কর ঠেং
কেদরে তুই নাকি দেখিনি।
উত্তর : গাভী, বাছুর, বাছুর খরা ও গোহন ব্যাক্তি।
গান : সোগল ফুল ফুটিল রাধে
না ফুটিল হালা।
যে দিন হতে স্বামী ছাড়িসে,
গলাত নাই মোর মালা।
গান : চারি কোনে প্রদ্বীপ জালাইয়া রাখিসু
হে সখী ছায়াবিলে মোর
বাংলা আন্ধার।
শ্লোক : ডালে ঘর, ডালে বাড়ি
আট হামার দুধ, মিঠা বেশি।
উত্তর : মৌমাছির মধু।
গান : পখোরোতে নাইরে পানি,
কি করিবে কুপে।
যেই বা নারীর স্বামী নাইরে
কি করিবে তার রূপে।
গান : হাইরে সখী চল সবে মিলে
ওমোর মথুরার বাজারে।
মোর স্বামী অনুরাগি।
গেইসে বনবাসে।
চল্ চল্ ওহে স্বামী
ফিরে চল্ ঘর।
বুরিয়া শ্বাশুড়ী।
কান্দে অচেতন।
শ্লোক : ইতিং লা বুড়ি
তিন খুটিতে বসে।
দুই খান মুখ তার
এক খান দিয়ে খায়
এক খান দিয়া হাগে।
উত্তর : খোলা।
গান : নাহি যামু ঘর রাধে
নাহি যামু বাড়ি।
তোমারে না অনুরাগে।
হয়ছি বনবাসি।
গান : হস্ত ধরি পায়ে পরি
প্রভু ফিরে চল ঘর।

www.pathagar.com

যত অপবাদ করেছি প্রভু
ক্ষমা কর মোর।
গান : হাইরে সখী রাধা-কৃষ্ণের
মিলন হইল।
ওমোর মথুরার বনে।
বদন বলে সবে মিলে হরিহরি বল।

১৫. লোটোর গান

লোটোর গান দাইঘুরা গানের আদলে দর্শক-শ্রোতার মাঝখানে ১, ১/২, ২ ফুট জায়গা ফাঁকা রেখে মঞ্চ ছাড়াই মাটিতেই পরিবেশিত হয়। তবে লোটোর দলের শিল্পী, যন্ত্রী, দোহার অর্থাৎ সকল কুশলীই একবারেই আসরে প্রবেশ করেন এবং এ গানের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সকলেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন।

এ ধরনের গানের পরিবেশনার রীতি হচ্ছে, দুজন অনেকটা সার্কাসের জোকারের আদলে পোশাক ও মেকআপ করে, প্রথম জন একটি শ্লোক বলে থাকে, অন্যজন তার উত্তর দেয়, এই প্রশ্নোত্তরের মাঝখানে বাজনা সহকরে দ্রোপদীর বস্ত্রহরণের সংগীত পরিবেশন করে থাকে।

১৬. মখার গান

মখার গান দাইঘুরা গানের রীতি অনুযায়ী পরিবেশিত হয়ে থাকে। দর্শক-শ্রোতার মাঝখানে ১, ১/২, ২ ফুট ফাঁকা জায়গা রেখে মাঝখানে যন্ত্রীদল, দোহার, মাস্টার বসে থেকে কুশলীবৃন্দ এবং কনা দিয়ে আগমন প্রস্থানে কাহিনি শেষ করে।

মখার গান মূলতঃ রাম রাবন কাহিনি। এদের প্রধানকে শিবদোহার বলা হয়। শিবদোহার মূল কাহিনিকে নির্দেশ করে। রামের বনবাস এবং রাম যাত্রার বিরহ-বেদনাকে সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশ ফোটাই মখার গানের উদ্দেশ্য।

মখার গানে ঐতিহ্যবাহী পোশাক এবং সংলাপ রীতিতে সাধু ভাষা অলংকার বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মখার গানে মুখোশের ব্যবহার একটি প্রচলিত রীতি। রাবনের দশমাথা, কালি, হনুমানের কাহিনির প্রয়োজনে প্রায় সকলের মুখোশ ব্যবহার মখার গানের বা মাখার বিশেষ অনুষঙ্গ। মখার গানের রাম লক্ষণ সীতার বিরহ দর্শকের চিত্ত্বে করুণার উদ্রেক করে। বিশেষত হিন্দু অঞ্চল হওয়ায় দর্শক হৃদয়ে খুব প্রভাব বিস্তার ও জনপ্রিয় একটি পরিবেশনার নাম মখার গান।

চোর চুন্নির গান

সময় : কালিপূজোয় পরিবেশিত হয়। দলে মোট লোক বা শিল্পী সংখ্যা ৭/৮ জন। এর মধ্যে ২ জন ছোকড়া, একজন চোর, একজন চুন্নি বাজনা, একটা খোল, করতাল ও বাঁশি।

www.pathagar.com

সজ্জা : ছোকরা দুজনের পায়ে নূপুর (ঘুঘুরা) কমরে ঘাঘরা, ব্লাউজ, মাথায় কুচি করে ওড়না।

মেকআপ : সফেদা পাউডার, সিঁদুর পানি ও তৈল মিশ্রণকে মেক আপ করা হয়। চোর এবং চুন্নির দুই জনের হাতে লাঠি থাকবে যা দিয়ে গৃহস্থের ধাপ (বারান্দাকে) সিং দেওয়ার চেষ্টা করবে। এর মধ্যে গৃহস্থ তাদেরকে সন্তুষ্ট করবে আর বড়ো ধরনের কোনো ক্ষতি করবে না।

পরিবেশন পদ্ধতি : সকলেই দাড়িয়ে দাড়িয়ে সংগীত পরিবেশন করে থাকে।

পোশাক : কলার পাতা ঝিরিঝিরি করে কোমরে জড়িয়ে রাখবে।

গান :

বন্দনা: স্বরস্বতিভার আগে বন্দনা।
স্বরস্বতিভার নিয়ে নীল কাইঞ্জন জনা
বন্দনা : পূর্বে বন্দিয়া নিলাম ধর্ম নিরঞ্জন
তাহাতে করিলাম আমি পূজার আয়োজন।
উত্তরে বন্দিয়া নিলাম কালিমায়ের চরণ
কালিমার জনম হইল দক্ষ বাজার ঘর।
দক্ষিণে বন্দিয়া নিলাম গাঙ্গি মার চরণ।

গান :

১. বুড়া রইস্যা মোক ধান পারায়ে দে
ওঠেছিল বল্লাইর ছাত খান।
দেখিস কামারে
বলিডি কইছে ঢুক ঢুক
রইস্যাডি পাইসে রেড়বার সুখ
ঐডি গলিয়ে খাবে রইস্যার ঘরগে
বুড়া রইস্যা মোক ধান পারায়দে।

২.দাদা গে মোক কাকই কিনিয়া দে
সবাই যাছে কালির বাজার লোক যাবা দে।
হেমন কাকই কিনিয়া দিলো, দুনো পাকে ধার
কেশোতে চড়িয়া কাকই ধরে অবতার।
চুচুরা চুলিডাক জল দিয়ে নাশাছে
রসের খোপা বিরলে হালেছে।

৩. চোর গেইসে চুরি কোরবা,
চুন্নি নাইঞ্চে (রাধছে) ভাত
চোরের তানে রান্ধে (রান্না করে) থুইসে
জিয়ান মাগুর মাছ।
চোর গেইসে চুরি কোরবা
শহরে বন্দরে গে।
নয়া চোরটা ধরা পইসে থানাত খবর দে গে
ইজর মরণ কেদুর গে,
নয়া চোরটা ধরা পইসে থানাত খবর দে গে।

৪. কাকড় বেড়ায় ত্যালি আলি

www.pathagar.com

ধরালো না যায় গে
দাদার মোগি, ভাউজি কাকর ধরিয়া দে গে
উচা উচা আলি গে,
শেকনা আলি পার হইতে
নিলে গলার হার গে,
কে গুথিবে হার গে,
ঘরতে আছে মাধব দেওরা
কে পুথিবে হার গে।

তথ্যনির্দেশ

১. আ : মালেক, বয়স : ৫৫, পিতা : আলী মুদ্দিন গ্রাম : বসতপুর, ইউনিয়ন : লেহেম্বা পেশা : চাকুরী, উপজেলা : রানীশংকৈল, জেলা : ঠাকুরগাঁও।
২. মো : শরিফ উদ্দিন আহাম্মেদ, পিতা : মৃত. মো : আফসার আলী, সাং : গজ ধুমডাঙ্গী, থানা : হরিপুর, জেলা : ঠাকুরগাঁও
৩. ঐ।
৪. মাইকেল(৩৫), পিতা : সুরেশ চন্দ্র রায়, গ্রাম : সিটব্রমপুর, ইউনিয়ন : নেহেম্বা, উপজেলা : রানীশংকৈল, জেলা : ঠাকুরগাঁও।
৫. মালেক, ঐ।
৬. মিরা রাণী রায়, স্বামীর নাম : নৃপেন্দ্রনাথ রায়, বয়স : ৪২ বছর, শিক্ষা : -৫ম শ্রেণী, গ্রাম : ধনোগাঁও, ডাকঘর : দৌলতপুর, উপজেলা : ঠাকুরগাঁও, জেলা : ঠাকুরগাঁও।
৭. ঐ।
৮. মিরা রানি রায়, স্বামীর নাম : নৃপেন্দ্রনাথ রায়, বয়স : ৪২ বছর, শিক্ষা :-৫ম শ্রেণি, গ্রাম : ধনোগাঁও, ডাকঘর : দৌলতপুর, উপজেলা : ঠাকুরগাঁও, জেলা : ঠাকুরগাঁও।
৯. ঐ।
১০. মিরা রানি রায়, স্বামীর নাম : নৃপেন্দ্রনাথ রায়, বয়স : ৪২ বছর,শিক্ষা : -৫ম শ্রেণি, গ্রাম : ধনোগাঁও, ডাকঘর : দৌলতপুর, উপজেলা : ঠাকুরগাঁও, জেলা : ঠাকুরগাঁও
১১. ঐ।
১২. মিরা রাণী রায়, স্বামীর নাম : নৃপেন্দ্রনাথ রায়,বয়স : ৪২ বছর,শিক্ষা : -৫ম শ্রেণী, গ্রাম : ধনোগাঁও, ডাকঘর : দৌলতপুর,উপজেলা : ঠাকুরগাঁও, জেলা : ঠাকুরগাঁও
১৩. রাধামনি রায়(৪৫), গ্রাম ও ডাক : দৌলতপুর, জেলা : ঠাকুরগাঁও।
১৪. ঐ।
১৫. ঐ।
১৬. ঐ।
১৭. ঐ।
১৮. খিলছরি বেওয়া(৫২), স্বামী : মৃত : কঙ্কন সিংহা, গ্রাম : সৌলা দোগাছি, ডাক : রামুনিয়া, উপজেলা : বালিয়ডাঙ্গা, জেলা : ঠাকুরগাঁও।
১৯. খিলছরি বেওয়া(৫২), স্বামী : মৃত : কঙ্কন সিংহা, গ্রাম : সৌলা দোগাছি, ডাক : রামুনিয়া, উপজেলা : বালিয়ডাঙ্গা, জেলা : ঠাকুরগাঁও।
২০. সূর্য মণি বেওয়া (৪০), গ্রাম : সৌলা দোগাছি, ডাক : রামুনিয়া, উপজেলা : বালিয়ডাঙ্গা, জেলা : ঠাকুরগাঁও।
২১. মিরা রানি রায়, স্বামীর নাম : নৃপেন্দ্রনাথ রায়, বয়স : ৪২ বছর, শিক্ষা : -৫ম শ্রেণি, গ্রাম : ধনোগাঁও, ডাকঘর : দৌলতপুর, উপজেলা : ঠাকুরগাঁও, জেলা : ঠাকুরগাঁও

www.pathagar.com

২২. ঐ।
২৩. মিরা রানি রায়, স্বামীর নাম : নৃপেন্দ্রনাথ রায়, বয়স : ৪২ বছর, শিক্ষা : -৫ম শ্রেণি, গ্রাম : ধনোগাঁও, ডাকঘর : দৌলতপুর, উপজেলা : ঠাকুরগাঁও, জেলা : ঠাকুরগাঁও
২৪. মিরা রানি রায়, স্বামীর নাম : নৃপেন্দ্রনাথ রায়, বয়স : ৪২ বছর, শিক্ষা : -৫ম শ্রেণি, গ্রাম : ধনোগাঁও, ডাকঘর : দৌলতপুর, উপজেলা : ঠাকুরগাঁও, জেলা : ঠাকুরগাঁও
২৫. মিরা রানি রায়, স্বামীর নাম : নৃপেন্দ্রনাথ রায়, বয়স : ৪২ বছর, শিক্ষা : - ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : ধনোগাঁও, ডাকঘর : দৌলতপুর, উপজেলা : ঠাকুরগাঁও, জেলা : ঠাকুরগাঁও।
২৬. মিরা রানি রায়, স্বামীর নাম : নৃপেন্দ্রনাথ রায়, বয়স : ৪২ বছর,শিক্ষা : - ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : ধনোগাঁও, ডাকঘর : দৌলতপুর, উপজেলা : ঠাকুরগাঁও, জেলা : ঠাকুরগাঁও।
২৭. ঐ।
২৮. মিরা রানি রায়, স্বামীর নাম : নৃপেন্দ্রনাথ রায়, বয়স : ৪২ বছর, শিক্ষা : -৫ম শ্রেণি, গ্রাম : ধনোগাঁও, ডাকঘর : দৌলতপুর, উপজেলা : ঠাকুরগাঁও, জেলা : ঠাকুরগাঁও।
২৯. মিরা রানি রায়, স্বামীর নাম : নৃপেন্দ্রনাথ রায়, বয়স : ৪২ বছর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : ধনোগাঁও, ডাকঘর : দৌলতপুর, উপজেলা : ঠাকুরগাঁও, জেলা : ঠাকুরগাঁও।
৩০. মিরা রানি রায়, স্বামীর নাম : নৃপেন্দ্রনাথ রায়, বয়স : ৪২ বছর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : ধনোগাঁও, ডাকঘর : দৌলতপুর, উপজেলা : ঠাকুরগাঁও, জেলা : ঠাকুরগাঁও।
৩১. মিরা রানি রায়, স্বামীর নাম : নৃপেন্দ্রনাথ রায়, বয়স : ৪২ বছর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : ধনোগাঁও, ডাকঘর : দৌলতপুর, উপজেলা : ঠাকুরগাঁও, জেলা : ঠাকুরগাঁও।
৩২. ঐ।
৩৩. মিরা রানি রায়, স্বামীর নাম : নৃপেন্দ্রনাথ রায়, বয়স : ৪২ বছর, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, গ্রাম : ধনোগাঁও, ডাকঘর : দৌলতপুর, উপজেলা : ঠাকুরগাঁও, জেলা : ঠাকুরগাঁও।
৩৪. শিল্পীর নাম : মলিন চন্দ্র রায়,বয়স : ২৮ পেশা : চা দোকানদারি, গ্রাম : বলিদ্বারা, ৮ নং ইউপি., রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও, সংগ্রাহক- সংগ্রহ : তাজুল, তাং : ১৭.০৮.২০১১
৩৫. শিল্পির নাম : আ : হামিদ, বয়স : ৪৮ বৎসর, পেশা : চা দোকানদার, মহল্লা : ১ নং ওয়ার্ড, পৌরসভা, রানীশংকৈল,

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

সংগীতের জগৎ মূলত সৌন্দর্যের জগৎ। দৈনন্দিনতার স্পর্শমুক্ত, তুচ্ছতার উর্ধ্বে সৌন্দর্য সাধনায় মানবমনের যে ধ্যান, সংগীত তারই অমূর্ত আবহ রচনা করে চিত্ত শুদ্ধি ও সিদ্ধির পথ দেখায়। এ জন্য সংগীত সাধনা সংস্কৃতি চর্চার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে। সমালোচকের ভাষায়–"সৌন্দর্য সৃষ্টি করাই হচ্ছে মনুষ্যজীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। এদের সবচেয়ে সুলভ, সবচেয়ে সহজ ও সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে সংগীতের সুর। গান কানে কানে মধু বর্ষণ করে, প্রাণে প্রাণে প্রতিধ্বনি তোলে, মনে মনে মোহ ছড়ায়, আত্মায় আত্মায় প্রেম জোগায়।" অর্থাৎ মানবজীবনবোধে সংগীতের প্রভাব যেমন ব্যাপক, তেমনি সংগীত চর্চার ভেতর দিয়ে মানবজীবন পূর্ণতা ও সার্থকতার দিকে এগিয়ে যায়। সংগীত চর্চার দ্বারা মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মতম বৃত্তির বিকাশ সম্ভব হয়। সংগীতহারা জাতি মূক প্রাণির মতো মূঢ়।

কণ্ঠসংগীত বা গান, যন্ত্রসংগীত বা তাল শিল্পকলার অতি শৃঙ্খলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত রস সৃষ্টি। সুরের ছন্দসুষমায় ইন্দ্রিয়সুখকর মায়ালোকে মনকে আকর্ষণ করাই গানের ও তালের উদ্দেশ্য। সুশৃঙ্খলিত শিল্পসৃষ্টি বলতে সংগীত কৃত্রিম জীবনপ্রয়াস নয়, প্রাত্যহিক জীবন স্পন্দনে যে স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দ-দোলা অর্থাৎ দৈনন্দিন কাজকর্মে, হাসি-কান্নায়, চাল-চলনে যে অসংবৃত ছন্দবেগ সংগীতকলায় বিদ্যমান তাকেই সুষমিত করা হয়। জীবনধর্মী সকল শিল্পকলারই এটি সারকথা। যন্ত্রকে মানুষ আয়ত্তে এনে সুললিত ধ্বনি সৃষ্টি করে। অনায়ত্ত বাদ্যধ্বনি সোরগোল, সুরতাল নয়। সুর সৃষ্টিই বাদ্যযন্ত্রের মূল লক্ষ্য। কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীত সংগীতকলার দুটি পরস্পরিত অঙ্গ, তবে পরস্পর নির্ভরশীল নয় অর্থাৎ যন্ত্র ছাড়া গান, বা কণ্ঠ ছাড়া তাল সৃষ্টি একেবারে অসম্ভব নয়। কথাকে কণ্ঠ ও যন্ত্র দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। কেবল উভয়ের সংমিশ্রণে সুর পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে, সুরের মাধুর্য বাড়ে।

বাদ্যযন্ত্র কেবল সুর সৃষ্টি করে না, তালও সৃষ্টি করে। নৃত্যছন্দে বাদ্যের তালসঙ্গত অপরিহার্য। সংগীতের মহিমা সুর মূর্ছনায়, নৃত্যের ঐশ্বর্য সুললিত ছন্দে। বাদ্যধ্বনি সে ছন্দ জোগায়। বাদ্যের তালে তালে নৃত্য। বাদ্যের ধ্বনি ও তাল নৃত্য সৌন্দর্যকে কানে পৌঁছিয়ে দেয়। বাঁশির সুর, বীণার ঝঙ্কার যেমন সংগীতের মায়াজাল রচনা করে, নূপুরের নিক্কণ, ঝুমুরের শিঞ্জন তেমনি নৃত্যের মন্ত্রপুরী রচনা করে। তালবাদ্য নৃত্যে কেবল ছন্দ আনে না, গতিও আনে। নৃত্য যাতে বেতাল হয়ে না যায়, গতিহারা না হয়, সেজন্য বাদ্যযন্ত্রের সুষম সঙ্গত প্রয়োজন।[১]

সংগীতজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে, ধ্বন্যাত্মক 'নাদ' থেকে বাদ্যের উৎপত্তি। যা হতে সংগীত উপযোগী বাদ্য ধ্বনিত হয় তাই বাদ্যযন্ত্র। বাদ্যযন্ত্রের গঠনপ্রণালী ও

www.pathagar.com

ব্যবহাররীতির প্রকারভেদ আছে। ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে চার শ্রেণির বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। যথা :

১. তত-তার যোগে যে বাদ্য বাজে : একতাঁরা, দোতাঁরা, বীণা, সেতাঁরা, সারোঙ্গী ইত্যাদি।

২. শুষির-ফুঁ দিয়ে যে বাদ্য বাজে : বাঁশি, শঙ্খ, সানাই, শিঙ্গা ইত্যাদি।

৩. ধাতু নির্মিত বাদ্যযন্ত্র, আঘাত দিয়ে বাজানো হয় : কাঁসর, করতাল, মন্দিরা, ঘণ্টা ইত্যাদি।

৪. আনদ্ধ চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র, আঘাত দিয়ে বাজানো হয় : ঢাক, ঢোল, খোল, মাদল, খঞ্জরী, ডুগডুগি ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তিন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। যথা :

১. String instrument- সুতা বা তার যোগে ধ্বনিত বাদ্য : ভায়োলিন, গিটার, পিয়ানো।

২. Wind instrument- ফুঁ বা বাতাসের সাহায্যে যে যন্ত্র বাজানো হয় : হারমোনিয়াম, একর্ডিয়ান, ট্রাম্পেড, মাউথ অর্গান।

৩. Instrument of Percussion- আঘাত দিয়ে যে বাদ্য বাজে : ড্রাম, বেল, গং ইত্যাদি।

পাশ্চাত্যমনে বাদ্যযন্ত্রের বিভাগটি বাদ্যরীতি ও ধ্বনিনিনাদের দিক থেকে করা হয়েছে। এরূপ বিচারে প্রাচ্যের 'ঘন' ও 'আনদ্ধ' বিভাগ দুটি প্রতীচ্যের একই বাদ্যের (Percussion Instrument) শ্রেণিভূক্ত হয়েছে। তবে অন্য দুটি বিভাগ উভয় অঞ্চলে অভিন্ন। পণ্ডিতগণ মনে করেন, মানবসভ্যতার ইতিহাসে আনদ্ধ শ্রেণির বাদ্যযন্ত্র সর্বাগ্রে আবিষ্কৃত হয়। ড্রাম বাদ্যাদি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। কাঠের ফাঁপা গুঁড়ি ড্রামের আদি উৎস। এরপরে তন্তু বা তত জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার সাধিত হয়। ভারতীয় বীণা ও ইউরোপীয় হার্প প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। শুষির শ্রেণী বাদ্যের উদ্ভাবন সর্বশেষে হয়েছে। শঙ্খ, শিঙ্গা প্রভৃতি প্রকৃতি-প্রদত্ত উপকরণে নির্মিত বাদ্যযন্ত্র। শঙ্খ, শিঙ্গা থেকে সে সুরধ্বনি ওঠে তা তেমন সুমিষ্ট নয়, লোক-জীবনাচারে এগুলোর অধিক ব্যবহার দেখা যায়। বাঁশির সুর সুমধুর। তা সূক্ষ্ম ও বিচিত্র ধ্বনি সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য বাঁশি মানুষের পরিণত মনের আবিষ্কার বলে ধরা হয়।[২]

বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের ইতিহাস

প্রাচীনকাল থেকে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার চলে আসছে। অনার্যরা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতো কিনা এ সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ এ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। তবে বাংলার উপজাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে যেসব বাদ্যের প্রচলন দেখা যায়, তার কোনো কোনোটি প্রাচীনকালের হতে পারে। বিশেষ করে চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র মানুষের প্রাচীনকালের আবিষ্কার। বাংলাদেশে ঢাক-ঢোলকাদি যারা তৈরি করে, তাঁরা হিন্দু সমাজের অতি নিচসম্প্রদায়ের লোক। তাঁরা তপশিলীভূক্ত চর্মকার সম্প্রদায়। এদের রক্তে অনার্য

www.pathagar.com

প্রবাহ আছে। প্রাচীনকালে লৌকিক জীবনসাধনায় ও ধর্মসাধনায় উৎসব-অনুষ্ঠানের এরাই আয়োজন করতো এবং তাতে অংশগ্রহণ করতো। কৃষি সভ্যতার পত্তন করে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বাঙালি জনপদ এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতির বাহক ও প্রতিপোষক ছিল। লোকায়ত জীবনধারার নানা মোটিফ, শিল্পকৃতির প্রাপ্ত নিদর্শন এবং ভাষা সম্পদের বস্তুব্যঞ্জনা থেকে তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট নিরূপন করা দুঃসাধ্য নয়। অষ্টম শতকের পাহাড়পুর-ময়নামতির প্রস্তর ফলক ও পোড়ামাটির চিত্রের মধ্যে লোকায়ত ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে। পোড়ামাটির চিত্রগুলো এদেশের লোকশিল্পীর অবদান। এতে নৃত্য-বাদ্যরত মনুষ্য প্রতিমা পাওয়া গেছে। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে কাঁসর, করতাল, ঢাক, বীণা, মৃদঙ্গ, বাঁশি, মৃৎভাণ্ড প্রভৃতি চিত্র দেখা যায়। রাজেশ্বর মিত্র ঢাক, ডম্ফ, ডমরু প্রভৃতি 'চর্মবাদ্য' এবং শিঙ্গা, তুবড়ি প্রভৃতি 'ফুৎকার বাদ্য'কে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অবদান বলে মনে করেন। অনার্যোত্তর প্রাচীন বাংলায় (বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবপুষ্ট) সংগীতাদির নিদর্শন সংস্কৃত গ্রন্থ, প্রস্তর ফলক ও মন্দির গাত্রে অঙ্কিত চিত্র প্রভৃতি। এছাড়া বাংলা ভাষায় রচিত দু'একটি গ্রন্থেও রাগরাগিনী ও বাদ্যযন্ত্রের নাম পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধযুগে সংগীত বিষয়ক অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে ভরত মুনির 'ভরতনাট্যশাস্ত্র' (পাঁচ শতক), লোচনের 'রাগতরঙ্গিনী' (বার শতক) সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' (এগার শতক), শার্ঙ্গদেবের 'সংগীতরত্নাকর' (তের শতক) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সর্বভারতীয়। সংস্কৃত গ্রন্থগুলোতে গীত-নৃত্য-বাদ্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

বাংলা ভাষায় রচিত প্রাপ্ত নিদর্শনের প্রাচীনতম গ্রন্থ চর্যাপদ। চর্যাপদ গীতের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল, পদশীর্ষে বিভিন্ন রাগরাগিনীর উল্লেখই তার প্রমাণ। চর্যাগীতের মধ্যে নট-নৃত্য-বাদ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। চর্যার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদে মোট সাতটি বাদ্যযন্ত্রের নাম পাওয়া যায় যথা- বীণা, পটহ, মাদল, করণ্ড, কসালা, দুন্দুভি এবং ডমরু। এগুলোর মধ্যে পটহ, মাদল, করণ্ড, কসালা ও দুন্দুভি বিবাহোৎসবে বাজানো হতো বলে বর্ণিত হয়েছে। বীণা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এটি শুকনো লাউয়ের সাথে তাঁতের তার দিয়ে তৈরি। সারি বা ছড় দিয়ে তা বাজানো হতো।

'শূণ্যপুরাণে'র এক স্থানে বিয়াল্লিস বাজনা'র উল্লেখ আছে, সেখানে শুধু জয়ঢাক ছাড়া অন্য বাদ্যের নাম পাওয়া যায় না। তবে গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে কতগুলো বাদ্যের নাম পাওয়া যায় যথা- ঢাক, ঢোল, কাড়া, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, ডম্বুরু, দুন্দুভি, বরঙ্গ, ভোর, ধীরকালি, শঙ্খ, ঘণ্টা, শিঙ্গা, জয়ঢাক, দামামা ও খমক। এগুলোর অধিকাংশ ধর্মপূজার ব্যবহৃত বাদ্য হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। শেষের বাদ্য দুটি প্রক্ষিপ্ত। দামামা ও খমক ফার্সি শব্দ। মুসলমানদের আগমন, অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের পরে এগুলোর চল হয়।

www.pathagar.com

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি উত্তম গীতিনাট্য। এর প্রতিটি পদের শীর্ষে রাগ ও তালের উল্লেখ আছে। এতে রাগতালের আধিক্য থাকলেও বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ খুব কম। মুরলী বা মোহন বাঁশির কথা বেশি আছে। বংশী খণ্ডের একটি পদে বাঁশি ছাড়া অন্য দুটি বাদ্যের নাম পাওয়া যায়- করতাল ও মৃদঙ্গ। বাদ্যদ্বয় কৃষ্ণের নাচের তালবাদ্যরূপে জ্ঞাপিত হয়েছে।[৩]

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৯৩-১৪১০) সংগীত রসিক ও সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে চৈনিক পর্যটক মাহুয়েন রাজধানী গৌড়ে প্রভাতী সংগীতের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনা এরূপ, "একদল গায়ক ছিল যন্ত্রসংগীতে সুনিপূণ। প্রত্যেক দিন ভোরবেলা তাঁরা সম্ভ্রান্ত লোকদের বাড়িতে গিয়ে সানাই, ঢোলক বাজিয়ে গান গেয়ে অর্থ উপার্জন করতো।" সানাই এবং ঢোলক মুসলমানদের অবদান বলে ড. শহীদুল্লাহ উল্লেখ করেছেন। মাহুয়েনের দু'বছর পরে ফেইসিন গৌড়ের রাজ দরবারে ভোজন সভায় নর্তকী ও গায়িকার বর্ণনা দিয়েছেন। এরা পোশাকে ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত হয়ে নাচতো ও স্থানীয় লোকসংগীত গাইতো।[৪]

ষোল শতকে বাংলাদেশে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে উত্তর ভারতের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়, এতে ভাব বিনিময়ের পথ সুগম হয়। মুসলমানি গীতবাদ্যের সাথে বাঙালি নতুন করে পরিচয় লাভ করে। সে সময় থেকে বাংলাদেশ ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রচিত কিছু সংগীত বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলোতে রাগ-তাল-বাদ্য সম্বন্ধে বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। সতেরো শতকের কবি আলাওল, আঠারো শতকের কবি আলী রজা, ফাজিল নাসির মুহম্মদ প্রমুখের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। বলা বাহুল্য তাঁরা শিক্ষিত কবি। তাঁরা যেসব বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করেছেন, সেসব মঙ্গলকাব্যেও পরিলক্ষিত হয়। কবিদের বর্ণনা অনুসারে বাদ্যগুলো সংগীত ও নৃত্যের সুর ও তাল সঙ্গত হিসেবেই ব্যবহৃত হতো। আহমদ শরীফের মতে, রাগ-তাল-বাদ্যের বর্ণনায় মুসলমান কবিগণ সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্রকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

এরপর ইংরেজদের আগমনে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। পাশ্চাত্য সংগীত ও বাদ্যের প্রভাব তখন থেকে পড়তে থাকে। হারমোনিয়াম এদেশে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে। পল্লীর অশিক্ষিত লোকেরা আজও নিজেদের গান-বাজনায় হারমোনিয়াম ব্যবহার করে।[৫]

বাংলার লোকবাদ্যের গঠন প্রকৃতি ও বাদনপদ্ধতি বিচারে উচ্চাঙ্গের বাদ্যের মতোই শ্রেণিবিভাগ করা যায় অর্থাৎ এগুলোও তত, আনদ্ধ, ঘন ও শুষির-এ চারভাগে বিভক্ত। লোকবাদ্যের উপকরণ সাধারণ গঠন প্রণালীও জটিলতাহীন। লাউয়ের খোল, বেল-নারিকেলের মালা, বাঁশ, কাঠ, নল, পাতা, মাটি, লোহা, পিতল, সুতা, তার, শিং, শঙ্খ প্রভৃতি লোকবাদ্যের বস্তু উপকরণ। বাদ্যে বাঁশ কাঠের ব্যবহার বেশি। লাউয়ের খোল ও নারিকেলের মালা দেশজ সহজলভ্য বস্তু। লোহা ও পিতলের ধাতব পাত্র, পাতা বা তারের ব্যবহারও নূন্য নয়। ঘন বাদ্য ধাতব পদার্থের তৈরি। তত বাদ্যে তারের প্রয়োজন হয়। আনদ্ধ বাদ্যে গরু-ছাগল-সাপের চামড়ার ছাউনি থাকে। বাঁশ-পাতা-নল প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে শুষির বাদ্য তৈরি হয়। কিছু বাজনায় প্রাকৃতিক বস্তু

www.pathagar.com

প্রায় অবিকৃত অবস্থায় ব্যবহৃত হয় যেমন– শঙ্খ, শিঙ্গা প্রভৃতি। তালগাছের শুকনো পাতা দিয়ে পাতবাঁশি তৈরি হয়। মাটির ছোটো কলসি তাল বাদ্য হিসেবে বাংলার প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। চারা অবস্থায় আমের আঁটি দিয়ে ভেঁপু বানানো হয়। গ্রামের ছেলেমেয়ে তাই বাজিয়ে বাঁশির সখ মিটায় এবং যন্ত্র ধ্বনির রসোপভোগ করে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সাহায্যেও ধ্বনি সৃষ্টি করা হয়। মুখে শিষ, হাতে হাততালি, আঙুলে চুটকি, বগলে বগলধ্বনি ইত্যাদি দ্বারাও সুরের সাধ মিটানো হয়। উলুধ্বনি ও জিকর ধ্বনি শারীর ক্রিয়ায় উৎকৃষ্ট। এগুলোকে শারীর ধ্বনি (circum-locution) নাম দেওয়া যায়। ৬

বাদ্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করে বাংলার নিম্নের লোকবাদ্যগুলোর আলোচনা করা হলো :

তত- একতাঁরা, বেনা, দোতাঁরা, সারিন্দা, খমক;
আনদ্ধ- ঢাক, ঢোল, খোল, ডুগডুগি, খঞ্জরি, ডফ;
ঘন- কাঁসি, জুড়ি, করতাল, খড়তাল, চটি;
শুষির- বাঁশি, পাতবাঁশি, তুবড়ি, শঙ্খ, শিঙ্গা, ভেঁপু।

গ্রামের অশিক্ষিত জনসাধারণ দেশজ সুলভ উপকরণে এগুলো তৈরি করে। বস্তুর স্থূলতা ও গঠনপ্রণালীর সরলতার জন্য বাদ্যগুলোতে সূক্ষ্ম, জটিল, বিচিত্র সুর সৃষ্টি করা যায় না। সাধারণ সুর-তালের উপযোগী সরল বাদ্যযন্ত্রই লোকবাদ্য। যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বীণা বা গিটারের তার বাঁধা হয়, লোকবাদ্যের একতাঁরা বা দোতাঁরায় সেরূপ যত্ন বা কৌশল নেই। দেশের জনগণ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাদ্যগুলো ব্যবহার করে। বিশেষ করে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে এসব বাদ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। (ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, গতিধারা, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০, প্রকাশকাল : মার্চ ২০০১, পৃ:১০৮)।

১. একতাঁরা

রাখালের সৌন্দর্য যেমন বাঁশি, ঢুলীর সৌন্দর্য ঢোল, সাপুড়ের সৌন্দর্য তুবড়ি, তেমনি বাউলের সৌন্দর্য একতাঁরা। একতাঁরা বাজিয়ে বাউল তার মরমির গান গেয়ে পল্লীর মাঠে-ঘাটে, হাটে-বাটে ঘুরে বেড়ায় আর সাঁই-এর সন্ধান করে। কানের কাছে একতাঁরাটি মৃদুল গুঞ্জন তোলে, বাউল তন্ময় হয়ে সুরের সাথে গান গায়, তাঁর ঘরছাড়া বিবাগী হৃদয় সুরলোকে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

নামেই প্রমাণ করে একতাঁরা একতার বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। একটি তারের কম্পনেই সুরধ্বনি ওঠে। একতাঁরা বস্তু-উপকরণ সাধারণ, এর গঠনপ্রণালীও সহজ। লাউ, বেল, নারিকেলের 'বস' বা কাঠের খোল, বাঁশের ডাঁটি, তার বা সুতা এবং চামড়া। এক এক রূপের একতাঁরায় এগুলো ব্যবহৃত হয়। উপকরণ ও আকৃতিভেদে চার রকমের একতাঁরা দেখা যায়। এগুলোর ভিন্ন ভিন্ন নাম যথা : লাউ, একতাঁরা, গোপীযান্ত্র ও থুনথুনে। (ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, গতিধারা, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০, প্রকাশকাল : মার্চ ২০০১, পৃ:১০৮)।

www.pathagar.com

২. বেনা

'বেনা' বীণার বিকৃত উচ্চারণ। কিন্তু বীণার সঙ্গে বেনার কোনো সামঞ্জস্য নেই। বরং গঠনপ্রণালী ও বাদ্যরীতির দিক থেকে বেহালার সঙ্গে কিছু মিল আছে। তার ও ছড়ের ঘর্ষণে বেনার সুর ওঠে। এর গঠনপ্রণালী অনেকটা একতাঁরার মতো। একটা গোলাকার নারিকেলের মালার একপাশে আছে চামড়ার ছাউনি। মালাটি ছিদ্র করে একটা বাঁশের ডাঁটি লাগানো হয়। ডাঁটির নিচ থেকে তার চামড়ার উপর দিয়ে কানের সাথে বাঁধা থাকে। এখানে ঘোড়ার লেজের চুল বা 'ফিকে' তারের কাজ করে। চামড়ার উপরে থাকে কাঠের ঘোড়া। বাঁশের 'কাবারী'র সাথে ঘোড়ার ফিকে বেঁধে ছড় তৈরি করা হয়। বেনা রংপুরে কেচ্ছাগান, কুশানগান ও রামায়ণগানে বাজানো হয়।

বাদ্যযন্ত্রের নাম :

ক. ঢোল খ. ঢাক গ. কারখা ঘ. ঢোলক ঙ. খোল/মৃদঙ্গ চ. খমক/গুবি ছ. খঞ্জরী জ. ডুগি	ঝ. তবলা ঞ. একতাঁরা ত. দোতাঁরা থ. সাঁনাই দ. কর্ণেট ধ. ফুলেট ন. হারমোনিয়াম

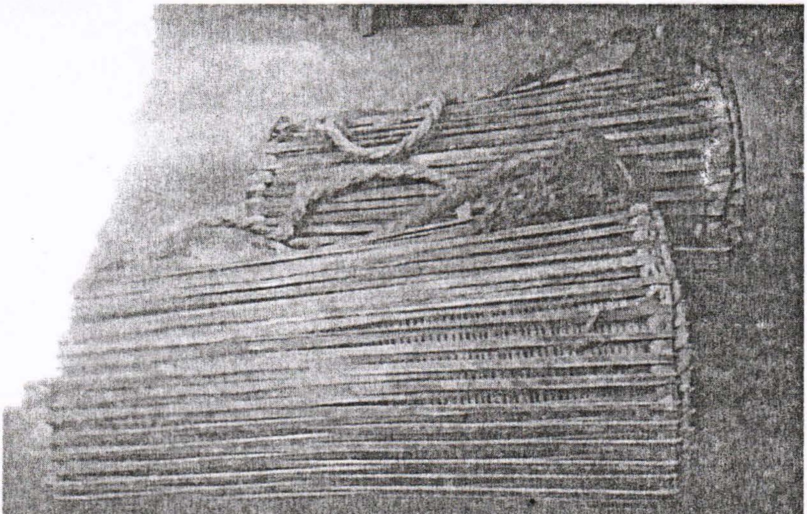

লোকবাদ্যযন্ত্র

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১ ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, গতিধারা, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০, প্রকাশ মার্চ ২০০১, পৃ:৯৯

২ ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, গতিধারা, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০, প্রকাশকাল : মার্চ ২০০১, পৃ:১০১-১০২

৩ ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, গতিধারা, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০, প্রকাশকাল : মার্চ ২০০১, পৃ:১০২-১০৩

৪ ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, গতিধারা, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০, প্রকাশকাল : মার্চ ২০০১, পৃ:১০৪

৫ ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, গতিধারা, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০, প্রকাশকাল : মার্চ ২০০১, পৃ:১০৫-১০৬

৬ ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, গতিধারা, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০, প্রকাশকাল : মার্চ ২০০১, পৃ:১০৬

www.pathagar.com

লোকউৎসব

এদেশে বারো মাসে তের পার্বণ লেগেই আছে। মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, মিলাদুন্নবী, মহররম (আশুরা), শবেবরাত ইত্যাদি। হিন্দুদের তো পূজাপার্বণের অন্ত নেই। তাদের প্রধান উৎসব দূর্গাপূজা, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, ভাইফোঁটা, সরস্বতী পূজা, চড়কপূজা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি। এছাড়া নববর্ষ, নবান্ন, পৌষ সংক্রান্তি সব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। কোনো শুভ কাজ শুরু করার আগে এবং কোনো সুসংবাদ পেলে মুসলমানদের মধ্যে মিলাদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। লক্ষণীয় ঈদ, দূর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা পরস্পরের বাড়িতে সৌজন্য সাক্ষাতে যায়, আমন্ত্রিতও হয়। এছাড়া বিয়ে, আকিকা, খতনা, জন্মদিন, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষে সকল সম্প্রদায়ের লোককেই আমন্ত্রণ জানানো হয়। ধর্ম এখানে কোনো বাধা নয়। সবেবরাতের রুটি হালুয়া বা রুটি মাংস খাওয়া, বাদ্যযন্ত্রের সাথে মহররমের লাঠি খেলা বা তাজিয়া মিছিল এসবকে এখন আর ধর্মীয় উৎসব বা অনুষ্ঠান মনে হয় না। এগুলো আমাদের লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নববর্ষ উপলক্ষে পাখি শিকার, মাছ শিকার, বনভোজন, পিচকারী দিয়ে রং খেলা, নিমপাতা, তিতারি শাক ইত্যাদি তিক্ত ভাজা খাওয়া, পান্তা ভাত খাওয়া সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক আচার।

মুসলমানদের বিয়ের অনুষ্ঠানে কাজী বা মৌলভি সাহেব, উকিল, সাক্ষীর মাধ্যমে বর ও কনের সম্মতি আদায় করে দোয়া–কালাম পড়ে বিয়ে পড়ায়। হিন্দুদের বিয়েতে পুরোহিত বৈদিক মন্ত্র পাঠ করে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে। বিয়ে পড়ানো এবং আনুষ্ঠানিক কিছু পদ্ধতি ছাড়া অন্যান্য আচার অনুষ্ঠানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। বিয়ের ২/৩ দিন আগে থেকে শুরু হয়ে যায় 'গায়ে হলুদ' অনুষ্ঠান। বর কনে উভয় পক্ষের মেয়েরা যায় উভয়ের বাড়িতে হলুদ মাখানোর জন্য। কাপড়-চোপড়, প্রসাধনী, পান-সুপারি, মিষ্টি, হলুদ, মেহেদি ইত্যাদি দিয়ে হলুদের ডালা সাজিয়ে পাঠানোর রীতি প্রচলিত আছে। এ ধরনের রীতি আগেও ছিল, তবে এখন এর আধুনিকায়ন হয়েছে। হলুদ বাটা হয় ছাম গাহিনে। ৩, ৫ বা ৭ জন (বেজোড় সংখ্যা) মহিলা এক সাথে একটি গাহিনে হাত দিয়ে হলুদ বাটা শুরু করে। বর ও কনেকে হলুদ মাখানো হয়, মিষ্টি খাওয়ানো হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভ্যাগত মহিলা অতিথিদেরও হলুদ মাখানো হয়, মহিলারা নিজেদের মধ্যেও হলুদ মাখামাখি করে। এমনকি কোনো কোনো সময় রং খেলা পর্যন্ত গড়ায়। 'গায়ে হলুদ' অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদেরকে সাধ্যানুযায়ী আপ্যায়ন করা হয়। কোথাও কোথাও হলুদ দেওয়ার অনুষ্ঠানে বর ও কনের দ্বারা কালাই ভাঙ্গানো হয়। এ কাজে ঠাকুরীকালাই (মাসকালাই) ব্যবহার করা হয়। অনুষ্ঠান চলাকালে মহিলারা গলা ধরাধরি করে গীত (বিয়ের গান) গায়।

www.pathagar.com

বিয়ের নির্দিষ্ট দিনে বরযাত্রীসহ বর আসে কনের বাড়িতে। বরযাত্রীর মধ্যে মহিলারাও থাকেন। তাদেরকে বলা হয় 'মহুলানী'। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পর বরযাত্রীকে আপ্যায়ন করা হয় সাধ্যানুযায়ী। বর ও তার বন্ধু-বান্ধবকে 'খইঞ্চা' খাওয়ানো হয়। খইঞ্চা হলো- একটা বিরাটাকার থালা বা ওই জাতীয় পাত্রে বরসহ ৮/১০ জনের এক সাথে খাবার পরিবেশন করা হয়। তাতে কিছু স্পেশাল আইটেমও থাকে। পরিবেশন করে শ্যালিকা ও ভাবীরা। সব আনুষ্ঠিকতা শেষে কনে বিদায়ের পালা। বর কনেকে এক সাথে বসানো হয়। কনের পিতা বা অভিভাবক অথবা মুরুব্বিদের কেউ বরের হাতের উপর কনের হাত রেখে বরের কাছে কনেকে সমর্পণ করেন। তারপরে কনেকে নিয়ে তোলা হয় গাড়িতে। এ সময় করুণ ও মর্মস্পর্শী দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। কনের বাবা-মা থেকে শুরু করে সব আত্মীয়–স্বজন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। কনের সাথে ছোটো বোন, স্থানীয় কেউ অথবা বয়স্কা মহিলা কাউকে পাঠানো হয় সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পরিবেশে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। এই মেয়ে বা মহিলাকে বলা হয় 'নুহানী' বা 'দানীবুড়ি'। বরযাত্রীর বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হতো পালকী এবং গরু বা মহিষের গাড়ি। এখন সেই স্থান দখল করে নিয়েছে কার, মিনিবাস, মাইক্রোবাস, টেম্পু ও রিক্সা ভ্যান। কনেকে সাথে নিয়ে বর বাড়িতে পৌঁছালে মা, চাচী, খালারা জ্বলন্ত মাটির প্রদীপ, ধান, দুর্বা ইত্যাদি মঙ্গল উপাচার দিয়ে সাজানো কুলার সাহায্যে কনেকে বরণ করে নেন। এ সময় তালের বা বাঁশের পাখা দিয়ে বর কনের উপর পানি ছিটানো হয়। ঘরে প্রবেশ করার পর মিষ্টিমুখ করানো হয়।

বিয়ের পরদিন বা ২/১ দিন পর বরপক্ষ বৌ-ভাত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। পূর্বে মুসলমানদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানকে বলা হতো 'অলিমা' বা 'ওয়ালিমা'। আজকাল হিন্দু মুসলমান সবাই 'বৌ-ভাত'ই বলে। আত্মীয় স্বজনসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত করা হয়। অতিথিরা উপহার সামগ্রী নিয়ে আসেন দাওয়াত পালন করতে। বিবাহ পরবর্তী আরও বেশ কিছু অনুষ্ঠান বা আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে। যেমন- বাসি বিয়ে, আঠোরা, ফিরানী, ভাদরকাটানী, স্বাদ খাওয়ানো ইত্যাদি। বাসর রাতের পরদিন ঠাট্টাস্থানীয় মহিলারা বর কনেকে গোসল করায়। গোসল করার আগে বর কনেকে কাদা মাখায়, নিজেরাও মাখে। বরকে দিয়ে কনের চুলের বেণি খোলায় তারপর গোসল করায়। কোথাও কোথাও গোসলের আগে বর কনেকে দিয়ে ধান মাড়াই করা হতো। কনে বিদায়ের আট দিন পর বা অষ্টম দিনে কনেকে নিয়ে আসার জন্য ক্ষীর, মুড়ি, মিষ্টি ইত্যাদিসহ লোক পাঠানো হতো কনের শ্বশুর বাড়িতে। এটাকে বলা হয় 'আঠোরা'। কনে বাপের বাড়ি চলে আসার সময় বরও সাথে আসতো। কনে বাপের বাড়ি আসার আট দিন পর আবার শ্বশুর বাড়ি থেকে আত্মীয় স্বজন এসে কনেকে নিয়ে যেতো। এটা হলো ফিরানী। বিয়ের পর প্রথম ভাদ্র মাসে নববিবাহিত দম্পত্তির পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ ও মেলামেশা নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হতো। এ জন্য কনের বাপের বাড়ির লোকজন ভাদ্র মাস শুরু হওয়ার দু-একদিন আগেই মেয়েকে নিয়ে আসতো। পুরো ভাদ্র মাসটা বর তার শ্বশুর বাড়িতে যেতে পারতো না। কিন্তু এসব রীতি বা রেওয়াজ সেভাবে এখন আর পালন করা হয় না। 'আঠোরা' আছে, কিন্তু আট দিনের সময়সীমা আর মানা হয় না। ফিরানী নেই বললেই চলে, থাকলেও

আনুষ্ঠানিকতা নেই। ভাদরকাটানী আছে বটে, কিন্তু পুরো ভাদ্র মাস বর কনের সাক্ষাৎ ও মেলামেশা না করার রীতি আর তেমন পালিত হয় না।

বিয়ের সাথে সম্পর্কিত একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন 'ঘটক'। গ্রাম অঞ্চলে ঘটককে 'কাড়োয়া' বা 'কড়ুয়া' বলে। এ ঘটক বা কাড়োয়াদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ছেলে মেয়ের অভিভাবকদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা, ছেলে মেয়ে দেখা, দেনা-পাওনা ঠিক করা, বিয়ের দিন ধার্য করা ইত্যাদি ঘটকের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অবশ্য আজকাল শহর অঞ্চলে এবং অনেক ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলেও উভয় পক্ষের অভিভাবকগণ সরাসরি কথা বলেন। তবুও ঘটকের প্রয়োজন বা গুরুত্ব এখনও কমে যায়নি। আর একটা ব্যাপার উল্লেখ করা প্রয়োজন। গ্রাম ও শহর উভয় সমাজেই পণ বা যৌতুক প্রথা পূর্বের মতো এখনও দুষ্ট ক্ষতের মতো বিরাজ করছে।

মুসলমানদের মৃত্যুর পর কুলখানি, চল্লিশা, তামদারি ইত্যাদি অনুষ্ঠানে মৃতের জন্য দোয়া করা ছাড়াও সাধ্যানুযায়ী খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই রেওয়াজ চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানেও সাধ্যানুসারে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তবে মাছ মাংস বর্জন করা হয়।

উপজেলার প্রধান প্রধান লোকউৎসবের বিবরণ

সংস্কৃতির প্রবাহমান ধারাকে বেগবান ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে লোকউৎসব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক উপজেলায় নিম্নলিখিত লোকউৎসবগুলো পালিত হয় বিভিন্ন সময়।

১. বৈশাখী উৎসব

উৎসব প্রিয় বাঙালির সর্বজনীন অসাম্প্রদায়িক উৎসবের অন্য নাম বৈশাখী উৎসব। বৈশাখী উৎসব অন্যান্য উপজেলার থেকে রানীশংকৈলউপজেলায় অনেক বেশি স্থানে এবং অনেক বেশি ঘটা করে উদযাপন করা হয়। রানীশংকৈলউপজেলায় বৈশাখ আগমন উপলক্ষে সবচেয়ে বড়ো বড়ো উৎসব অনুষ্ঠিত হয় রানীশংকৈলকলেজ মাঠে। সাতদিনব্যাপী লোকজ সংস্কৃতির সকল বিষয় মঞ্চে পর্যায়ক্রমে উপস্থাপিত হয়। গম্ভীরা, কবিগান, বিচারগান, সত্যপীরের গান, পল্লীগীতি, ভাওইয়া, বাউল গান, নৃত্য এবং এই সাতদিনে স্থানীয় এবং দূর-দূরান্ত থেকে অনেক উৎসাহী ও কৌতূহলী মানুষের সমাগম ঘটে। উৎসব উপলক্ষে, নাগরদোলা, চড়কি, বন্দুক দিয়ে বেলুন ফোটানো, মেলায় আগত ছেলে-মেয়েদের প্রিয় উপভোগ্য খেলা।

গৃহিণীদের জন্য মৃৎশিল্পীদের তৈরি বিভিন্ন রকম আকর্ষণীয় ঘরে সাজিয়ে রাখার সামগ্রী। একইভাবে দারুশিল্পীদের তৈরিকৃত কারুকাজ করা জিনিসপত্র। ওয়ালমেট, ফুলদানি, মহিলা বা গৃহিণীদের রকমারি চুড়ি, কানের দুল, গলার মালা। বিশেষ করে রানীশংকৈলউপজেলায় বৈশাখী উৎসব উপলক্ষে কয়েক স্থানে মেলা বসতো। এ রকম আরও একটি উল্লেখযোগ্য স্থান হলো বিরাশিহাট। এই মেলা এ এলাকার মানুষের

www.pathagar.com

কাছে কত বিচিত্রভাবে আলোড়িত করতো তার নমুনা পাওয়া যায় স্থানীয় চারণ কবি আব্দুল মালেকের রচনায় ও সুরেলা শিল্পী মাইকেলের কণ্ঠে।

ওরে বৈশাখী
কি যাদু করিলা
সাঁঝের বেলা তোর আঙ্গিনায়
করে করে আসি ॥
চৈত্র শেষে দিনগুলো
কখন জানি আসবে শুনি
বাজিয়ে মাদল ছড়িয়ে ঝিলিক
হাওয়ার কাপুনি ॥
সাজিয়েছি তোর বাসর ঘর
কি অপরূপ মনোহারে
রকমারি ঝাল দিয়ে
তোর বিছানা পাতি ॥
নানা রকম দোকান দিয়ে
বসছে আজব মেলা
ফুচকা, পুড়ি, মিষ্টির দোকান
নাগর দোলার খেলা ॥
রংবাহারি রঙের মেলায়
লাল-নীলের নানান খেলা যে
৮২ বাজারে বসেছে
মেলা বৈশাখী।

গৃহস্থালীর জন্য, বাচ্চার স্কুল ব্যাগ, ভ্রমণের ব্যাগ, শীতের কম্বল সবকিছুই এই বৈশাখী উৎসবের আঙ্গিনায় পাওয়া যায়।

রানীশংকৈলকলেজ মাঠে বৈশাখী মেলা ছাড়াও ঠাকুরগাঁও জেলার প্রত্যেক উপজেলায় আরও কয়েকটি স্থানে কখনও ১ দিনের বা ২ দিনের মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

লেহেম্বা ইউনিয়নের বিরাশিহাটে, জওগা স্কুল মাঠে, মল্লারা স্কুল মাঠে এবং নেকমরদ কলেজ মাঠে বৈশাখী উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে। বলা যেতে পারে বৈশাখী উৎসবের আয়োজন রানীশংকৈলউপজেলায় বেশি স্থানে হয়ে থাকে। বৈশাখী মেলার আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ উপজেলায় মানুষের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবকে বেশি করে প্রকাশ করে থাকে।

২. নবান্ন

কৃষি ও কৃষকের জীবনে নবান্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং দীর্ঘ দিনের আচরিত বিষয়। নতুন ধানে হবে নবান্ন। জেলায় নবান্ন উপলক্ষে নবান্ন অনুষ্ঠান ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ঘটা করে মাঠে বা বাইরে অনুষ্ঠিত হয় না। তবে হিন্দু সম্প্রদায় তো বটেই

www.pathagar.com

মুসলমানদের ঘরেও নতুন ধানের অন্ন খাবার আগে পায়েস তৈরির রেওয়াজ প্রচলিত আছে। স্থানীয় চারণ কবি আব্দুল মালেকের গীতে তার উল্লেখ পাওয়া যায় :

" তুমি যখন বিয়ার সাজে
আমি তখন কেয়া কোচে
তোমায় আশীর্বাদ করে যেতে পারলাম না
বুকের পাথর বন্ধিয়া
সব কিছু ভুলিয়া ঢাকার উদ্দেশ্যে
হইলাম রওনা ॥
আসনে বসিয়া চোখের জল মুছিয়া
কত কথাই মনে যায় পড়িয়া
বৈশেখের ঝড়ের দিনে
আমি তো আম বাগানে
ভিজিয়া হইতাম সারা দুইজন ॥
পাড়ায় কারো বিয়ে হইলে
আসিতো আমার ঘরে
কাটাইতাম সারারাত গল্প করিয়া
নবান্নের উৎসবের আসিতো পিঠা নিয়ে
খাইতাম পিঠা বসে দুইজনা ॥

এই গানের কথা যখন বিরাশি হাটের তথা এলাকার জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী মাইকেলের দরদি কণ্ঠে পরিবেশিত হতো তখন উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী তলয় হয়ে যেতো।

৩. ওরস

রানীশংকৈল উপজেলার নেকমরদ-এ শাহসূফি নাজির উদ্দিনকে ঘিরে এখানে প্রতি বছর বৈশাখের ১ ও ২ তারিখের খুব বড়ো ধরনের ওরসের আয়োজন হয়ে থাকে। স্থানীয় মাজার কেন্দ্রিক কমিটির ব্যবস্থাপনায় প্রচুর খরচের মাধ্যমে অনেক লোক সমাগমে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, এই ওরসে হিন্দু-মুসলমান সকলে অংশগ্রহণ করে থাকে। দুইদিনব্যাপী আলোচনা খাওয়া-দাওয়া খুবই জাকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। ১২ জানুয়ারীতে কচোল (Bopi) কাছে বুড়া পীরের ওরস। ১২ রবিউল আওয়াল প্রতি বছর ঘটা করে ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

৪. আশুরা

রানীশংকৈল উপজেলায় ঐতিহাসিক মহররমের ১০ তারিখে আশুরা অনুষ্ঠিত হয়। রানীশংকৈল উপজেলার সন্নিকটে করবুলাডাঙ্গীতে দিনব্যাপী লাঠিখেলা, ঘোড়া সাজিয়ে এক ধরনের মতিমেয় আয়োজন হয়ে থাকে। জায়গাটি ঐ অনেক আগে থেকেই

www.pathagar.com

করবুলাডাঙ্গী নামে পরিচিত অর্থাৎ কারবালার মতিম হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে, এ জন্য কিনা জানা যায় না, তবে প্রতি বছর ১০ মহররম শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন এ ধরনের কৃত্রিম যুদ্ধের আয়োজন করে থাকে। এতে প্রচুর লোকের সমাগম ঘটে।

৫. রথযাত্রা

কার্তিকের পূর্ণিমায় রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। রানীশংকৈল উপজেলার খুব ঘটা করে রথযাত্রা উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কাতিহার শ্যামরাই মন্দিরে এতদ্বঞ্চল হিন্দু অধ্যুষিত হওয়ায় প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষের আগমন ঘটায় যানবাহন থেকে শুরু করে সব কিছু মিলিয়ে এক বড়ো ধরনের জনস্রোতের সৃষ্টি হয়। ফলে এলাকাটি মহোৎসবে পরিণত হয়। প্রতি বছর নির্দিষ্ট তারিখে এই আয়োজন হয়ে আসছে। আয়োজক শ্যামরাই মন্দির কমিটি, কাতিহার, রানীশংকৈল।

www.pathagar.com

লোকমেলা

১. নেকমরদ মেলা

উত্তরবঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ মেলা হয় নেকমরদে। এটি ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলা থেকে প্রায় নয় কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। এলাকাটির মূল নাম ভবানন্দপুর। আজও নেকমরদকে মৌজা হিসেবে ভবানন্দপুর লেখা হয়। সম্ভবত ১২ শতকের শেষভাগে অথবা ১৩ শতকের শুরুতে এ অঞ্চলে সুফি সাধক সৈয়দ নাসির উদ্দিন আউলিয়া নামে একজন পীরের আগমন ঘটে। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার করার পর তিনি স্থায়ীভাবে খানকাহ স্থাপন করেন ভবানন্দপুর গ্রামে। আর এখান থেকেই তিনি এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর সৎ স্বভাব, চারিত্রিক মাধুর্য এবং ধর্মপরায়ণতায় মুগ্ধ হয়ে মুরিদরা তাঁকে 'নেকবাবা' নামে অভিহিত করেন। তাঁর প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ভবানন্দপুর গ্রামের নামকরণ করা হয় নেকমরদ। বর্তমানে এলাকাটি নেকমরদ নামেই পরিচিত। এমনও জনশ্রুতি আছে, পীর শাহ্ নেকমরদ পানির উপর দিয়ে খড়ম পায়ে হাটতেন। নেকমরদবাসী পীর শাহ্-এর পূণ্য স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতে প্রতি বছর পৌষ মাসে পবিত্র ওরস উদ্যাপন ও বার্ষিক মেলার প্রবর্তন করে। এই মেলাই হচ্ছে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত নেকমরদ মেলা। পুরো একমাস মেলাটি স্থায়ী থাকে। বর্তমানে মেলাটি প্রায় তিন কিলোমিটার জুড়ে অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ আমলেও মেলাটি অব্যাহত ছিল এবং সমৃদ্ধিও ছিল। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত মেজর শের উইলের ভূমি নকশায় মেলাটির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। মেলাটি কিরূপ প্রসিদ্ধ ছিল, দূর দেশ থেকে কত অগণিত মানুষের সমাগম হতো, কিরূপ দুস্প্রাপ্য মূল্যবান দ্রব্যাদি বেচা-কেনার আকর্ষণীয় কেন্দ্র ছিল এবং মেলাটি ঐতিহ্যগতভাবে কিরূপ জাকজমকভাবে উৎযাপিত হতো- নিম্নোক্ত বিবরণ থেকেই কিছুটা উপলব্ধি করা যেতে পারে।

পূর্ণিয়া ও পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে এই মেলায় গরু, মহিষ ও ভেড়া আসতো। ময়মনসিংহ, সিলেট ও যমুনা নদীর পারের অঞ্চল থেকে আসতো ঘোড়া, মহিষ ও উট। ভারতের আসাম ও দার্জিলিং এর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসতো হাতি। আর সেই হাতি ক্রয় করতেন স্থানীয় বিত্তশালী জমিদারগণ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীর থেকে মোগল পাঠান বংশীয় সওদাগরেরা শুকনা ফল ও কারুকার্য খচিত ঘোড়ার জিন, ধারালো ছোরা, তীক্ষ্ণ ধারালো তরবারী, স্ফটিক আয়না ইত্যাদি বহুবিলাস দ্রব্য উটের পিঠে করে মেলায় নিয়ে আসতো। শিখেরা আনতো হাতির দাঁত, চন্দন, কাঠের চিরুনি, গলার মালা ইত্যাদি। পাহাড়ীয়াগণ আনতো কজ্জল, মৃগনাভি, গরম বস্ত্র, বাদাম, পনির ও চামরী গাভীর লেজ । নেপালীরা আনতো কুক্কুরী ও চিরতা

www.pathagar.com

পাতা। দিনাজপুরের ব্যবসায়িরা বিক্রয় করতো কৃত্রিম মুক্তার মালা, কার্পাস, চট, রেশমী কাপড়, পাট বস্ত্র, রকমারী ব্যবহারজাত দ্রব্য ও টাঙ্গন ঘোড়া। গরু, মহিষ বাদেও মেলার প্রধান বেচা-কেনার দ্রব্য ছিল উট, দুম্বা ও ঘোড়া। তেজস্বী টাঙ্গন ঘোড়া ছিল এই মেলার সর্বব্যাপী খ্যাতি ও আকর্ষণ। দূর-দূরান্তের সৌখিন ঘোড়া সওয়ারগণ ও ঘোড়াপ্রিয় জমিদার-জোতদারগণ স্বয়ং এই ঘোড়া ক্রয় করার জন্য আগমন করতেন মেলায়। অতীতকালে মেলার স্থানটি বহু দূরে বিস্তৃত ছিল। প্রায় দশ বর্গমাইল স্থান জুড়ে এই মেলা বসতো। মেলায় পানি সরবরাহের মিমিত্ত ছিল প্রায় পাঁচশত গভীর ইন্দিরা। শাহ্ নেকমরদ (রঃ) এর মতো ধর্মনিষ্ঠ আউলিয়া যেন আজীবন নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রচার ও মুসলমানদের সেবা করতে পারেন এবং উত্তরোত্তর মুসলিম সমাজের উন্নতি সাধিত হয় তজ্জন্য বাদশাহ আলমগীর আওরঙ্গজেব তাজপুর সরকারের অধীনে বহু পীরত্তোর সম্পত্তি উক্ত আস্তানার জন্য দান করেন। মেলাটিও ছিল উক্ত ওয়াকফের অন্তর্গত। পীরের মৃত্যুর পরে ওয়াকফের নীতিমালা অনুসারে সম্পত্তির আয় আস্তানার যাবতীয় খরচাদি নির্বাহিত হতো। ওয়াকফ সম্পত্তির পরিমাণ ছিল আনুমানিক সাতশত বিঘা। মতান্তরে তিনশত বিঘা। পীরের মর্যাদা ও মহিমার কারণেই মেলাটির খ্যাতি সর্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। বৈষয়িক কারণ ছাড়াও আধ্যাত্মিক আকর্ষণে মেলায় অগণিত লোকের সমাগম হতো। সমসাময়িক উত্তরবঙ্গের আর কোনো মেলায় এত বেশি সংখ্যক লোকের সমাগম হওয়ার প্রমাণ নেই। বৈষয়িকতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটে। এই পীরের মেলায়। বর্তমানে এই মেলা দীর্ঘ একমাস মানুষের মনে আনন্দ দেয় এবং এলাকাবাসীর কাছে বিশেষ উৎসব। মেলাতে বর্তমানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নিয়মিত যাত্রাপালা ও বিভিন্ন সার্কাসসহ চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকারা আসেন। এখনো মেলাতে বিভিন্ন খেলনা, কাপড়, আসবাবপত্র, খাবার হোটেলসহ হরেক রকমের দোকান বসে এবং সারা দিন-রাত দোকানগুলো খোলা থাকে। আশপাশের এলাকার সকলেই এই মেলায় গিয়ে সারা বছরের মেলার পিপাসা মিটিয়ে থাকেন।

২. রুহিয়া আজাদ মেলা

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার রুহিয়া নামক স্থানে এই মেলা বসে। এক মাস ব্যাপী এই মেলা ১৯৬০ সাল থেকে হয়ে আসছে। তার আগে এই মেলাটি রুহিয়াতে হতো না। এই মেলা হতো বর্ডারের কাছাকাছি, তখন এই মেলার নাম ছিল আলুয়া খোয়ার মেলা। তখন সবাই এই মেলাতে অংশ গ্রহণ করতে পারতো না। তারপর রুহিয়ার চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ মেলাটি রুহিয়াতে নিয়ে আসেন। আবার অনেকে বলেন নূরুল ইসলাম চেয়ারম্যান মেলাটির প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন। তবে যার তত্ত্বাবধানেই মেলাটি রুহিয়াতে হোক না কেন এখানে স্থানান্তরের পর সবাই এই মেলাতে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাই এই মেলার নাম দেওয়া হয় রুহিয়া আজাদ মেলা। 'আজাদ' শব্দের অর্থ স্বাধীন বা মুক্তি। প্রতিবছর কার্তিক মাসের অমাবস্যার পরে যে মাসে পূর্ণিমা হয় তখন থেকেই

www.pathagar.com

মেলা শুরু হয়ে এক মাস চলতে থাকে। মেলা উপলক্ষ্যে এখানে কোনো পূজা হয় না। মেলাটি বর্তমানে পরিচালিত হয় মেলা কমিটি দ্বারা এবং সভাপতিত্ব করেন ডিসি সাহেব। এই মেলা থেকে যে চাঁদা বা খাজনা আদায় হয় তার অনেকটাই ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। এই মেলাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়াও গরু, মহিষ, হাঁস-মুরগি, ছাগল, কাঠের ফার্নিচার প্রভৃতি জিনিস পাওয়া যায়। এছাড়াও মানুষের চিত্তবিনোদনের জন্য যাত্রা, সার্কাস, ম্যাজিক শো, পুতুল নাচ, মোটরসাইকেল খেলা ইত্যাদি নানা প্রকার বিনোদনের ব্যবস্থা থাকে মেলায়। এই মেলার সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী খাবার হচ্ছে রসগোল্লা। আর মেলাটির সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য এখানে প্রচুর পরিমাণে গরু মহিষ বিক্রি হয়। এই মেলাতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ আসে। এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যেমন ইসলামপুর, শিলিগুড়ি, মুম্বাই ইত্যাদি অঞ্চল থেকে মানুষ আসে মেলায়।

৩. রুহিয়া বৈশাখী মেলা

বৈশাখ বাংলা বছরের প্রথম মাস। বৈশাখ ষড় ঋতুর প্রথম ঋতু গ্রীষ্মের প্রথম মাস। বৈশাখের প্রথম দিন থেকে বাঙালির নতুন বছরের শুরু। তাই নতুন বছর শুরুর আনন্দে বাঙালি অনেক কর্মকাণ্ড করে আর এই কর্মকাণ্ড আরো বেশি আনন্দ ঘন হয় যখন এর সাথে যুক্ত হয় বৈশাখী মেলা। ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার রুহিয়া বাজারের ডাক বাংলা মাঠে এই মেলার আয়োজন করা হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে মেলাটি এই মাঠে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ছাত্র এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে এই মেলার আয়োজন করা হয়। মেলা চলে প্রায় ৭ দিন। মেলা চলাকালীন এই সাত দিন মঞ্চে নানা রকম বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয় মেলা কমিটির পক্ষ থেকে। যেমন- কবি গান, জারি গান, নাটক, সারি গান, বাউল গান, স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশনায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। এই মেলাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়াও বড়ো খাবার হোটেল, মিষ্টির দোকান, কাপড় চোপড়ের দোকান, কসমেটিকসের দোকান আসে। বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে থাকে পুতুল নাচ, মোটরসাইকেল খেলা, ম্যাজিক শো, সাপের খেলা, নাগর দোলা ইত্যাদি। এই মেলা গান বাজনার জন্য বেশ পরিচিত। এই মেলাতে মহিলা পুরুষ প্রায় সমানভাবে অংশগ্রহণ করে। মেলাটি প্রতিদিন প্রায় সকাল ১০টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত চলে। মেলাতে স্থানীয় লোকজন ছাড়াও এলাকার আত্মীয়-স্বজন সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে।

৪. ধর্মপুর চড়ক পূজার মেলা

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ধর্মপুর নামক গ্রামে চৈত্র মাসে চড়ক পূজা উপলক্ষ্যে মেলা বসে। মেলাটি ব্রিটিশ আমল থেকে হয়ে আসছিল বলে এলাকাবাসীরা জানান। আবার ধর্মপুর গ্রামের এক বয়োজ্যেষ্ঠ লোক শৌদ্ধু বর্মন বলেন, 'মেলা কতদিন আগেত থ্যাকা হবার নাকছে, হামাদের বাপমাও কবার পাউ না'। তবে মেলাটি যে বেশ পুরোনো তা বোঝা যায় শিব মন্দিরটি দেখে। কারণ সেখানে যে গাছ বা মন্দিরে যে শিব লিঙ্গ আছে তা দেখে বোঝা যায়। মেলাটি চৈত্র মাসে হলেও চৈত্র সংক্রান্তিতে হয় না, মেলা হয়

সংক্রান্তির ১০ দিন পর। চৈত্র সংক্রান্তিতে মরার মাথা তোলা হয়। তারপর তা মন্দিরে সংরক্ষণ করা হয়। চড়ক পূজা যে দিন থেকে শুরু হয় তার ১০ দিনের শেষ দিন হয় মেলা। পূজার সময় মন্দিরে কালীর উদ্দেশ্যে পাঠা ও কবুতর বলি হয়। যারা কালীর কাছে মানত করে তাঁরাই এই পাঠা বা কবুতর দিয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ তার বাসনাপূর্ণ হলে ১০ দিন পূজা দিবে বলেও মানত করে। আর মন্দিরে যে মরার মাথা রাখা হয় তাও কালীর ভোগ হিসেবে ব্যবহার হয়। অনেক সময় এই মরার মাথাগুলো দিয়ে কালীর মুখোশ পড়ে কালী নৃত্য করা হয়। শেষের দিন চড়ক উপলক্ষ্যে মেলা হয়। মেলাটি একদিনের হলেও নানা ধরনের জিনিস এই মেলায় পাওয়া যায়। যেমন- মিষ্টান্ন, মাটির খেলনা, মাটির পুতুল, কসমেটিকস্, স্থানীয় লোকশিল্পীদের হাতে তৈরি বাচ্চাদের খেলা ও বিনোদনের জন্য নানা জিনিসপত্র ইত্যাদি। এই মেলার প্রধান আকর্ষণ চড়ক। তাই দলে দলে মানুষ মেলা এবং চড়ক দেখার জন্য আশেপাশের গ্রাম থেকে ছুটে আসে। মেলাটি ধর্মপুর মেলা কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং কমিটির বর্তমান প্রধান হলেন শ্রী প্রবীণ চন্দ্র বর্মন।

৫. লাহিড়ী দুর্গা পূজার মেলা

চিরন্তন বাঙালিয়ানার শারদীয় উৎসব প্রতিবছর আসে আমাদের জীবনে। তখন শরতের আকাশে পূজোর ঢাকের গুড়গুড় শব্দ, মন্দিরে মন্দিরে যেথা সেথা গ্রামে গ্রামে পূজা দিয়ে ফেরা, এমন চালচিত্র প্রায় সারা বাংলাদেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দেখা যায়। এই পাঁচ দিনের শারদীয় উৎসবে কোথাও কোথাও পাঁচ দিনেই, কোথাও তিন দিন, কোথাও আবার এক দিন মেলা হয়। তবে বেশির ভাগ জায়গাতেই এক দিন মেলা হয়। আর তা হয় দশমীর দিন। এই দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার লাহিড়ী বাজারে দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে মেলা বসে। মেলাটি সার্বজনীন পূজা কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। মেলা কমিটির এক সদস্যের কাছ থেকে জানা গেল মেলাটি ৫০-৬০ বছর ধরে চলছে। মেলাটি প্রথম শুরু করেন ভবানী বাবু জমিদার। এই মেলাতে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি পাওয়া যায়। এছাড়াও মেলাতে কসমেটিকস, বিভিন্ন ধরনের খাবার, মাটির পুতুল, বাঁশি, বেলুন, নাগর দোলা, বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরনের খেলনা ইত্যাদি পাওয়া যায়। এক দিনের এই মেলাতে আশপাশের এলাকা যেমন- বালিয়াডাঙ্গী, পাড়িয়া, চারল, ধোনতলা, ঠাকুরগাঁও সদর থানা প্রভৃতি এলাকা থেকে মানুষ আসে।

www.pathagar.com

লোকাচার

ব্রত পার্বণ

ব্রত পালন বাঙালিদের বহু প্রাচীন সংস্কৃতি। সংসারের মঙ্গল কামনায় ব্রত পালন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ব্রত পালনের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের উপলক্ষ্য আলাদা আলাদা হলেও উদ্দেশ্য সংসার-সন্তানের মঙ্গল কামনা। ব্রত হচ্ছে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের নিমিত্তে ব্যাক্তিগত সংকল্পের সাথে দেবতা বা ঈশ্বরের কাছে মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় দৈনন্দিন উপহারসহ যে আচরণ তাই ব্রত। এরূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, রাধাষ্ঠমী, রামনবমী, দূর্গাষ্টমী, শিবরাত্রী একাদশ সবচনী ব্রত, তালনবমী।

মুসলমানদের ব্রত : ছেলের পরীক্ষা ও ভালো ফল লাভের আশায় রোজা রাখা। অসুখ থেকে পরিত্রাণের জন্য মানত করা।

আঠুরা বা অস্টমঙ্গল: বিয়ের পরে কনে বাবার বাড়িতে যায়, সাধারণত এই যাওয়াটা হয় আট দিনের। এজন্য মুসলমানেরা বলে আঠুরা আর হিন্দুরা বলে অষ্টমঙ্গল। এ অঞ্চলে এ রীতি প্রচলিত।

ভাদর কাটানি: বিয়ের পরে প্রথম ভাদ্র মাসে নব-বরবধূ একত্রে না থাকাই ভালো। এ মাসে আবহমানকাল ধরে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এই আচার এখনও মেনে চলে।

স্বাদ খাওয়া: নববধূ প্রথম সন্তান সম্ভাবা হলে ৭-৯ মাসের মধ্যে কনের বাবার বাড়ির লোকজন খির-পায়েস মিষ্টি নিয়ে কনের শ্বশুর বাড়িতে যায় এবং কনেকে বাবার বাড়িতে নিয়ে আসার প্রচলন রয়েছে।

মুখে ভাত খাওয়া বা অন্নপ্রাশন : সন্তানের মুখে প্রথম ভাত তুলে দেওয়া বা অন্ন মুখে দেওয়া অনুষ্ঠান এ অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে।

হালখাতা: কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবছর বিভিন্ন ব্যক্তিকে নগদ অর্থ ছাড়াই যে পণ্য সরবরাহ করা হয়, তাকেই বকেয়া বা বাকি বলে। দোকানদার বা ব্যবসায়ীবৃন্দ তাদের এই সমস্ত বছরের বকেয়া টাকা উসুলের জন্য যে অনুষ্ঠান আয়োজন করে তাকেই হালখাতা অনুষ্ঠান বলে। বাকি গ্রহিতাঁরা যথারীতি উপস্থিত হয়ে দোকানদারের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ভুরি-ভোজ শেষে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেন। দোকানদার লাল কালিতে নাম কেটে দিয়ে নতুন খাতায় নাম জারি করে।

খতনা অনুষ্ঠান: মুসলমানি সরানুসারে নির্দিষ্ট সময়ে লিঙ্গঁঅগ্র কর্তনের অনুষ্ঠানকে খতনা অনুষ্ঠান বলে। অঞ্চল ভিত্তিক ওস্তাদ মুসলমানি অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। প্রথমে শিশু পুত্রকে একটি কাঁঠের পিড়িতে ওস্তাদ এবং শিশু মুখোমুখি বসিয়ে অন্য একজন বয়সী এবং সাহসী ব্যাক্তি উক্ত শিশুপুত্রের চোখে পান দিয়ে বন্ধ করে ধরে আর একজন

www.pathagar.com

বয়সী ব্যক্তি শিশুপুত্রের হাত এক পা শক্তভাবে ধরে থাকে অতঃপর ওস্তাদ তার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেন।

নাক ফুরানিঃ কন্যা সন্তানের বয়স প্রাপ্তির সাথে সাথে এই অঞ্চলে নাক ফুরানি প্রচলন রয়েছে। গ্রামের কোনো অভিজ্ঞ বয়সী মহিলা দ্বারা নাক ফুরানি কাজটি সম্পন্ন করা হয়। একজন রমনীর জন্য তার প্রথম বয়সেই এই অনুষ্ঠানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান : বিয়ের দুই/একদিন আগেই গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বরকনের উভয় পক্ষের আত্মীয়রা কখনো কখনো উভয়ের বাড়িতে হলুদের ডালা সাজিয়ে সঙ্গে মিষ্টি নিয়ে হাজির হয়।

অলিমা অনুষ্ঠানঃ বিয়ের পর দিন বা ২/১ দিন পর বরপক্ষ বৌ-ভাত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। পূর্বে মুসলমানদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানকে বলা হতো 'অলিমা' বা ওয়ালিমা। ধনী-গরিব নির্বিশেষে এ অঞ্চলে এ ধরনের অনুষ্ঠান করে থাকে।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

কথায় আছে "শোকের চেয়ে ভোক বড়ো"। অর্থাৎ ক্ষুধা একটি প্রবৃত্তি। আদিম প্রবৃত্তি হওয়ায় ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যগ্রতা যেমন আছে অনুরূপভাবে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য যে ব্যাঞ্জন তাকে রসালো করে খাবার স্পৃহাও তার আধুনিক মানষিকতার প্রকাশ। সময়ের পরিবর্তনে ব্যাঞ্জনের রসনায়, পরিবেশনায় ও পরিবর্তনের ছোয়া আসলেও স্ব-স্ব এলাকার ঐতিহ্যিক বৈশিষ্ট্য এখনও বর্তমান।

প্রবাদ মতে, ডালের মধ্যে ঠাকুরী, মাছের মধ্যে মাগুরী, আর আত্মীয়ের মধ্যে শ্বাশুড়ি। এই জেলার অন্তর্গত ভেলাতৈড় ভদ্রপাড়া গ্রামের অধিক ফলনযোগ্য শীতকালের সবজি বেগুন লক্ষণীয় যা দেশের প্রায় সর্বত্র বিক্রয় হয়। শাক-এর মধ্যে লাফা, ভর্তার মধ্যে সিঁদল, শাটি মাছের ভর্তা, চেং (টাকি মাছ) মাছের ভর্তা, আলুর ভর্তা, বেগুন ভর্তা। বর্তমানে এ অঞ্চলের জনপ্রিয় ও প্রচলিত শাকসবজিগুলো হলো- বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঝিঙা, চিচিঙ্গা, কাকরোল, পটল, করলা, সজনে ডাটা, আলু, সশা, কচুর মুখি, মানকচু, পানিকচু, ওল, মুলা, মাচআলু (জংলি আলু), এচোড়, বাঁশের ডগা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শীম, বরবটি, কলার থোর, কলার মোচা, ইত্যাদি। আবার কালো কচুশাক, ঢেকিশাক, নাফাশাক, পাটশাক, বাবরশাক, চিরাপাটা শাক, বথুয়া শাক, খাড়ি শাক, লাউশাক, মিষ্টিকুমড়া শাক, হেলেঞ্চা শাক, মটর শাক, খেসারি শাক, কলমি শাক ইত্যাদি। মাশকালাই, অরহড়, মুশুর, মুগ, খেসারি, ছোলাবুট ইত্যাদি। তবে শাকের মধ্যে পাটশাক ও বথুয়া শাকের প্রচলন এ অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকেই। এছাড়া 'চাল ভাজা', ভাজা চালের 'ছাতু' এবং 'খরকরা ভাত' খাওয়ার প্রচলন ছিল। সরিষার তেল এবং মহিষের ঘি ছিল এ জনপদের প্রিয় খাদ্য। এখানে লবণ সহজ লভ্য ছিল না বলে বিকল্প হিসেবে মানুষ ব্যবহার করতেন 'ক্ষার'। দই ও চিড়ার ব্যবহার প্রচলিত ছিল বহুপূর্ব থেকে। ভাতের সঙ্গে মাছ-মাংস ছিল এ অঞ্চলের সবার প্রিয়।

এখানকার প্রত্যেক উপজেলার সকল মুসলিম অধিবাসীরা আত্মীয়কে মসুরের ডাল, ঠাকুরী কলাইয়ের ডাল, বাড়িতে পালিত মুরগি, হিন্দুরা ডিমের তরকারি, পুরুষ হলে মুরগির মাংস নারী এবং বয়সী পুরুষ হলে খাসির মাংস অথবা মাছ পরিবেশন করাই এ এলাকার ঐতিহ্যের মধ্যে পড়ে। ঠাকুরী কালাই (মাশকালাই), শিদল, কুমোরবড়ি ও প্যালকা, শুক্তানি অত্র অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী খাবার যা দেশের অন্য কোনো অঞ্চলে পাওয়া যায় না।

গরমের দিনে বেশির ভাগ মানুষ পান্তা ভাত খায়, শীতের দিনে বাসি ঠাণ্ডা ভাত থাকে স্থানীয় ভাষায় খরকরা ভাত বলে। ভাতের সঙ্গে মাছ-মাংস ছিল এ অঞ্চলের সবার প্রিয়। নিরামিষ ও শাকসবজি জাতীয় খাবারের মধ্যে প্রচলিত ছিল–আম ও জামের থেথ্থেকি, ছ্যাকাদল, বেগুন, লাউ, কুমড়ার ঘোন্ট, কাঁকরোল, কচু ঢেকিয়া শাকের ভাজা, লাফাশাক, পাটাশাক ও খাটা, টমেটো-তেঁতুল-বরই ও কামরাঙ্গার টক, কচুর পাতা পুড়ে পেন্নেত ভর্তা ইত্যাদি। এ অঞ্চলের প্রিয় মাছের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত

www.pathagar.com

রয়েছে- বোয়াল, মিরকা, রুই, কাতলা, শিংগী, কৈ, মাগুর, গচি, শোল, শাটি, শাল, ময়াপুটি (শেরন পুটি), ডারিকা, বাইন ও পঁয়া মাছ। এছাড়াও লোকজন চেং, টনা, ভেদা, বালি, টেপা ও পুটি মাছ খেতে পছন্দ করে। মাংসের মধ্যে গরু, হাঁস, ছাগল, পাঁঠা, ঘুঘু ও কবুতর খুবই পছন্দ করে। মুড়ি ও চিড়ার নাড়ু-মুড়কী, ভাকা, গুড়গুড়িয়া, নুনাস, পানি পিঠা, পাকুয়ান বা তেলুয়া পিঠা প্রভৃতি এখানকার প্রিয় শুকনো খাবার। ফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য–আম, কাঁঠাল, লিচু, কালোজাম, কেসুর, ডাউয়া, বেল, পানিয়াল ইত্যাদি। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে আমের টক, গোয়ালিয়া দই, খাটা দই, পাকা কলা, আম দিয়ে শোল মাছের তরকারি, আম দিয়ে চিড়া-মুড়ি, কাঁঠাল-দুধ, জাম, পেপে লোকমানুষের প্রিয় খাদ্য। তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের শব-ই-বরাত এর রাতে হালুয়া রুটি কিংবা চালের আটার রুটি ও গরুর মাংস উপাদেয় খাদ্য হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়।

শীতের মৌসুমে স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ভাপা পিঠা, গুড়গুরিয়া(ভাপা) পিঠা, তৈল পিঠা, নুন পিঠা, পাকুয়ান খাওয়া আত্মীয়কে আমন্ত্রণ জানানো। নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠানো নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা ঐতিহ্যেরই অংশ। এই সময় বিভিন্ন লোকমেলার আয়োজন করা হয় এই সব লোকমেলায় চিড়া, মুড়ি, খৈ, জিলাপি, খোরমা, নিমকি, লুচি, পায়েস, পরোটা, বুন্দিয়া, সিমাই, ছানার তৈরি বিভিন্ন মিষ্টান্ন, তেলের পিঠা, চিতই পিঠা, ইত্যাদি বিক্রি হয় যা এই জেলার কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত। এই আসরগুলোতে লোকখাবারগুলোর পসরা বসে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মধুমাসে এ অঞ্চলে বিভিন্ন ফলের পসরা বসে। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, তরমুজ, বাঙ্গি ইত্যাদি ফলে পরিপূর্ণ থাকে এই জেলা। আম-কাঁঠাল খাওয়ার জন্য মেয়ে-জামাই আসে এবং তাদের কেন্দ্র করে বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

লোকনাট্য

দাইঘুরা গান

লোকনাট্য বাংলার লোকসংস্কৃতির এক অন্যতম সমৃদ্ধ আঙ্গিক। গ্রামীণ সমাজমূলে রচিত আমাদের সংস্কৃতি আমাদের ঐতিহ্যিক অহংকারও বটে। লোকনাট্যের সে গর্বিত আসরে দাইঘুরা গান উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের প্রান্তীয় ঠাকুরগাঁও জেলার লোকনাট্য বা লোকসংগীতাঙ্গনে যতগুলো সংগীতের সংশ্লিষ্টতা লক্ষ্য করা যায় সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত ও বিশেষত্বে দাইঘুরা গান। ঠাকুরগাঁও জেলার এই লোকসংগীত দাইঘুরা গান অনেকে এটাকে আবার সরীর গানও বলে থাকে। তবে ঠাকুরগাঁও জেলার শিক্ষিত মহলে এই গান 'ধামের গান' বা 'পালাটিয়া গান' নামে পরিচিত। বাংলাদেশে লোকনাট্যের ঐতিহ্য দীর্ঘকালের। লোকনাট্য যে কেবল গ্রামীণ মানুষকে আনন্দ দানের জন্য অভিনীত হতো তা নয়। লোকনাট্য সমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রেও এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছে। লোকনাট্যের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে অবহেলিত নির্যাতিত নিষ্পেষিত মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। যে কোনো বঞ্চনা, নির্যাতন, শোষণ সাধারণ মানুষের উপর অবিচারের প্রতিবাদ লোকনাট্যগুলোর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

দাইঘুরা গানের নামকরণ

দাইঘুরা গানের নামকরণ সম্পর্কে ঠাকুরগাঁও জেলার লোকসমাজে বেশিরভাগই কোনো তথ্য দিতে পারেনি। অনেকেই দাইঘুরা গান বা সরীর গানের নামকরণ সম্পর্কে তথ্য দিতে না পারলেও গুটি কয়েক লোকের কাছে সে বিষয়ে তথ্য পাওয়া গেছে। দাইঘুরা গানের নামকরণ সম্পর্কে লোকসংগীত শিল্পী পীরগঞ্জ উপজেলার উত্তর নোয়াপাড়ার গৌরাঙ্গ সুন্দর রায় বলেন, 'ধান কাটার পর গরু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধানের খেড়ি মাড়ানো হয়। আর এই ধানের খেড়িকে বলা হয় দাই। তাই খেড়ি মাড়ানোর মতো করে ঘুরে ঘুরে এই গান পরিবেশন করা হয় বলেই এর নাম হয়েছে-'দাইঘুরা'।[১] আবার দাইঘুরা গানের আরেক নাম 'সরীর গান' হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'দুধের সরের মতো মধুময় অভিনয়ের কারণে এই গানকে সরীর গানও বলা হয়'।[২] এ গান শরী বা সরী বা সোরী গান হিসেবে পরিচিতি। মূলত নায়ক-নায়িকার নামানুসারে দাইঘুরা গানের পালাগুরোর নামকরণ হয়ে থাকে। দুটো নামের সংযোগ যেমন থাকে তেমনি থাকে সে চরিত্রের মূল প্রবণতার ইঙ্গিত। নায়িকার নামের সাথে শরী বা সরী যুক্ত থাকে আর নায়কের নামের সাথে থাকে সে চরিত্রের স্বরূপ। শরী বা সরী বা সোরী যাই বলি না কেন তার অর্থ হলো নারী। কেউ কেউ ধারণা করেন ঈশ্বরী শব্দটি থেকে শরী শব্দটি এসেছে। এখনও কোনো কোনো অঞ্চলে মেয়েদের নামের সাথে ঈশ্বরী শব্দটি যুক্ত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়; যেমন : জলেশ্বরী, ফুলেশ্বরী, ধলেশ্বরী, ধনেশ্বরী, যজ্ঞেশ্বরী ইত্যাদি। ঈশ্বরীর বিবর্তিত রূপ এখন শরী বা সরী বা

www.pathagar.com

সোরী যা কিনা স্ত্রীবাচক অর্থে ব্যবহৃত। তাই দাইঘুরা গান সমান্তরালে সরী হিসেবেও পরিচিত। আরেকটি বিষয় স্পষ্ট 'সরী' শব্দটি সবসময় নারী চরিত্রের সাথে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন : চাকাইসরী ধীরেশ বাউদিয়া, হাড়িয়ানীসরী ব্রাহ্মণ বাউদিয়া, পয়মালসরী তুখোর বাউদিয়া ইত্যাদি। সুতরাং সরী যে নারী চরিত্রকেই বোঝায় সেটা একরকম স্পষ্টই। আভিধানিক ছুঁড়ি>ছেঁড়ি>ছঁড়ি> থেকে সরী শব্দটি প্রচলিত বললেও অত্যুক্তি হয় না। দাইঘুরা ও সরী শব্দ দুটো ব্রিটিশ আমল থেকে ঠাকুরগাঁও অঞ্চলে প্রচলিত আছে বলেও তথ্য পাওয়া যায়। অবশ্য পশ্চিম বঙ্গের উত্তর-দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রচলিত খনগানও শরীগান হিসেবে পরিচিত। একদিকে কৃষকদের গরু দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাড়াই করা খড়কে যেমন দাই বলে তেমনি অন্যদিকে নারী চরিত্রের নামের সাথে মিলে এই গানের নামকরণ হয় দাইঘুরা গান।

আবার ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় এটি লোকনাট্য 'ধামের গান' হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়। এ নামের কোনো লোকনাট্য বাংলাদেশের অন্য কোনো জেলাতে খুঁজে পাওয়া যাবে না একমাত্র এ জেলাতে এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এ গানের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে এই অঞ্চলের সাধারণ খেটে খাওয়া হাটে–বাজারে যাওয়া মানুষের জীবন-যাপন। এটি লোকসমাজে গান হিসেবেই বেশি পরিচিত হলেও এটি মূলত এক ধরনের লোকনাট্য। ধাম শব্দটির আভিধানিক অর্থ স্থান বা গৃহ। কিন্তু ধামের গানে'র ধাম কোনো স্থান বা গৃহ এই অর্থ বহন করে না। এটি আসলে কৃত্যমূলক ক্রিয়াকর্মের নিমিত্তে নির্ধারিত স্থানই এই ধাম। আবার হিন্দুদের পূজার বেদিকে ধাম বলা হয়ে থাকে। ধারণা করা যায় এই দেব-দেবীর অধিষ্ঠান আধারকে ধাম বলা সঙ্গত। দেব-দেবীর প্রতিমার সামনে উপস্থিত নটের কর্মই ধামের গান। এই নাট্যে আধ্যাত্মিক এক বিশ্বাসে ধামের পাদদেশে পরিবেশিত হয়। শুধু তাই নয় অনেক সময় পুজাক্ষেত্র বা তীর্থস্থানগুলোকে ধাম বলা হয়। যেমন : কাশী ধাম, বৃন্দাবন ধাম, গয়া ধাম, পুরী ধাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আসলে ধর্মীয় অনুভূতির ভেতর থেকে ভগবান বা দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে পরিবেশিত এ ধামের গান।

দাইঘুরা গানের অঞ্চল

ঠাকুরগাঁও জেলার দাইঘুরা গান সর্বাধিক প্রচলিত লোকনাট্য হলেও এর বাহিরেও এর কমবেশি প্রচলন আছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলা, ঠাকুরগাঁও সীমান্তবর্তী উপজেলার কোনো কোনো স্থানে কমবেশি এ গানের প্রচলন আছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়াও বাংলাদেশের বাইরে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি এবং কোচবিহারেও এ গানের বেশ প্রচলন আছে বলে তথ্য পাওয়া যায়।

দাইঘুরা গানের উদ্দেশ্য

বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দাইঘুরা গান লোকনাট্যের পালা দেওয়া হয়। দাইঘুরা গান লোকনাট্যের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজ সচেতন করা। বন্ধ্যা নারীর সন্তান কামনা, রোগ ব্যাধির উপসম, অধিক ফসল উৎপাদন, গো-জাতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি আত্মীয় পরিজনের এবং প্রবাসগত প্রিয়জনে বিপদমুক্তি কামনা করা। এ সকল আশা বা উদ্দেশ্যে পূরণার্থে ভক্তরা দাইঘুরা গান লোকনাট্যে পালার বায়না দিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

উপকরণ

দাইঘুরা গান লোকনাট্যের উপকরণগুলোকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১. অভিনয় উপকরণ, ২. মানতের উপকরণ। এ দুটি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উপকরণের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে সেগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

১. **অভিনয় উপকরণ :** অভিনয় উপকরণ হিসেবে দাইঘুরা গান লোকনাট্যের আসরে গায়েন দোহার এবং চরিত্রাভিনেতাগণ বিভিন্ন জিনিসপত্রের মধ্যে চরম আশা বা লাঠি ওড়না বা উত্তরীয়, তছবি মালা, কাপড়ের ঝোপা, বাঘের মুখোশ সাপ টুপি ব্যবহার করে থাকেন।

২. **মানতের উপকরণ :** ভোগের উপকরণগুলো মূলত প্রায় সুনির্ধারিত থাকে। মানতে চাল ও টাকা পয়সার পরিমাণও সুনিদিষ্ট থাকে। ভোগের পরিমাণও সুনির্দিষ্ট থাকে। ভোগের উপকরণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : সোয়া কেজি চাল, ১০১ টাকা, ১টি কুলা, ১টি গামছা, ১টি মাটির ঘট, ১ কাদি কলা, ৫টি পান, ৫টি সুপারি, ৫টি আমের পাতা, ১টি ডাব, ফল ১টি, ফুল ১টি, ১ পোয়া দুধ, আগরবাতি, সিঁদুর, মোমবাতি, আধাসের ধান ইত্যাদি । মানতের সময় গৃহস্থ নির্দিষ্ট পরিমাণের যে চাল, ডালসহ অন্যান্য উপকরণ বরাদ্দ করে সেগুলো দেবদেবীর নামে সিরনি হিসেবে উৎসর্গ হয়। এছাড়াও অনেকে টাকা পয়সাসহ হাঁস, মুরগি, খাসি, গরু ইত্যাদি দিয়ে ভক্তি জ্ঞাপন দেওয়া হয়। আর অবশিষ্ট সিরনি দর্শনশ্রোতাসহ এ গানের শিল্পীদের খেতে দেওয়া হয়।

দাইঘুরা গানের অভিনয়কাল

দাইঘুরা গান বছরের প্রায় সব সময়েই হতে দেখা যায়। তবে পৌষ থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত দাইঘুরা গানের আসর বেশি বসতে দেখা যায়। দাইঘুরা গান এখন লোক সমাজের বাইরে বিভিন্ন এনজিও এর তত্ত্বাবধানেও পরিচালিত হতে দেখা যায়। এনজিওগুলোর তত্ত্বাবধানে বছরের প্রায় প্রতিটি সময়েই দাইঘুরা গানের আসর বসে থাকে। তবে বিভিন্ন এনজিও ও প্রাতিষ্ঠানিক সাংস্কৃতিক শিল্পীরা যতই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসুন না কেন প্রায় প্রতিটা সময়েই গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকসমাজ কর্তৃক আজও সর্বাধিক দাইঘুরা গানের আসর বসতে দেখা যায়। প্রায় প্রতি বছর বসলেও বেশির ভাগ আসরই সন্ধ্যার পর হতে গভীর রাত, সকাল কিংবা দুপুরের পর পর্যন্তও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং দাইঘুরা গানের পালা একাধারে সাতদিন সাতরাত পর্যন্ত পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবে পালা হিসেবে এর কম বেশি হতে পারে।

দাইঘুরা গানের বিষয়বস্তু

ঠাকুরগাঁও জেলার লোকজীবনাশ্রিত বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক দাইঘুরা গানের বিষয় নির্ধারিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ লোকসমাজের নানারকম অসঙ্গতি পারিবারিক, সামাজিক উন্নয়ন সাধন হয় এমন বিষয়ই হচ্ছে দাইঘুরা গানের মূল ভিত্তি। দাইঘুরা গানের ভেতর দিয়ে পারিবারিক সামাজিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের অবসান এবং ধর্মমতের ঊর্ধ্বে উঠে মানবতাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান হিসেবে উপস্থাপনই হচ্ছে দাইঘুরা গানের মূল উদ্দেশ্য। দাইঘুরা গানের নানান বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক ঠাকুরগাঁও জেলায় যে কাহিনিগুলো গড়ে উঠেছে সেই

কাহিনিগুলো হলো : নয়নজলী অন্ধস্বামী, কঁচুকাটা, চাকাইসরী ধীরেশ বাউদিয়া, জেলে ফকির, কামার-কামারনী, হাড়িয়ানি সরী ব্রাহ্মণ বাউদিয়া, ঢ্যাকা মারা, পিচুয়ারী, সতী নারী হ্যাবেলো বাউদিয়া, পয়মাল সরী তুখোর চেয়ারম্যান, হাজী-মুন্সী, বেতাল নাহাঙ্গি ইত্যাদি। ঠাকুরগাঁওয়ের একজন লোকসংগীত শিল্পী বলেন, ' দাইঘুরা বা সরীর গানের এরকম একশত একটা কাহিনি বা পালা রয়েছে।'[৩] দাইঘুরা গানের বিষয়বস্তুগুলো খানিকটা উন্মোচনের প্রয়োজনে দু একটি কাহিনির সারকথা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

সতী নারী হেবেলা বাউদিয়া

সতী নারী ছিলো এক ধনাঢ্য ব্যক্তির মেয়ে। আগের দিনে ধনাঢ্য পরিবারের কোনো মেয়ে স্কুলে গেলে তার দপ্তরী অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে হেবেলা বাউদিয়াকে সতী নারীর দপ্তরী হিসেবে নিযুক্ত করেন। হেবেলা বাউদিয়া অত্যন্ত গরিব ঘরের ছেলে আর তার মা বাড়িতে মুড়ি ভেজে বিক্রি করে সংসার চালায়। এক পর্যায়ে সতী নারীর সাথে দপ্তরী হেবেলা বাউদিয়ার ভাব জমে। অন্যদিকে স্কুলের অনেক ছেলেও সতী নারীর সাথে ভাব করতে উদগ্রীব হয় এবং সেই ছেলেরা হেবেলা বাউদিয়াকে সতী নারীর থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য হেবেলা বাউদিয়াকে চাকর বলে কিংবা অন্য কোনো বাক্য প্রয়োগ করে বিরক্ত করতে থাকে। হেবেলা বাউদিয়া এক সময় মানসিক যন্ত্রণায় মার কাছে চলে যায় এবং মাকে বলে, মা মুই আর পারই[৪] বাড়ি যাওয়া নম। মা তার পারই বাড়ি না যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে হেবেলা বাউদিয়া সবকিছু তার মাকে খুলে বলে। তখন হেবেলা বাউদিয়ার মা বলে, বেটা মানুষ যখন এ রকম করতেছে, তখন মুই সতী নারীর সাথে তোর বেহা[৫] দিম। হেবেলা বাউদিয়া তখন মাকে বলে, মা হামরা চাকর, গরিব লোক...।

অন্যদিকে সতী নারীর মা বাবা সতী নারীকে হেবেলা বাউদিয়ার সাথে বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়, ফলশ্রুতিতে হেবেলা বাউদিয়ার মা তাবিজ-কবজ, জাদু-টোনা করে সতী নারীকে হেবেলা বাউদিয়ার বৌ করে ঘরে নিয়ে আসলো। বিয়ের কিছুদিন পর সতী নারীর মা সতী নারীকে প্রস্তাব দেয়, বেটি বেহা যখন হয়েই গেইছে, তা হেবেলা জামাইকে বিষ খাইয়ে মার। সতী নারী তখন বলে, না মা যা কপালে ছিলো হয়্যায় গেইছে, হাজারো হোক বেহাতি স্বামী। এই কথা শোনার পর সতী নারীর মা সতী নারীকে প্রহার করে। অনেকদিন পর হেবেলা বাউদিয়া শ্বশুর বাড়ি যায়, সতী নারীর মা তাকে মিষ্টির সাথে বিষ মিশিয়ে মারার পরিকল্পনা পরিপক্ক করে। সতী নারীর ভাই তার বইনাক হেবেলা বাউদিয়াসহ মিষ্টি খেতে বসে এবং সতী নারীর মা ঘর থেকে বের হয়ে গেলে সতী নারীর ভাই ও হেবেলা বাউদিয়া তামাশা করে বাটি বদল করে মিষ্টি খায়। হেবেলা বাউদিয়া না মরে সতী নারীর ভাই মারা যায় এবং সতী নারীর মা কান্নাকাটি শুরু করে এবং নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়। সতী নারী ও হেবেলা বাউদিয়া সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে।

নয়নজলী অন্ধস্বামী

এক নিষ্ঠুর জমিদার। তার দু'টি ছেলে সন্তান। হঠাৎ জমিদারের স্ত্রী মারা যায়। জমিদার সন্তানদের নিয়ে এক রকম বেকায়দায় পড়ে যায়, বিশেষ করে অন্ধ ছেলেকে

www.pathagar.com

নিয়ে। অনেকের পরামর্শে জমিদার দ্বিতীয় বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেয়। জমিদার দ্বিতীয় বিয়ে করে আনলেন। সৎ মা ঘরে এসে জমিদারের ছেলেদেরকে সৎ ছেলের মতোই দেখা শুরু করে। দিনে দিনে অন্ধ ছেলেটি যুবক হয়ে উঠলো, দাসীদের সাথে পরামর্শ করে অন্ধ ছেলেটাকে মহল থেকে বিতাড়িত করার চক্রান্ত শুরু করে ছোটো জমিদারনী। এক পর্যায়ে ছোটো জমিদারনী জমিদারকে ডেকে তার অন্ধ ছেলের নামে মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে বলে যে, অন্ধ ছেলে তার সাথে প্রেম করতে চায়। এই কথা শুনে জমিদার অগ্নিশর্মা হয়ে অন্ধ ছেলেকে ত্যাজ্য করে মহল থেকে বের করে দেয়। অতঃপর ঐ অন্ধ ছেলেটাকে এক গরিব লোক তার বাড়িতে আশ্রয় দেয়।

দাইঘুরা গানের অভিনয়ের একটি দৃশ্য

অন্য এক এলাকায় বাস করতো এক দুর্ধর্ষ ডাকাত। ঐ ডাকাতের ছিলো একটিমাত্র মেয়ে তার নাম নয়নজলী। হঠাৎ একদিন রাত্রে পুলিশ ডাকাতের বাড়ি ঘেরাও করলে ডাকাত বুঝতে পারে আজ তার নিস্তার নাই। তখন ডাকাত তার মেয়েকে বলে, মা তুমি তো যুবতী হয়েছ কিন্তু আমি তো তোমাকে বিয়ে দিতে পারলাম না, আর আজ তো আমার নিস্তার নাই, তো এখন আমি কি করি মা? তখন নয়নজলী বলে, বাবা আমি তো তোমাকে ডাকাতি করতে বার বার নিষেধ করেছি, কিন্তু তুমি শোনো নাই। এখন আমার কি হবে? এমন সময় ডাকাত মেয়েকে নিয়ে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে গোপন পথ ধরে পালিয়ে যায়। পথিমধ্যে ডাকাতের সাথে ঐ গরিব লোকটি এবং অন্ধের দেখা হয়। এদিকে পুলিশ সব টের পেয়ে ডাকাতকে তাড়া করে। এ রকম অবস্থায় ডাকাত অন্ধ ছেলেটার পরিচয় জানার পর দ্রুত ঐ ছেলের হাতে মেয়ে নয়নজলীকে সমর্পন করে বললো, মা আমি আর পারলাম না, পুলিশ আসতেছে তো এই ছেলেটা যখন জমিদারের পুত্র তখন ওর হাতে আমি তোকে

www.pathagar.com

তুলে দিলাম, আর মা তুমি যদি সত্যি সতী নারী হও তাহলে নিরূপায় আমি যে অন্ধের হাতে তোমাকে তুলে দিলাম তার মূল্য দিও। এই অন্ধকে তুমি দেখবে মানবে এই আমার আদেশ মা, তোমাকে আশীর্বাদ। এমন সময় পুলিশ এসে ডাকাতকে ধরে নিয়ে গেল। ঐ অন্ধ স্বামীকে নিয়েই সংসার করা শুরু করলো নয়নজলী। নয়নজলীও তার অন্ধস্বামী যে গ্রামে বসবাস করে সেই গ্রামে বাস করতো এক নাংগাহা (চরিত্রহীন) মেম্বার। সেই নাংগাহা মেম্বার কুদৃষ্টি দেয় নয়নজলীর দিকে। বারবার নয়নজলীকে তার স্বামীর অন্ধত্বের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে, ভালো খাওয়ানো পরানোর লোভ দেখিয়ে তাকে স্বামী বরণ করে নেওয়ার প্রস্তাব দেয়। এ ঘটনা জানার পর মেম্বারের স্ত্রী মেম্বারের উপর প্রচণ্ড ক্ষেপে যায়। এমন পরিস্থিতিতে নয়নজলীর স্বামী নিরূপায় হয়ে স্ত্রীকে বলে, নয়নজলী আমাকে ছেড়ে যেও না নয়নজলী, এই বলে বারবার স্ত্রীকে শাপটে (জড়িয়ে) ধরে। শেষঅবধি বাবার বলে যাওয়া কথা মনে করে মেম্বারকে প্রত্যাখ্যান করে নয়নজলী। নয়নজলীর বাবা দীর্ঘদিন পর জেল থেকে ছাড়া পায়। ওদিকে অন্ধের বাবা নিষ্ঠুর জমিদার সব ঘটনা জানতে পেরে জমিদারনীকে অপমান করে এবং ডাকাতের মেয়ে নয়নজলীর কাছে থেকে শিক্ষা নিতে বলে এবং কাহিনির শেষে একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ বলে 'জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো'।

উপস্থাপন রীতি

বাংলাদেশের লোকসংগীতের সবগুলো ধারার দিকে যদি আমরা দৃষ্টি দিই তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে, প্রত্যেকটা সংগীতের উপস্থাপন রীতিতে বেশ বৈসাদৃশ্য বর্তমান। তবে বাংলাদেশের লোকনাট্য আঙ্গিকে যে লোকসংগীতগুলো প্রচলিত সেগুলোর উপস্থাপন রীতিতে সিংহভাগ সাদৃশ্য এবং কিঞ্চিৎ বৈসাদৃশ্য রয়েছে। আমরা ঠাকুরগাঁও জেলার লোকনাট্য আঙ্গিকের লোকসংগীত নোটুয়ার গান ও দাইঘুরা গান দর্শনের সুবাদে এই দুই ধরনের গানের উপস্থাপন রীতির মধ্যেও সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য দুইই খুঁজে পেয়েছি। যেমন : নোটুয়ার গানে বাদ্যযন্ত্রী শিল্পী সকলেই মঞ্চের মধ্যে থেকেই গান পরিবেশন করে, কিন্তু দাইঘুরা গানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, বাদ্যযন্ত্রী মঞ্চের ভেতরে বসে থাকলেও গায়ক ও অভিনয় শিল্পীরা মঞ্চের বাহিরে থেকে (যাত্রা আঙ্গিকে) এসে অভিনয় ও গান পরিবেশন করে থাকে। দাইঘুরা গান অভিনয়ধর্মী হলেও অভিনয়ের বিষয়টি এখানে গৌণ। এ পর্যায়ে দাইঘুরা গানের উপস্থাপন রীতির আদ্যোপান্ত বর্ণনা তুলে ধরবার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

সর্বপ্রথম বাদ্যযন্ত্রীরা এসে মঞ্চের ঠিক মাঝখানে নির্দিষ্ট একটি স্থান জুড়ে বসে পড়েন গোলাকৃতি হয়ে। এবং বাদ্যযন্ত্রীদের বাইরের দিকে ও গোলাকৃতিতে বসা দর্শকদের ভেতরের দিকে ফাঁকা পরিসর জুড়েই শিল্পীরা গান পরিবেশন করে। গানের শুরুতেই শিল্পীরা মঞ্চে প্রবেশ করে বন্দনা করেন। ঈশ্বর-দেবদেবী, ওস্তাদ বা গুরু, চতুর্দিক এবং দর্শকদের বন্দনা করে মূলত দাইঘুরা গানের পরিবেশনা শুরু হয়। অতঃপর যে কোনো কাহিনি ধরে মূল গানপর্বের বিস্তার ঘটে। অর্থাৎ এই গানে কোনো ঘটনাকে জুড়ে দেয়ার জন্য প্রথমে দু'এক বাক্যে অভিনয় প্রদর্শনপূর্বক গানের মধ্য দিয়ে কাহিনি বিবৃত করা হয়।

www.pathagar.com

মেকাপ বা সাজসজ্জা

ঠাকুরগাঁও জেলার লোকনাট্য আঙ্গিকের লোকসংগীতগুলোতে আজো নারী চরিত্রে পুরুষদের কিংবা হিজড়াদের দ্বারা অভিনয় এবং গান পরিবেশিত হয়। এক্ষেত্রে পুরুষ হোক আর হিজড়াই হোক তাকে পূর্ণাঙ্গ নারীরূপে উপস্থাপনের জন্য মেকাপ পড়ানো হয়ে থাকে। আর শিল্পীরা মেকামের উপকরণ হিসেবে সাধারণত হাঁড়ির কালি, সিঁদুর, জিনকশ বা সবেদা, পাউডার প্রভৃতি ব্যবহার করে থাকে।

মঞ্চবিন্যাস

সাধারণত রাতে দাইঘুরা গানের আসর শুরু হয় এবং সারারাত ধরে (একটি কাহিনি উপস্থাপন হলে আড়াই তিন ঘণ্টাব্যাপী চলে) একটানা চলে। বাড়ির বড়ো আঙ্গিনা কিংবা স্কুল মাঠে মঞ্চ কিংবা আসরে দাইঘুরা গান পরিবেশিত হয়। আসরের স্থান হয় মাঠের মাঝখানে খড় কিংবা চট বিছিয়ে বৃত্তাকারে। শিল্পীরা সাজ পর্ব শেষ করে 'পাল দোহার' বাদ্যযন্ত্রীসহ আসরের মাঝখানে বসে। শিল্পীদের গান, নৃত্য ও সংলাপ পরিবেশনের জন্য কিছুটা জায়গা খালি রেখে দর্শক শ্রোতাঁরাও বৃত্তাকারে বসে। যখন যার চরিত্র আসে তখন সে বাইরে থেকে এসে, ঘুরে ঘুরে নৃত্য, গীত ও সংলাপ শেষে বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে যায়। দাইঘুরা গানের আসরে নারী, পুরুষ দর্শক-শ্রোতার আলাদা আলাদা বসার ব্যবস্থা থাকে।

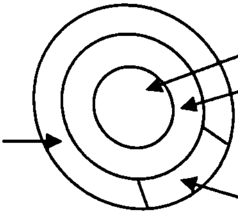

বাদ্যযন্ত্র

লোকসংগীতের অন্যতম অনুসঙ্গ হিসেবে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার লোকসংগীতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। লোকসংগীতে যেমন লোকসমাজের কোনো মুনশিয়ানার বহিঃপ্রকাশ ঘটে না, তেমনি লোকসংগীত সংশ্লিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের মধ্যেও একবারে প্রাকৃতিক উপাদানের ব্যবহার হয়ে আসছে আদিকাল থেকে। লোকসংগীত কালের স্রোতে যেমন খানিকটা পরিবর্তিত হতে পারে তেমনি বাদ্যযন্ত্রেও আজকাল আধুনিক যন্ত্রের উপস্থিতি লক্ষণীয়। তবে লোকসংগীতে আজকাল আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হলেও প্রাকৃতিক উপাদানের মাধ্যমে আবিষ্কৃত যন্ত্রের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। যেমন- ঠাকুরগাঁও জেলার লোকসংগীতে আজও বটের পাতার বাঁশির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এছাড়াও যে বাদ্যযন্ত্রগুলো লোকসংগীতে ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলো হলোঃ হারমোনিয়াম, ঢুলুক, খোল, করতাল, বাঁশের বাঁশি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

দাইঘুরা গানে সমাজ

আমাদের শিল্প-সংগীতকলার সব প্রত্যয়ের সাথে জড়িত থাকে সমাজের সমসাময়িক স্বচিত্র। মানব গোষ্ঠীর মানসলোক গঠিত হয় সমাজ পরিকাঠামো অনুযায়ীই। কারণ সমাজকাঠামোই মানুষের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনার জগতকে সৃজন করে। আর এই সৃজনশীল সাহিত্য-সংগীতকলা সমাজমানসকেও প্রভাবিত করে চলেছে বিভিন্নভাবে। বাস্তবিকপক্ষে কোনো অঞ্চলে যখন কোনো সংবদ্ধ গোষ্ঠী নিয়ে সমাজ গঠিত হয় তখন সৃজনশীল মানুষ তার অবসর সময়ে সমাজমানসের প্রতিনিধি হিসেবে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তার সুখ, দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা কথা-কাহিনি সংগীতে স্থান দেয়। এসব কথায় থাকে শোষণমুক্ত সমাজের কথা, অসাম্প্রদায়িকতার কথা।

ঠাকুরগাঁও জেলার স্থানীয় লোকসমাজের দ্বারাই লালিত সে জেলার লোকসংগীত। তাই তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-বিরহ, শোষণ-বঞ্চনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি তথা পারিবারিক-সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনচিত্র এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। সমাজ জীবনের অন্তঃস্থল থেকেই একইভাবে সাধারণ মানুষের আবেগ, তাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা লোকসংগীতে ফুটে ওঠে। আর লোকসংগীত যে জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণের উপরে অবস্থান করে তারও প্রমাণ মেলে দাইঘুরা গানের মধ্যে। আমরা যদি দাইঘুরা গানের মঞ্চে কিঞ্চিৎ অভিনয়যোগে গাওয়া 'হাড়িয়ানী সরী ও ব্রাহ্মণ বাউদিয়া'র ঘটনার দিকে দৃষ্টি দিই, তাহলে সেখানেও দেখা যাবে যে, হাড়ি সম্প্রদায়ের মেয়ের সাথে ব্রাহ্মণের সম্পর্ক জুড়ে দিয়ে জাত-পাতকে তুচ্ছজ্ঞান হিসেবে উপস্থাপন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এছাড়াও আমরা যদি 'হাজী-মুন্সী' কাহিনির দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে এখানে একদিকে যেমন- হাজী এবং মুন্সী হিন্দু বাড়িতে দাওয়াত খেতে যাওয়ার ভেতর দিয়ে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার পরিচয় মেলে, অন্যদিকে কেচুয়ার বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে কেচুয়ার বাবার মিথ্যে ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কেচুয়ার বাবা যাতে সহজেই বেহেস্তে যেতে পারে এই বলে হাজী ও মুন্সীর স্বার্থসিদ্ধির বিষয়টি উপস্থাপন করে ধর্মব্যবসায়ীদের মুখোশ উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে।

আবার কখনো কখনো মানবিক প্রেমের বিষয়টিও দাইঘুরা গানে মূর্তমান হয়েছে দ্যুতি ছড়িয়ে, যেমন : 'নয়নজলী অন্ধস্বামী' কাহিনিতে নয়নজলী একদিকে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বাস্তবতাকে সানন্দে গ্রহণ করেছে, অন্যদিকে বাবার আদেশ সর্বোপরি পতিপ্রেমকে সর্বোচ্য মূল্য দিতে গিয়ে পতির অন্ধত্বকে তুচ্ছজ্ঞান করে দিনাতিপাত করেছে এবং গাঁয়ের মেম্বার সেখানে হাজারো লোভ-লালসাকে সে পরিহার করে সত্যিকার অর্থে মানবতাকে জয়ী করেছে। যা মূলত মানবিক প্রেমের ক্ষেত্রে মূর্তমান উদাহরণ। এছাড়াও আমরা যদি সতী নারীর হেবেলা বাউদিয়া কাহিনিগীতের দিকে তাকাই তাহলে লক্ষ্য করা যায় যে, এই কাহিনি গীতের মাধ্যমে লোকমানস একদিকে যেমন অর্থবিত্তশালী ঘরের কন্যা সতী নারী ও হতোদরিদ্র হেবেলা বাউদিয়ার প্রেম অতঃপর বিয়ের মাধ্যমে সমাজের উঁচু নিচু ভেদকে বিচূর্ণ করে দিয়েছে, তেমনি গল্পের কাহিনিগীতের ভেতর দিয়ে কারো ক্ষতি করার মানসিকতাকে আত্মবিপর্যয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন : 'সতী নারী হেবেলা বাউদিয়া'

www.pathagar.com

কাহিনিগীতে দেখা যায় যে, সতী নারী ও হেবেলা বাউদিয়ার বিবাহের পর সতী নারী মা হেবেলা বাউদিয়াকে খাবারে বিষ দিয়ে হত্যার পরিকল্পনা করে, কিন্তু নিয়তির দোলাচলে হেবেলা বাউদিয়া না মরে বিষদাতার ছেলেকেই মরতে হয়েছে। এ থেকে লোকসমাজ এই শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করেছে যে, অন্যের ক্ষতি করবার মানসে কোনো ফাঁদ পাতলে সেই ফাঁদে নিজেকেও ধরা দিতে হতে পারে। অর্থাৎ ঠাকুরগাঁও জেলার লোকসংগীতের ভেতর দিয়ে লোকসমাজের অন্যায় অত্যাচার অমানবিকতা সর্বোপরি সমগ্র অসারতাকে নির্দেশপূর্বক সঠিক পথ দেখানোর একটা প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সবমিলিয়ে বলা যায় যে, ঠাকুরগাঁও জেলার নিজস্ব লোকসংগীতগুলোতে মূলত এ জেলার আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনাচরণের মূল দিকগুলো ফুটে ওঠে স্পষ্টভাবে।

দাইঘুরা গানের দর্শক চাহিদা

প্রত্যেক সংগীতই কোনো না কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণির কাছে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। আর অঞ্চলভিত্তিক লোকসংগীতগুলো সেই অঞ্চলের মানুষের কাছে যে কতটা প্রাণের সংগীত তা বলে কয়ে বুঝানো কঠিন। তদরূপ ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের দাইঘুরা গানেরও দর্শক চাহিদা অন্য সংগীতগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। বলতে দ্বিধা নেই যে, ঠাকুরগাঁও জেলায় সমীক্ষাকালে যতগুলো লোকসংগীতের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলোর মধ্যে 'দাইঘুরা গান' দর্শকদের সর্বাধিক চাহিদাপূর্ণ গান এবং এ গানের প্রচলন অন্য যেকোনো লোকসংগীতের চেয়ে অনেক বেশি। প্রাপ্ত তথ্যমতে, সারা বছরই এ গানের প্রচলন অব্যাহত থাকে।

দাইঘুরা গানের আগত দর্শকের একাংশ

www.pathagar.com

তবে প্রত্যেক বছর অগ্রহায়ণ-পৌষ-মাঘ যখন মাঠে ফসল থাকে না, চারদিকে ফাঁকা বিস্তৃত মাঠ এই সময়ে দাইঘুরা গানের আয়োজন হয় সবচেয়ে বেশি। এ গানকে কেন্দ্র করে জুয়াখেলার আয়োজন হয় না, এ গান উপভোগ করবার জন্য কোনোরূপ টিকেটের প্রয়োজন হয় না, সে কারণে এ গানের সাথে দর্শক চাহিদার সম্পর্কটা অনেক বেশি জড়িত। অর্থাৎ মোটকথা 'দাইঘুরা গান'র সংবাদ শুনলেই সাধারণ লোকজন তাদের চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পা বাড়ায় দাইঘুরার মঞ্চভিমুখে।

লোকসমাজে লোকশিল্পী সমাজের মূল্য

আমাদের লোকসমাজে যারা মূলত সংগীতকলার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাঁরা বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের গোড়া ধর্মান্ধদের কাছে হেয় দৃষ্টিতে বিবেচিত হন। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে অনেকটাই তাঁরা গ্রহণযোগ্য একটা আসন পেয়ে থাকে। ঠাকুরগাঁও জেলার লোকশিল্পীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তাঁরা জীবনে কখনো ধর্মান্ধদের রোষানলে পড়েনি। আর না পড়ার পেছনে তাদের অনেকের ধারণা, যেহেতু ঠাকুরগাঁও জেলায় হিন্দু ধর্মালম্বী, পাশাপশি কিছু আদিবাসী গোষ্ঠী'র সংখ্যা অনেক সেহেতু সংগীত চর্চার বিষয়গুলো এখানে অনেকটাই উন্মুক্ত। সবমিলিয়ে বলা যায় যে, ঠাকুরগাঁও জেলার লোকসমাজে লোকসংগীত শিল্পীদের আলাদা মর্যাদা রয়েছে।

দাইঘুরা গানে উন্নয়ন ভাবনা

প্রত্যেক দেশ ও জাতির প্রাণের সংস্কৃতি হলো সেই দেশ ও জাতির লোকজ সংস্কৃতি তথা ফোকলোর। এই ফোকলোরের সাথে মানুষের যে প্রাণের সম্পর্ক তা অন্য কোনোভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশের মোট জনগোষ্ঠীর সিংহভাগই যেহেতু গ্রামে বাস করে সেহেতু সিংহভাগ মানুষেরই প্রাণের সাথেই ফোকলোর বা ফোকলোরের বিভিন্ন রকম উপাদান গ্রথিত আছে ঐতিহ্যিক এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আর সে জন্য মানুষের মানসকে সহজেই নাড়া দেয়ার মূল প্রত্যয় হিসেবে কাজ করে ফোকলোর। এ কারণে ব্যক্তি উন্নয়ন, পরিবার উন্নয়ন তথা সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ফোকলোর। এরই ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশের বিভিন্ন এনজিও সংগঠন ফোকলোরের বিভিন্ন রকম উপাদানকে ব্যবহার করছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে। ঠাকুরগাঁওয়ের দাইঘুরা গানও এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহার হয়ে আসছে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে। এনজিও সংগঠনগুলো তাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড যেমন : বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা, জন্মনিয়ন্ত্রণ, এইড্‌স, ইভটিজিং, মাদক, দুর্নীতি রোধে এই দাইঘুরা গানের সুর, কাহিনি প্রভৃতি বিষয়কে ব্যবহার করে আসছে এবং অনেক এনজিও সংগঠন এখনো এই গানকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করবার চিন্তা করছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। লোকসংগীতশিল্পী গৌরাঙ্গ সুন্দর রায় বলেন, 'CARE এর স্যার আমাকে অনেক দিন থেকে বলছেন, গৌরাঙ্গ দাইঘুরা গান দিয়ে প্রোগ্রাম করার কথা ভাবো', আমি গম্ভীরার ব্যবহার এখনো বেশি করছি তবে অনেক এনজিও দাইঘুরার পরিবেশনা রীতি ও সুর প্রোগ্রামে ব্যবহার করছে।[৬]

www.pathagar.com

দাইঘুরা গানের পরিবেশন

ফোকলোর সদা পরিবর্তনশীল সেটা যেমন সত্যি, তেমনি বিভিন্ন এনজিও সংগঠন ফোকলোরের নানা উপাদানকে তাদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়ে ব্যবহার করছে সেটাও সত্যি। ফোকলোরকে রক্ষণশীলতার গণ্ডিতে না রেখে প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার ভেতর দিয়ে বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক কর্মকাণ্ড তথা সমাজ উন্নয়নে হয়তো ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে অন্তত ফোকলোর বলি আর লোকসংগীতই বলি তার স্বকীয়তাকে হত্যা না করে ব্যবহার করা যেতে পারে।

দাইঘুরা গানের পালা

পালার নাম : আমাইডা পলিয়া লালচিয়া তুরুক

বন্দনা

১.

আজি বন্দি মাগো দশ ভুজা
ওমা সরল মঙ্গলা তোমার
নামে মা করি বন্দনা॥
(চিঃ) পূর্ব পশ্চিম উত্তর
দক্ষিণ বন্দি আমরা ২৩ দেরগন
তাহারে চরণে আমরা করি প্রণাম।
(চিঃ) আশরে বন্দনা করি
দশ বাবার চরণ বন্দি তাহারে
চরণে আমরা প্রণাম করি। ঐ

www.pathagar.com

(বাংলার সেরার গান পাঠ করে প্রবেশ)

২.

(গান)

আজি স্বামী ধন মোর যারা
সায়া হায় দারুণ বিধি তুই মোর
ভাঙ্গিল জুরী কাচা জরে মোক
কোল আড়ী ।॥
(চিঃ) আজি স্বামী ধন মোর যারা
ঘায়া আজি হনু মুই সর্বর হারা
মনটা ভালো লাগেনা অমুই কি
করিম এলা॥ ঐ

(কেচুয়ার প্রবেশ ও রাস্তায় গান)

৩.

(গান)

আজি ফিল্টে নামিয়া কায়
মোক ডাকাচে ওয়া কেন ভাসের
সময় মুই ছড়াটো ভাই দারাইসু
এলেক গান।
(চিঃ) কেন ভাস করু মুই বাড়ি
বাড়ি ভোটের আগে মুই খিলাচু
পান বিড়ি মুই ছড়াডা ভাই
দারাইসু মেম্বারি ॥

(পাঠ করে বাংলা সেরার গান)

৪.

(গান)

আজি খায়া দায়া ওরে
বেটা পারই ভার বাড়ি যা যায়া
চাহির পাশিত টাকা তোরে বাপের
শ্রাদ্ধ ছারিবা ॥
(চিঃ) নেগা বেটা পান গুয়া
নাই দিম হামা শুধু বাটা
বাপের ক্রিয়া ছারিয়া টাকা
দিম ঘুরায়া ॥

(পাঠ করে উভয়ের প্রস্থান)

www.pathagar.com

(মুন্সি ও হাজির প্রবেশ)

৫.

(মুন্সির গান)

আজি যুগের চাকা ও সংগরা
ঘুরেচে বুঝি বেশি নাইরে আর দেরি
তামান হিন্দুলায় পুশিচে মুরগি।
(চিঃ) আজি হাট বাজারে জাচেন
সংগরা নাই জাচেন চিনা তামান
হিন্দুলায় তহবন পিজা ॥

৬.

(হাজীর গান)

সোনাতন ধর্মডা ডুবে খাছে যৌবন
জাতীডা জোর দেছে সংগরা জাতি
নাই রবে সবে একাকার হবো॥
(চিঃ) আজি আবহাতে ও সংগরা মুই পানু শুনা ওমুই দেখিনু
পেপারে ছয় হাজার হিন্দু মুসলমান হইসে ॥
(পাঠ করে উভয়ে জয়গুণের বাড়ি দিকে করে)

(কেচুয়ার প্রবেশ হাজির বাড়ি)

৭.

আজি বাবা মরিয়া আসিনু পারই
মাহাজন গে করিবা ওমুই চাহেচু
পাঁচশ টাকা কাপের শ্রাদ্ধ ছাড়িয়া
টাকা দিম ঘুরায়া ॥
(চিঃ) আজি খাগে পারই
পাল গুয়া নাই দিন হামা
শুধু বাটা কাপের শ্রাদ্ধ ছাড়িয়া
টাকা দিম ঘুরায়া। ঐ
(পাট করে সকলের প্রস্থান)
(জবায়দুর ও জয়গুণের প্রবেশ)

৮.

জয়গুণের গীত

আজি একেত আন্ধার রাতি ছারেচেন
বাড়িডা তোমার নাই কোনো চিন্তা
কেমনে রহিম একলায় বাড়ি ভাত ॥

www.pathagar.com

(চিঃ) রাস্তা ঘাটে সিন্তাই
হচে সোদরের গাড়ি আটকায়
দেছে কত মায়া হারাচে
কত মানুষ দেখেছে। ঐ ॥
(পাট করে উভয়ের প্রস্থান)

(চুয়া বাংলা ও ঠাকুরের প্রবেশ)
৯.
(বাংলার গান) : আজি ঠাকুর টাদে
আইসছেরে বেটা দেরে বসিবা ও
দুই হাত পাওরে ধুয়া মুইতো যাচ্ছু
শ্রাদ্ধের ঘোগার করিবা ॥
(চিঃ) খিলা বেটা চাহা নাস্তা
খিলা বেটা পান গুয়া বেটা দেরী
করিশনা ওতুই শুনেক মন দিয়া ॥

(বেদ বসিয়া বাংলার গীত)

১০.
জারে বেটা মাথা মুরেকনে ও তুই
মধু নাপিতের হাতে গঙ্গার জলে
বেটা সিনান করেকনে ॥
(চিঃ) গঙ্গার জলে বেটা সিনান
করেকনে নয়া কাপর পরিধান করেকনে
তোরে বাপের শ্রাদ্ধে বসেকনে ॥
কেচুয়ার শ্রাদ্ধের মধ্যে হাজি-মুন্সির প্রবেশ

১১.
(বাংলার গীত) : আজি স্বামীর পিণ্ডে
মুই দেচুরে জল, স্বাক্ষি থুইয়া
নিরাঞ্জন স্বামী তোমরা স্বর্গ বাসিহোন।
(চিঃ) স্বামী তোমরা হোন গোলক
বাসি পিণ্ডে জল দেচু মুই হতোভাগী
আজি হাতি স্বামী হোন স্বর্গবাসী ॥

(শ্রাদ্ধ শেষ করে খাবার আয়োজন, ঠাকুর বিদাই, হাজি ও মুন্সির খাওয়া)

www.pathagar.com

১২.
(বাংলার গীত) : তোমেরায় ভসুরা নেহ হে সেবা
কিছু মনে করেন না গরিবের বাড়ি তোমরা নেহহে সেবা ॥
(চিঃ) কেমন খালেন বাহে ভসুরা
গরিবের বাড়ি দহি চুড়া তোমরা করেচু,
নেহরা তোমরা জলপান নেও চাইটা ॥

১৩.
(হাজির গীত)
আজি চুরার ডাকিডা
আনিলেন বাহি দিলেন জুলুম করে
হামরা খান নরে চরে হামার
পেটে কতলায় ধরে॥
(চিঃ) কেচুয়া ছড়াডা বেজায় বাহি
দাই দিলে মোক এক বালতি ওমোক
গুর দিলে বেশি ওমোর সানিলে দাড়ি ॥

(ভূত খাওয়া পর্ব)
(হাজি ও মুন্সির গীত) : আজি তেজাল খাসিডা আন্ধিলেন বাহে
ঝাল দিসেন বেশি এখুদি লবণ
আন কেনি লবণ দিয়া হামা মিল্লা করি।
(দিঃ) হামরা হোন বুড়া মাছি নাই
দিবেন হামাক হাড় হড্ডি হামাক
মাংস দেন বেশি জেনে চেরেবা পায়ী।
(হাজি ও মুন্সির প্রস্থান পরে কেচুয়ার)
(হাজি ও মুন্সির জয়গুণের বাড়ি প্রবেশ)

১৪.
(হাজির গীত)
আজি গাণ্ডির মেকেরা
চান্দিত উঠাবে তোর ছাড়াবে বাড়িডা
জবাইদুর গে তুই আশা করিসনা।
(চিঃ) দিনের বেলায় ধরিস মা,
রাতের বেলায় ভারের মায়া ওইডা
খাইসে চুষিয়া মাই তোর জিবজারের ॥

১৫.
(জয়গুণের গীত): আজি কি কথা শুনালো
দাদো গে ওমোর মন্টা আউলালো
দেহার রক্ত দাদো মাথাও উঠালো ॥

www.pathagar.com

(চিঃ) বাপের হনু দাদো
একনা বেটি, মোর স্বামীডা দাদো
হইসে পরভাবী তোরে আগে
দাদো নাগাচু ফাঁসি ॥

১৬.
(হাজির গীত)
আল্লা কি যুগে পাঠালে
রে ভাই, মরণ হয়না কিতায় কানা
বেনালোচর নাই।
(চিঃ) কেহ ধরম মায়ে ধরম
বেটায় রোপা ওজেচে রোপা ওজে
যেমন তেমন কমর হিলাচে ॥
(চিঃ) কেহ লুঙ্গি খুলায় খরম
থুইয়া দৌড়ে পালাচে নিজের
মায়াক তালাক দিয়া শাশুরিকে নেচে ॥
(চিঃ) কেহ মামার ঘরত, মামীর ঘরত
গল্প করেহে হোদেগে মামী উজকায় আসেচে।
(চিঃ) বহু খাচ্ছে চাংরার উপর
আলু পারিবা শ্বশুর খাচ্ছে ললটং
ধরে বহুক খুজিবা ॥

১৭.
(জয়গুণের গীত) : আজি একলা ঘরে
শুইয়া থাকু জিবটা করে দাকাউ
ও মুই স্বপনে হাসতাউ ভোগের আগুত
দাদো খাবারেনা পাউ।
(চিঃ) দাদো নারীর বেদনা কায়
আর বুঝিবে, যৌবনকাল দাদো যার
আছে দুঃখ সেইত বুঝিবে ওয়ার
স্বামী নাই ঘরে।

১৮.
(হাজির গান)
আজি তোমেরা
আগাও সংগরা মুই ছুরিডাক বুঝাউ।
জয়গুন তুই আনেক গে চাউল
আন্ধিয়া বাড়িয়া চাইটা খিলায় যাউ।
(চিঃ) আয় মেক জয়গুণ বসেক খাবা আজি পুরাম তোর মনের
আশা ওমুই হুকেনা বুড়া ওমুই
কবুরী পাকা ॥

www.pathagar.com

১৯.
(জয়গুণের গীত) : আজি আন্ধিয়া
বাড়িয়া একদিন খিলায় দাদো কিআর
হবে, মনের তৃপ্তি মেটিবে নাই
ওইলা খাওয়ার দাদো সাধ শুয়াতে নাই।
(চিঃ) একদিন খায়া দাদো কি
আর হবে, মনের আশা মনতে রবে
অমুই কুনঠে গেলে পাম ওমুই
স্বপনে হাস্তান॥ ঐ ॥
(জবায়দুরের প্রবেশ ও রাস্তায় গত্র)

২০.
আজি বান ভাসডার মরণ হয় না
কতয় খাম মুই মানুষের হুড়া
হতভাগাডার কপালে পড়া ॥
(চিঃ) তুই হলো জয়গুণ
পরকপালি, মোর কপালে বাধুনির
কারী হামার ভাগ্যে নাই জাগাজমি ॥
ঐ ॥

২১.
(জয়গুণের গান) : আজি মানুষ হাসা
কান্দন স্বামী তোমেরায় দেখান না ওমোক
জতঘরে বুঝা তোমার তাপে ছারেচু বাড়িডা।
(চিঃ) ইংগীতে মুই পাচু বুঝা
তোমেরায় হইসেন দোবারীয়া ওমুই কি
করিম এলা মনটা ভালো লাগে না ॥
(জরায়দুরের গীত)

২২.
আজি চন্দ্র, সূর্য স্বাক্ষী থুইয়া মুই
দিসুগে দায় তুই মোক না কহিস
এজায় বেজায় তোর কথালা মোর
না সহে গায় ॥
(চিঃ) ধরম কপটা মারা যায়া
মোক কহিসে বাড়িডা দেখিবে ওমুই
গেইসু দেখিবা বাপের কাব্য
পালিবা ॥
ঐ ॥

www.pathagar.com

২৩.
(হাজি ও মুন্সির গান)
আজি ভতংগা পিয়াজটা হাতত দিবে
ঐডা যাইগে পাখি বেলারে ওতোক
ভেলকি দেখাবে ওতোক উল্টা বুঝাবে
(চিঃ) কাইচের গ্লাসটাতে মাটি দিবে ঝকায় ঝকায় গোল্লা বেনারে
যাই হোক গোল্লা খিলাবে ও তোক
মাটি হাগারে ॥

২৪.
(জরায়দুরের গান) : আজি নয় মাসিয়া পেটটারে সালাতের
চাপেরায় কাটাম ও তুই কি মনে
পাইসি তুইরে মালা আছায়রে
পাঝি ॥
(চিঃ) তুই হে বাড়িভাত খেল খেলাচি
তোরে এইলা কুবুদ্ধি ওতুই কি মনে
পাইসি ওতুই দেখিয়ারে লাঠি ॥
(লাঠি ওতো দিয়ে হাজির ও মুন্সির প্রহার হাজির প্রস্থান, পরে উভয়ের প্রস্থান)

২৫.
(হাজি ও মুন্সির প্রবেশ পরে কেচুয়ার প্রবেশ)
(হাজির গান) : কোরান শরীফ পাঠ করিয়া একটা লাগিবে মুরগির
ঢেকনা নাতে মিলাত করিয়া নাতে
করোক চল্লিস ॥
(চিঃ) অতলা টাকালা খরচ
করল বাচ্ছি গরুডা বেকার কিনিল
এইলা কার বুদ্ধি ধরল ওতুই
ভুতোক খিলালো ॥
(চিঃ) আজি পাঁচ কলেমা পড়িয়ারে তুই মুসলমান হইয়ারে
যা ওতুই মদিনা দেখিবা বাঘা
কতয় লোক যাচ্ছে মক্কা দেখিবা ॥

২৬.
(কেচুয়ার গান)
তোমরায় না কহেচেন বায়ো মুসলমান হক
ওমুই চাহেচু বাবা তাতে চাহেচু
মুসলমান হইবা ॥
(চিঃ) কত হিন্দু মুসলমান

www.pathagar.com

হচে নয়া নয়া আদর করেছে
জেলা বছর জুমেচে সেলা
বসিবায়না দে ॥

২৭.
(হাজির গান) :
আজি সোনাতন ধর্মডা বাদ দিয়ারে তুই মুসলমান
হয়ারে যা ওতুই বেহেস্ত দেখিবা
যা খেজুর খায়া মনের সাধমেটা ॥
(চিঃ) যদি আল্লার ওলি হবো
ঠেং হিলায়ে খেজুর খাবে দিন
তুই সুখে কাটাব আল্লার রসুলরে হবো ॥

২৮.
(কেচুয়ার গান)
আজি সোনাতন ধর্মডা বাদ দিয়ারে মুই মুসলমান
ন হইয়ারে ধাম ওমুই বেহেস্ত
দেখিবা যাম খেজুর খায়া
মনের সাধ মেটান।
(চিঃ) উটের পিঠিত চরে বেড়াম
ইচ্ছা মতন খেজুর খাম ও মুই
হুমরে মুসলমান।

২৯.
(হাজির গান)
আ্যজি মনে মনে তোরমা বলে মন কেলা খাচে ঐনা
ধরম বেটার সঙ্গে সংসারটাত কি
জায়গানি দেখে ॥
(চিঃ) ওনা দুইটা মনে এক মন হইসে তোক বেলাইসে ভুর্তি ফুকা ও তোক
দেখাবে কেনা ও তোক দিবেরে চেষা।
(পাঠ করে কেচুয়ার প্রস্থান)

৩০.
(হাজির গান)
আজি খাঁটি হিন্দুর জাতি নিলে বেহেস্তরে
যায় জুয়া এইলা কিতাবের কথা
কেচুয়াডাক বুঝাও হে সংগরা।
(চিঃ) শালকি শুলকি বুদ্ধি
দিয়া যদি পারি জাতি নিরা

www.pathagar.com

হামার দুজনকার গুনা আল্লাহ
দিবে মুছিয়া ॥
(পাঠ করে উভয়ের প্রস্থান)

৩১.
(কেচুয়া বাংলা সেরা ও জবায়দুরের প্রবেশ)
(কেচুয়ার গান) :
আজি হাজি বুড়াডা কহেচে মাগে মুসলমান
হবা ও মুই চাহেচু খাবা নেতে
চাহেচু মুসলমান হবা।

৩২.
(চিঃ) বাছি গরুডা বেকার কিনিনু
অযথা টাকালা খরচ কনু
এইলা কার বুদ্ধি ধনু এইলা
ভূতক খিলানু ॥

৩৩.
(বাংলার গান) :
আজি টাকা পয়সা ওরে বেটা দেছে মেটায়া
ও তুই গয়া কাশিরে ঘা তোরে
বাপের পিণ্ডরে দিবা ॥
(চিঃ) সিতা দেবীর পিণ্ড খায়া
স্বর্গে গেইসে জশরত রাজা
ওতুই দেখে কনে যায়া ফাল্গুনীডা।

৩৪.
(জবায়দুরের গান)
আজি বেহেস্ত এত সোজা কে ভেলা
গেইসে যে জন কর্মরে কইসে
তাহে ভাইরে বেহেস্ত গেইসে।

৩৫.
(চিঃ) বেহেস্ত এত সোজা
কোনো মানুষে পাই সে দেখা
ওতোক দেখাবে কেলা ওতোক
দিবেরে ঠেলা॥ ঐ ॥

www.pathagar.com

৩৬.
(চিঃ) বেটা মাও হইয়া ধরু
দুই চরন মায়ের বাক্য না কর
নেং ঘন, মায়ের মতো কেইই
নাইরে আপন॥ ঐ ॥
(কেচুয়ার প্রচ্ছদ্র-হাজির বাড়ি মুহ হবার জন্য)

৩৭.
(কেচুয়ার গান)
আজি মনে (২)
মোর মাক বলে মান কেলা দেচি
এই কহেচে পারার মানছি তুইরে
সালা আচ্ছায়রে পাকি ॥
(চিঃ) আজি বাপোক মারল
মা হোল আড়ী, মোর বাড়ি করল
ভাতের হাড়ী, ওতুই সারাসনি
বেশি সালা দেখিসরে লাঠি ॥

৩৮.
(বাংলার গান)
বেটারে তুই কার
বুদ্ধি ধলো ও তুই কি দুঃখে কুল
তাজিব। তোরে শোকে বেটা মোকে মারিব।

৩৯.
(বাংলার গান)
আজি নিদান কালের ধরম বেটারে
একদিন তহ ছারিবো ছুয়ার সংগে
মোক মারিবো।
(চিঃ) বেটা তোর ভাই
কেচুয়াডা গেলরে বেটা কুল
ত্যাজিবা, তুই বেটা মোক মারিয়া
ফেলা॥ ঐ ॥
(মামার প্রবেশ বাংলার ভাইয়ের সঙ্গে গান)

৪০.
(বাংলার গান)
আজি দাদা কিতায় আসিল,
আসিয়া তুই কি করিল

www.pathagar.com

সাধু নামডা দাদা জলে ডুবাল ॥
(চিঃ) দাদা তোর ভাগীনা
কেচুয়াডা গেলগে দাদা কুল
ত্যাজিবা সাধু নামডা দাদা দিলে
ডুবায়া ঐ ॥
(পাঠ করে প্রস্থান, কেচুয়াকে ফিরায়ে আনার জন্য খাবে মামা ও জবায়দুর)

৪১.
(হাজি-মুন্সি ও কেচুয়ার প্রবেশ)
(হাজির গান)
নয়া মুসলমান হবো যদি, ওতুই পরেক কলেমা
আরও নামাজের শুরা এলায়
পাবো বেহস্থ্ দেখা ॥
(চিঃ) নয়া মুসলমান
হবা গেলে কয়দিন বায়ো
দেরী হবে, জেলা দাড়ী গাজীবে
মেলা ওতোক পাঠান বেহেস্তে।

৪২.
(গানের মাঝখান-মামা ও জবায়দুরের প্রবেশ ও রাস্তার গান)
আজি কে চুয়াডা বুঝি বেহেস্তে খাচ্ছে দেখেক গে মামা হোদেক দেখায় তো যায় না,
হামা হনো নরকের পোকা ॥

৪৩.
(চিঃ) আল্লার দাদো নামে
খাইচে হাতে হাতে টিকিট দেচে
কত মুসলমান পাঠাচে মামা
স্বয়ং বেহেস্তে। ঐ ॥

৪৪.
(হাজির গান)
মানুষ হইয়া
আল্লার দাদো কায় পারে হবা,
এইলা মূর্খ লোকের কথা, তোর
কথালা ও জবায়দুর ভালো লাগে না।
(চিঃ) সইদি আরব চাহেচে
যাবা মোক মেনাই সে খেজুর
খাবা অয়হে আইছে শিকি বা
নামাজের শুরা॥ ঐ ॥
(পাঠ করে সকলের প্রস্থান- কেচুয়া মামার সাথে বাড়ি ফিরে খাবে সমাপ্ত)

www.pathagar.com

পালার নাম : জুলুম, ডাংগুয়া (গ্রাম : গোরকই, রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও)

(জুলুমের প্রবেশ) (পরে বৌদির প্রবেশ)

: শুনচেন না গে বা দশ ঠাকুরলা মরে বা প্রণাম।

জুলুম মরে বা প্রণাম। জুলম ডাঙ্গুয়াডা মরে নাম। বৌদিরডার বাড়ি ভেলদিনতে যাবা চাহাচু। তে মোর বৌদির বাড়ি যাউদি বৌদি বাড়িত ছি নাই।

হাত্তশালি : কে ওডা ডাকাছে মোক। এত কাজের সময়কে ওডা। কে ওডা জুলুম আকি রে।

জুলুম গান : ওনা অনেক দিনতে আশিবা চাহেচু আশিবা পারু না। আশা যাওয়া বাদ দেছু বৌদি রাখেক ডাংগুয়া।

চিঃ : হিন্দুস্থান বৌদি পালায় যাইয়া কোলোনিতে মোর সইছে মায়াডা একলা ঘড়ে শুয়ে যাকু বৌদি ঘুমে ধরে না।

বৌদি গান : বারে বারে কহেচু যে জুলুম মোকে গারাশাইনা ওইলা কথা ওরে জুলুম গায়ে শয়ে না।

চিঃ : মুই হনু গাভুয়া আড়ি তোর মতো ডাংগুয়া নাই রাখিস বাড়ি ফিরিয়া যারে ওরে দেওয়া তোর বাড়ি।

জুলুম গান : আজি মাইয়াডা মরিয়া গে বৌদি ভেরাছে কান্দন, বিছিনাতে শুইয়া দেখু তোরেগে সপন।

(বৌদির ডাক পরে বহুর প্রবেশ)

বৌদি গান : করে, করে ওইলা কথা মোকে সারাইস না। ওইলা কথা ওরে জুলুম গায়ে সহেনা।

চিঃ : ভালো যাদি চাহিসরে দেওয়া বাড়ি হইতে ফিরিয়া যা। নিতে খাবো ওড়ে দেওরা রাঁধুনির ঝাঁটা। (পাঠ করে সকলের প্রস্থান)

(দেউনিয়ার প্রবেশ) পরে জুলুম প্রবেশ

দেউনিয়া : শুনছেন না বা দশঠাকুর মরে বা প্রণাম বিমল দেউনিয়াডা মরে নাম।

(জুলমের প্রবেশ)

জুলুম গান : আজি বড়ো আশা করিয়া দেউনিয়া ডা আসিনু তোর বাড়ি মোরে তানে ওগে দেউনিয়া ডা করেক কাউরাগিরি।

চিতান : দাদা কি কহিম তোক দুঃখের কথা মোর, মায়াডা দাদা গেইছে মরিয়া হাউসালী শ্বরী সঙ্গে দেয়না মিলাইয়া।

বিমলগান : আজি হিলা কেমন কথা জুলুম ভালো লাগে না। ঐডা মাইয়া তোক নাকিরে জুলুম রাখে না ডাংগুয়া।

চিতান : ওনা তোর কথা শুনিয়া কাপেছে মোর পাছিলাম, কারুয়াগীরি শিক্ষা দিবে মোক বাধুনী দিয়া।

www.pathagar.com

জুলুম : আজি পাও ধরিয়া কহেছু দেউরা ডা সুন মোরে কথা দয়া করিয়া এইখান কাম মোক দেনা করিয়া।

চিতান : কাম খান, দাদা করিয়াছে ১০০০ হাজার টাকা দাদা গনাইয়ারে কাম খান না করিবা পারিলে দেউলা কাই কহিবে। (পাঠ করে উভয়ে প্রস্থান।

(বিমল ও হাউসালী স্বরীর প্রবেশ ও পাঠ)

বিমল গান : আজি বড়োই আসা করিয়া বৌদি আসিনু তোর বাড়ি মোর মুখের কথালা বৌদি তুইহে সুনেক কি।

চিতান : বৌদি তুহে যদি রাখিস ডাংগুয়া বড়ো আনুছু ধরিয়া বুড়ী, কইনা চেংরা ভাতার মেটিবেন গে জরা।

হাউসালী/গান : ইজ সাবধান করিয়া দেছু বিমল ওলা কথা সারাইসনা, ওলা কথা ওরে বিমল গায়ে সহে না।

চিতান : ওনা ভালো যদি চাহিসরে বিমল বাড়ি হইতে ফিরিয়া যা নিতে খাবো ওরে বিমল রাঁধুনি ঝাঁটা।

(পাঠ করে উভয়ের প্রস্থান)

(বিজমলের পরে জুলুমের প্রবেশ ও পাঠ। তারপরে মারপিট হবে)

জুলুমের গান : আজি পাও ধরিয়া কহেছু দেওরা ডা সুন মোরে কথা, রাগ গোসালা ওগে দেওরা ডা দেনা ফেলাইয়া।

চিতান : দেউরা ডা রাগ গোসালা ফেলাইয়া দে কাম খান দাদা করিয়া দে তুই না দয়া করিলে দাদা কায় দয়া করিবে।

(পাঠ করে উভয়ের প্রস্থান)।

(জুলুমের প্রবেশ ও মাহাত প্রবেশ) ও পাঠ

জুলুমের গান : আজি বড়ো আশা করিয়া মাহাত দা আসিনু তোর বাড়ি/মোর দুঃখের কথালা মাহাত ডা তুহে সুনেকদি।

চিতান : মাহাত দা কি কহিম তোক দুঃখের কথা, মোর মাইডা গেইছে মরিয়া হাওসালী শ্বরী মাইডার সঙ্গে মোক দেনা মিলাইয়া।

মাহাতের গান : শুনেক শুনেক ওরে জুলুম শুন মোরে কথা মুহুনী/গারি কামলা জুলুম দিছু ছারিয়া।

চিতান : মুইতো হচু বুড়া মানছি নাই করুআর মুহনী পিরী। এইলা কাম ওরে জুলুম দিছু ছারিয়া।

জুলুমের গান আজি পাও ধরিয়া কহেছু মাহাত দা শুন মোরে কথা দয়া করিয়া এইখান কাম মোক দেনা করিয়া।

চিতান মাহাত দা কাম খান মোক করিয়া দে ১০০০/- হাজার টাকা বুঝিয়া লে তুই, না কাম খান করিয়া দিলে কাথ করিয়া দিবে।

www.pathagar.com

(উভয়ের পাঠ)

মাহাত গান : প্রথমে না লাগিবে জুলুম হিপার ওপার নদীর বালা চার ধারিয়া ময়নার কাটা ১টি মাটির গেছা।

চিতান : ওনা কালো ছাগলের খুউ লাগিবে ৩টা লাগিবে ওরে ফুল আর না লাগিবে জুলুম কালি পায়ের সিন্দুর।
(পাঠ করে উভয়ের প্রস্থান)

(হাওসালীর প্রবেশ ও পাট)

হাওসালী গান : আজি ছাই পড়া বাড়ি ভাত মোক রহিবা মনায় না মন করেছে উসাং সাং মোর হাতে বসেনা কাম।

চিতান : ওনা মন করেছে উসাং সাং হাতে না মোর বসে কাম সাত কাম ফেলাইয়ারে মুই কারুয়ার বাড়ির যাম। (বিমলের বাড়ি বিমলের প্রবেশ ও পাঠ)

হাওসালী গান : বড় আশা করিয়া বিমল দা আসিনু তোর বাড়ি মোর দুঃখের কথালা বিমল তুহে সুনেক দি।

চিতান : ওনা ধন সংগীতা টাকা পয়সা ওইলা ভালো লাগে না পুরুষ বিনে নারী জীবন হবেরে বৃথা। (উভয়ে পাঠ)

চিতান : মন করেছে উসাং সাং হাতে না মোর বসে কাম ডাংগুরা না আনিয়া দিলে বিমল তোরে বাড়ি জাম। (বিমল জুলুমের বাড়ি/ জুলুমকে নিয়ে প্রবেশ ও মিলন)।
(হাওসালীর বাড়ি/ বহুর প্রবেশ ও পাঠ)

বহর গান : আজি ডাংগুয়া না আসিলেন বাহে হামারে বাড়ি ছন ছন গাভুরী আজি বাহে দেখেন হামারেতী।

চিতান : কার বেদনা কায় বুঝে কাক কহিলে কায় শুনে বহু দিন বরের তানে মোর মনডা কান্দে।

হাওসালী গান : আইজ মিশা ভারি হইয়াছি বেটি দেখা কি মুই পারুনা, মুহেনা যাছু গা ধুবা বেটি তুহে সাধ মেটা।

চিতান : আশা করিয়া আনিছু বড়ো তুইতে বেটি দেছি নজর এতয় কহিছু বেটি বুঝিয়া বুঝিসনা।

জুলুমের গান : আজি ঔ রকম করিয়া আলীরা টানাটানি করেন না, হাসুড়া পাখুড়া আলীরা যাবে নরিয়া।

চিতান : দেখরে ভাই ভর কলি শ্বাশুর বহু হইছে আড়ী সয়ন কলিডা দেখা দিসে হাওসালীর বাড়ি।
(পাঠ করে উভয়ের প্রস্থান)

(চাল বিক্রয় করিতে হাট হাউসালী শ্বরী-হাট)

হাওসালীর গান আজি টাংগাইল নদীডা স্বামী ধন হইছে ছচ ছচ কার কেমন করে ওহে স্বামী হোম নদী পার।

চিতান : স্বামী চাউলের ঢাকীডা মাথাত কর ধুতিখান স্বামী মালকাচ আর পিঠি করিয়া ওহে স্বামী নদী কর পার। (পাঠ করে উভয়ে প্রস্থান)

www.pathagar.com

লোকসংগীতের আসরের বিবরণ

এখানে দর্শক ঢোল সহরৎ ছাড়াই, লোক মুখে অবগত হয়ে আসরে উপস্থিত হয়। এ গানের দর্শকও তাই কুশলীদের মতোই সাধারণ। এ পালার বিষয় সমাজের খুব চেনা-জানা এবং পালার ভাষাও তেমনি আঞ্চলিক ফলে দর্শক-শ্রোতা খুব সহজেই বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে এবং তাদের বিভিন্ন অনুভূতি নানাভাবে প্রকাশ করে, কখনো হাসি কখনও মলিন মুখে কখনো আবার চোখের জলে। দর্শকবৃন্দ তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে।

ধামের গান

ধামের গানের আয়োজন করা হতো ধর্মীয় বেদীমূলে। বিশেষ দিবস বা বিশেষ পর্বে এ গানের আসর হতো। কিন্তু বর্তমান সমাজ বিবর্তনে অধ্যায়ে এখন তা আর ধর্মীয় ধামে সীমাবদ্ধ নেই। মানুষের মিলনমেলা হয়ে উঠেছে এর ক্ষেত্র। ব্যাপকতার সিঁড়ি বেয়ে জনপ্রিয়তার মূল কারণে এমনটি ঘটেছে। এখন ধামের গান পরিবেশিত হয় উঠানে বা বাড়ির আঙ্গিনায় বা বট-পুকুরের তলায়, হাটে-বাজারে, মাঠে-ঘাটে। স্থানে পরিবর্তনের শুরুর আগে একটা কল্পিত ধাম ও মণ্ডপ তৈরি করা হয় এবং দেবদেবীর আরাধনা করা হয়। এই ধামের গানের সম্পৃক্ত থাকা লোকেরা ছিলো হিন্দু ধর্মাবলম্বী ক্ষত্রিয়, রাজবংশী, পলিয়া ও কোচ সম্প্রদায়ের। কিন্তু আজকের বাস্তবতায় হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের যৌথ প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মিলনের ফলে একদিকে যেমন অসাম্প্রদায়িক চিন্তার বাহিঃপ্রকাশ ঘটে অন্যদিকে তেমনি সকলের কাছে গ্রহণীয় এবং জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এটি এখন সর্বজনীয় আনন্দ উৎসবে পরিণত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. সাক্ষাৎকার : গৌরাঙ্গ সুন্দর রায় (তথ্যদাতা-২১ এ পরিচয় রয়েছে)
২. প্রাগুক্ত
৩. মরিয়ম মনিরা (তথ্যদাতা ৫ এ পরিচয় রয়েছে)।
৪. যে গৃহস্থবাড়িতে চাকর বা দপ্তরী থাকে সেই ধনাঢ্যগৃহস্থ।
৫. বিয়ে।
৬. সাক্ষাৎকার : গৌরাঙ্গ, *প্রাগুক্ত*

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

আমরা যখন গ্রাম বাংলার প্রকৃতি মাটি মানুষের কথা বলি তখন গর্বের সঙ্গে গ্রামীণ মানুষের সহজ সরল নিরাভরণ জীবনের দিকটি নিয়ে আলোচনা করি। কিন্তু তাদের এই সুস্থ সবল নির্ভূল জীবনের ও মানস গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে শৈশব কৈশরে ছেলেমেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে লোকক্রীড়াগুলো।

ক্রীড়ার কর্ম কখনই এককভাবে সম্পন্ন হয় না। দুই বা ততোধিক ছেলেমেয়ে একই সঙ্গে কখনও আবার আলাদা আলাদাভাবে ক্রীড়াগুলোতে অংশগ্রহণ করে থাকে।

গ্রামের কোনো আম বাগানে, বড়ো কোনো খেলার মাঠের চারিদিকে সবুজের সমারোহ পুকুর ঘাট পাখির কিচিরমিচির মৌমাছির উদ্দাম আনন্দে খেলা ও এতে অংশ নিয়ে থাকে। খেলায় জয় পরাজয়ের আনন্দ বেদনার চেয়ে অনেক বেশি বেদনার কারণ হয়ে থাকে যখন কেউ খেলায় অংশ নিতে পারে না। সঙ্গবদ্ধভাবে সমাজ গড়ার প্রাথমিক তাগিদ এবং প্রেরণা তখনই ছেলেমেয়েরা খেলা অর্জন করে থাকে। এই অর্থে লোকক্রীড়াগুলো শুধুমাত্র শিশুর শরীরকে সুস্থ করে তুলে না একই সঙ্গে শিশুকে বিনয় ভক্ত আনুগত্য শৃংঙ্খলা মেনে চলা অর্থ্যাৎ পরবর্তী জীবনে তাকে পরিণত বয়সে একজন নিষ্ঠাবান সমাজকর্মী হিসেবে সৃষ্টি করে। ঠাকুরগাঁও জেলার সকল উপজেলাতেই লোকক্রীড়া রয়েছে। তবে অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ক্রীড়া প্রচলিত। আবার কিছু লোকক্রীড়া রয়েছে সেগুলো সমানভাবে জনপ্রিয়।

লোকক্রীড়াগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে ঋতু অর্থাৎ সময় এবং কৃষির উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত। কতগুলো খেলা বছরের সকল সময়ে ঘরে এবং বাইরে খেলা যায়। এসব উপজেলায় খুব প্রচলিত ক্রীড়াগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. টোকর-টোক খেলা

উপজেলায় আঞ্চলিক ভাষায় অন্য নাম নুকানুকি খেলা। (লুকোচরি খেলা) বছরের যেগুলো কোনো সময় খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তবে ব্যপকভাবে অনুষ্ঠিত হয় শীত মৌসুমে। আমন ধানের কারণে ক্রীড়া আয়োজনের সহজ হয়। খেলাটি নিম্নরূপভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে দুটো দল গঠন করা হয়। আলোচনার ভিত্তিতে যে কোনো একটি দল প্রথমে লুকিয়ে থাকবে ধানের পালায় গহ্বরে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়। লুকিয়ে থাকা সম্পন্ন হলে তাদের মধ্য থেকে যে কোনো একজন জোড়ে বলবে টোকরো টোক। অন্য দল এই শব্দ শুনতে পেয়ে খুঁজতে শুরু করবে। একে একে সকলকে খুঁজে পেলে অন্য দলের সদস্যরা এবার তাদের খুঁজবে। এভাবেই টোকর-টোক লোকক্রীড়াটি এসব উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

২. যই-যই/গাদল/দাড়িয়াবান্দা খেলা

ঠাকুরগাঁও জেলায় যই-যই বা আঞ্চলিক ভাষায় গাদল লোকক্রীড়াটি ব্যপক প্রচলন রয়েছে। এখানেও দুইটি দল থাকবে। ছেলেমেয়ে উভয়েই মিলে একদলে অথবা দুই দলে বিভক্ত হয়ে খেলতে পারবে। সাধারণত এ ধরনের খেলায় মেয়েদের অংশগ্রহণ কম। যারা অংশ গ্রহণ করে তাঁরা ছেলেদের দলের হয়েই খেলায় অংশ নিয়ে থাকে। দুই দলের খেলোয়ারের সংখ্যা নির্ভর করছে ক্রীড়া ঘরের সংখ্যার ওপর। মোট চারজন করে উভয় দলে আটজন সদস্য থাকবে। যে পক্ষ ঘরে টেকবে বা পাহারা দিবে, অন্য পক্ষ একটি নির্দিষ্ট ঘরে প্রথমে অবস্থান নিয়ে সে ঘরে থেকে যে দু'জন ঘর পাহারা দিবে তাদেরকে ফাঁকি দিয়ে প্রথম ঘর থেকে বের হয়ে পর্যায়ক্রমে সমস্ত ঘর প্রদক্ষিণ শেষে দল জয়ী হবে। প্রথম ঘর থেকে ফাঁকি দিয়ে বের হবার সময় পাহারাদার কর্তৃক স্পর্শিত হলে সে মৃত হবে। এভাবে পাহাড়াদার দল কর্তৃক সবাই মৃত হলে পাহাড়ারত দল জয়ী হয়েছে বলে ধরা হয়। খেলাটি এভাবে পর্যায়ক্রমে চলে।

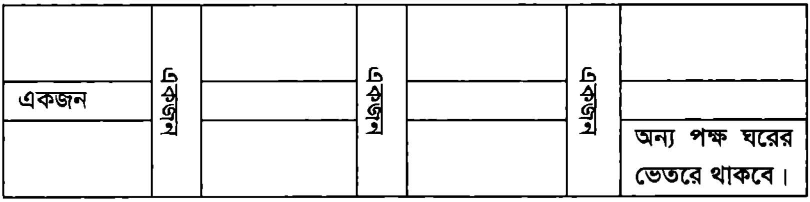

যই-যই/গাদল/দারিয়াবান্দা খেলার ঘর

৩. ডাণ্ডাগুলি খেলা

ডাণ্ডাগুলি সব ঋতুতেই প্রচলিত। তবে বেশ ঘটা করে এবং ব্যপকভাবে অনুষ্ঠিত হয় আমন ধান কাঁটা হয়ে গেলে যখন মাঠ ফাঁকা হয়ে যায়। তখন অবারিত মাঠে গরুর দড়ি ছেরে দিয়ে ইচ্ছে মতো ডাণ্ডাগুলি খেলা চলে দীর্ঘক্ষণ ধরে।

খেলার পদ্ধতিঃ প্রথমে দুই দল। দলের সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। টস করে অথবা আলোচনা সাপেক্ষে ডাণ্ডাগুলি খেলা শুরু করবে।

খেলার উপকরণঃ ১ ফুট লম্বা হাফ ইঞ্চি পুরু বাঁশের বাতার মসৃন করা স্ট্রিক যাকে বলা হচ্ছে ডাণ্ডা।

ফুঁতিঃ অনুরূপ বাঁশ–বাতার মসৃন ৩ ইঞ্চি স্ট্রিককে বলা হয় ফুঁতি। খেলার শুরুতে প্রথম দল একটি নির্দিষ্ট স্থানে ২/৩ ইঞ্চির ত্রিভূজ আকৃতির একটি ছোটো গর্তের উপরে আড়াআড়িভাবে রাখা হয় ফুঁতিটি। অতঃপর ডাণ্ডার শীর্ষ ভাগ গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে গর্তের উপরে রাখা ফুঁতিকে সজোড়ে দূরে নিক্ষেপ করবে। ফুঁতিটি নিক্ষিপ্ত হওয়া পর নিক্ষেপকারী খেলোয়াড় তার হাতের ডাণ্ডাটি গর্ত থেকে এক স্ট্রিক দূরত্বে রেখে দেবে। এবার বিপক্ষ দলের যে কোনো একজন নিক্ষিপ্ত ফুঁতিটি দিয়ে গর্তের পার্শ্বে রাখা ডাণ্ডাটিকে লাগানোর উদ্দেশে ছাড়বে। যদি ডাণ্ডাটিকে লাগাতে সক্ষম হয়

www.pathagar.com

তাহলে যে নিক্ষেপ করেছিল প্রথমে সে মৃত বলে বিবেচিত হবে। আর যদি লাগাতে বা স্পর্শ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে, প্রথম পক্ষের প্রথম জন সে তখন তার রাখা ডাণ্ডাটি দিয়ে ২য় পক্ষের দ্বারা নিক্ষিপ্ত ফুঁতিটি যেখানে পড়েছে সেখান পর্যন্ত তার ডাণ্ডাটি দিয়ে গুণবে এভাবে-

১ ডাণ্ডা দূরত্বে ফুঁতিটি থাকলে	'এরি'
২ ডাণ্ডা দূরত্বে ফুঁতিটি থাকলে	'দুরি'
৩ ডাণ্ডা দূরত্বে ফুঁতিটি থাকলে	'তিরিবিড়ি'
৪ ডাণ্ডা দূরত্বে ফুঁতিটি থাকলে	'চাল'
৫ ডাণ্ডা দূরত্বে ফুঁতিটি থাকলে	'চম্পা'
৬ ডাণ্ডা দূরত্বে ফুঁতিটি থাকলে	'ঢেক'
৭ ডাণ্ডা দূরত্বে ফুঁতিটি থাকলে	'লঙ্কা'

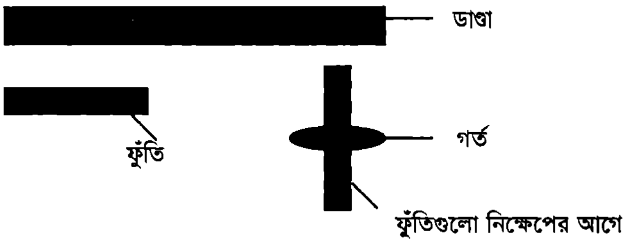

ডাণ্ডাগুলি খেলার উপকরণ

দূরত্ব ১ ডাণ্ডা হলে এরি। এরি মারার নিয়ম হচ্ছে ডান অথবা বাম পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর ফুঁতিটি আগে রাখতে হবে। ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করবার জন্য পায়ের আঙুল থেকে উপরে ছুড়তে হবে ফুঁতিটি। ছুড়ে মারার পর ডাণ্ডাটি আবার যথারীতি আগের মতো রেখে দিলে বিপক্ষ দল আগের মতোই আবার ডাণ্ডাটিকে স্পর্শ করবার জন্য ছুড়বে ব্যর্থ হলে আবার গণনা হবে। এভাবে এরি, দুরি, তিরিবিড়ি, চাল, চম্পা, ঢেক, লঙ্কা= ১ ফুট। যখন দুরি হবে তখন ডাণ্ডাটি যে হাতে থাকবে বিপরীত হাতের তর্জনী এবং মধ্যমা দুই আঙ্গুলের মাথা এক সাথে যুক্ত করে একটি ত্রিভূজ আকৃতি তৈরি হবে তার উপরে ফুঁতিটি রেখে ডাণ্ডাটি দিয়ে আঘাত করে গতি সৃষ্টি করে যতো দূরত্বে নিয়ে যেতে পারবে তত নিরাপদে থাকার সম্ভাবনা থাকে।

তিরিবিড়ি : অর্থ্যাৎ তিন ডাণ্ডা সমান দূরত্বে পড়লে তিরিবিড়ি। তিরিবিড়ি হলে ডাণ্ডার বিপরীত হাতে বৃদ্ধাঙ্গুল ও অন্য আঙুল দিয়ে ফুঁতি হাওয়ার উপরে নিক্ষেপ করে খেলতে হবে।

চাল : চার ডাণ্ডা দূরত্বে বিপক্ষ দলের ফুঁতিটি পড়লে চাল হবে। চাল হলে যথারীতি বিপরীত হাতের করতলে রেখে ও পরে হাওয়ায় নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করে ফুঁতিটিতে গর্ত করার মধ্যেই দক্ষতা নির্ভর করছে।

www.pathagar.com

চম্পা : পাঁচ ডাণ্ডা হলে চম্পা। চম্পা হলে যে হাতে ডাণ্ডা থাকবে ঐ হাতের মুষ্টিতে রেখে পরবর্তীতে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে আঘাত করে গতি সঞ্চার করতে হয়। এর পরে ঢেক । অর্থাৎ ৬ লাঠি দূরত্বে হলে ঢেক।

ঢেক : ঢেক একটি ব্যতিক্রমী পদ্ধতি। ঢেক হলো যেভাবে ফুঁতিকে রেখে ডাণ্ডাটি দিয়ে আঘাত করতে হয় তাহলো:- এতক্ষণ অর্থাৎ এরি, দুরি, তিরিবিড়ি, চাল, চম্পা, ঢেক নিক্ষেপের সময় ডাণ্ডাটি খেলোয়াড় একটি প্রান্তে ধরে ফুঁতিটিকে আঘাত করে এসেছেন এবার তাকে যা করতে হবে তাহলো– এক হাতে ডাণ্ডার গোড়ায় অন্য হাত ডাণ্ডাটির শীর্ষদেশে তর্জনী এবং কনিষ্ট আঙুল ডাণ্ডার উপরে এবং মধ্যমা ও অন্য একটি আঙুল ডাণ্ডার নিচে স্থাপন করতে হবে। অতঃপর ফুঁতিটি বাম অথবা হাতে রেখে অন্য হাত দিয়ে রাখা ডাণ্ডাটি দিয়ে সজোরে আঘাত করে ফুঁতির গতি সঞ্চার করতে হবে।

লঙ্কা : লঙ্কার বিষয় আগেই বলেছি, ত্রিভূজ আকৃতির গর্তের মধ্যে ফুঁতিটি রেখে ডাণ্ডা দিয়ে ছুড়ে মারাই হলো লঙ্কা। মনে রাখতে হবে যে লঙ্কা ছুড়ে মারবার সময় যদি বিপক্ষ দল ধরে ফেলে ফুঁতিটি তাহলে খেলোয়াড় শুধু মৃত হবে না ফুঁতিটি ধরতে পারলে পুরো ১ পয়েন্ট অর্জন করবে। সে অর্জন তাদের দলের থলিতে জমা হবে।

নিখুঁত দক্ষতা না থাকলে এ খেলায় বেশিক্ষণ টিকে থাকার কোনো সম্ভাবনা নাই।

৪. বৌ বৌ বা বুড়িতোলা খেলা

এই জেলায় বৌ বৌ বা বুড়িতোলা খেলা খুব বেশি প্রচলিত। এ খেলাতে ছেলেমেয়ে একই সঙ্গে এবং একই দলের সদস্য হিসেবে খেলায় অংশ নিয়ে থাকে।

দু' দলের খেলা : একদল বৌকে ঘরে তুলতে চাইবে অন্য দল বাঁধা দিবে। প্রথম দল যারা ঘরে তুলতে চাইবে তাদের অবস্থান হবে এ রকম- বৌকে ঘিরে বিপক্ষ দলের সদস্যদেরকে পক্ষদলের সদস্যদের মধ্যে যে কোনো একজন পর্যায়ক্রমিকভাবে সকলেই এক নিঃশ্বাসে চি চি শব্দ ব্যবহার করে প্রথম বৌ এর মাথা ছুঁয়ে বিপক্ষ দলের সদস্যদের হিসেবে বিবেচিত হবে। একইভাবে যে সদস্য শব্দ করতে করতে বিপক্ষকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল তাকেও কিন্তু ফিরে আসতে হবে নিঃশ্বাস থাকতেই। এ রকম অবস্থায় নিঃশ্বাস শেষ হয়ে গেলে তাকে স্পর্শ করতে পারলে সে মৃত সদস্য বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ যে কোনো দলের সদস্য সংখ্যা কমে যাওয়ার সুযোগ সম্ভাবনা থাকে।

উদ্দেশ্য হচ্ছে বৌকে ঘরে তোলা। বৌ এর পক্ষ সদস্যরা যখন বিপক্ষ দলের সদস্যদেরকে তাড়া করছে এই রকম কোনো মুহূর্তে বৌ যদি বুদ্ধি করে বিপক্ষ দলকে ফাঁকি দিয়ে ঘরে আসতে পারে তাহলেও সাফল্য লাভ। অথবা পক্ষদলের সদস্যদের দ্বারা স্পর্শিত হয়ে বিপক্ষের সকলেই মৃত হলে তো কোনো কথাই নেই। আবার কখনও কখনও এমন হয় বৌকে যারা আনার জন্য বিপক্ষ দলকে তাড়া করেছিল দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরাই পরাজিত অথবা মৃত হয়েছে এমন হলে বৌ তখন তার মুখ থেকে থু থু নিক্ষেপ করবে এবং থু থু যত দূরে গিয়ে পড়বে এভাবে বৌ এর ডানে বামে পিছনে থাকবে এমন অবস্থায় বৌ যদি তাদেরকে পিছনে ঘরে পৌছতে পারে তাহলে জয়ী হওয়ার সর্বশেষ পন্থা । এটি খুব মজার খেলা।

www.pathagar.com

৫. গোল্লাছুট খেলা

গোল্লাছুট খেলাতে দুই দলের সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে খেলতে হয়। এই খেলা খেলতে ছেলেমেয়ে একই সঙ্গে একই দলে অংশ নিয়ে খেলে থাকে। টসের মাধ্যমে অথবা আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো একটি দল একজনকে বুড়ি বানিয়ে হাত ধরাধরি করে ঘুরতে থাকে। প্রতিপক্ষ দলের সদস্যরা তাদেরকে ছোটানোর জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। চারিদিকে আগেই গোলাকার করে সীমারেখা দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দেরকে ছুঁতে পারলে সে মৃত হয়ে যাবে। এভাবে সকলে মৃত হলে অন্যদল খেলার সুযোগ পাবে। এ ধরনের খেলার জন্য কোনো ধরনের উপকরনের প্রয়োজন হয় না প্রাকৃতিকভাবে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। অথচ এ খেলায় সদস্য সংখ্যা ইচ্ছেমতো হতে পারে। এতে সুবিধা হচ্ছে অসংখ্য সদস্য সংখ্যার ছেলেমেয়ে উভয়ে একত্রে খেলায় অংশ নিতে পারার জন্য স্বতোঃস্বার কোলাহলে এক ধরনের বুনো উদ্দাম নির্মল আনন্দ শরীর এবং মনকে শক্তি ও সম্প্রীতি দুইয়ের মিলনান্দে তাঁরা দিনে দিনে বড়ো হয়ে উঠে বলেই গ্রামের আটপৌড়ে মানুষেরা এত সহজ সরল সুন্দর মনের হয়।

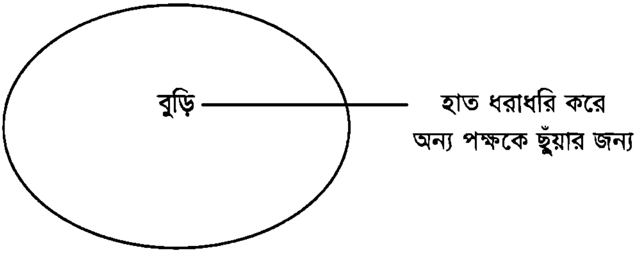

গোল্লাছুট খেলার ঘর

অনেক রকমের খেলা গ্রামে-গঞ্জে দেখতে পাওয়া যায়। কেউ তাদের বিনোদনের কথা ভেবে খেলার মাঠ খেলার সরঞ্জামাদি সরবরাহ্ করে না। এ জন্য তাদের মধ্যে কোনো ধরনের অসুবিধা লক্ষ্য করা যায় না। আবার তাদের খেলার মাঠ এবং খেলোয়াড়ের অভাব হয় না। যদিও আগের অনেক অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেছে। তুবও খেলোয়াড় এবং খেলা থেমে থাকেনি। এটি মূলতঃ মেয়েদের খেলা।

৬. কুত কুত খেলা

সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে কি অনিন্দ্য সুন্দর খেলা মনে হবে নৃত্য চর্চা। এক পায়ে তালে তালে খেলা। এ খেলাতে ছয় সাত জন খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করে। প্রথমে মাটিতে একটি ছক কাটা হয়। ঐ ছকের মাঝে থাকে পাকা ঘর যেটি যা নামে পরিচিত। ছকের প্রথম ঘরে একটি গোলাকার কড়ি রাখা হয় যাকে বলে কাতি মাটির হাড়ি ভাঙ্গা একটি টুকরো। এক একজন মেয়ে খেলোয়াড় পর্যায়ক্রমে পর পর এক পায়ে কুত কুত বলতে বলতে তার চাল শুরু করে সাধারণত পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে

পর পর প্রত্যেকটা ঘর অতিক্রম করে কড়ি বা কাতিটাকে নির্ভূলভাবে পরিসমাপ্তি করতে পারে তাহলে উপরের ঘর এমনিভাবে সমাপ্তি করতে পারলে অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যার্থ হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে একের পর এক ঘর অতিক্রম করার সুযোগ পেতে থাকবে। একজন খেলোড়ার বিরতিহীনভাবে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পরিসমাপ্তি করার পর দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। এই পর্বে ঘরের বিপরীতমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উল্টো দিক দিয়ে কড়ি ঘরের মধ্যে ফেলতে হয় । যদি সে এক্ষেত্রে প্রত্যেক ঘরে কড়ি ফেলতে সক্ষম হয় তাহলে ঘরের হয়ে কড়িকে আগের মতোই চালিয়ে নিয়ে যেতে পারাটার মধ্যেই খেলাটির সফলতা এবং খেলোয়াড়ের দক্ষতা নির্ভর করে। একথা নিঃসন্দেহভাবে বলা যায় যে প্রতিষ্ঠা বা জয় পাবার জন্য তাকে যথেষ্ট একাগ্রতা এবং দক্ষতা প্রয়োজন।

৭. বাঘ–বকরী খেলা

এই এলাকায় জনপ্রিয় খেলার মধ্যে বাঘ-বকরী অন্যতম। তবে এ খেলার অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়গণ অপেক্ষাকৃত বয়সী। বুদ্ধির খেলা হওয়ার কারণে অচঞ্চল শান্ত বা শক্তির প্রয়োজন যা শিশু কিশোরদের স্বভাব বিরুদ্ধ। এ খেলা বছরের যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে অনুষ্ঠিত হতে পারে কিন্তু এই খেলা বর্ষাকালে বেশি জমে। বর্ষা ঋতুতে কৃষকের কাজের এক ধরনের অবসর তৈরি হয় সেই সময় কাটানো নিজেকে একজন মানুষ হিসেবে পরীক্ষা করার সুযোগ সে কাজে লাগাতে চায়। গ্রামের কারো বৈঠকখানায় ঘরের বারান্দায় বেশ কিছু দর্শক জুটে যায়। তাদের খেলা আরও জমে উঠে বাঘকে কখনও বকরীও বেকায়দায় ফেলতে পারে তার জীবন্ত উদাহরণ বাঘ বকরী খেলা।

বাঘ-বকরী যুদ্ধের খেলা। আত্মরক্ষা ও আক্রমনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাঘ–বকরী গুটি চালাতে হয়। বাঘ–বকরীতে আছে শিকারের কৌশল। গুটির চাল দিয়ে বাঘ নামের গুটি বন্দী করা হয়। এ থেকে খেলাটির নাম বাঘ–বকরী হয়েছে। বাঘের চালে গুটি মারা পড়ে।

দু'জন প্রতিদ্বন্দীর একজন বাঘের চাল দেয় অপরজন গুটি/বকরী সরলরেখা বরাবর গুঁটির বিপরীত পার্শ্বে শূন্য ঘর পেলে বাঘ লাফ দিয়ে বকরীকে খেতে পাড়ে। কিন্তু পর পর দুটি ঘরে দুটি বকরী থাকলে বাঘ তার পথ চলা বন্ধ করে দেয়। বকরীর চালে বাঘ মরে না বকরী কেবল আত্মরক্ষা করতে পারে। এভাবে বকরী ঘরের সংখ্যা বন্ধ করতে করতে বাঘকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করতে পারে আবার উল্টোভাবে বাঘ সব গুটি বা বকরীকে ঘেরে ফেললে সে জয়ী। এভাবে বুদ্ধির এবং কৌশলের খেলা চলতে থাকে।

৮. এক্কা দোক্কা খেলা

এক্কা দোক্কা দুই জনের খেলা। এই খেলায় খেলার ঘর কুত কুত খেলার ঘরের মতোই। তবে এ খেলার রীতি অনেকটা সহজ পদ্ধতিতে চলে। প্রথমে একজন সেই ঘরে এক পা হেলে ফেলে

www.pathagar.com

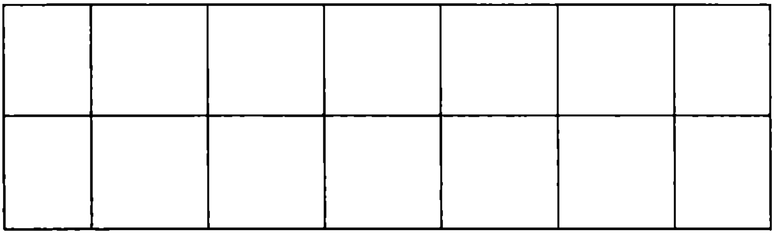

এক্কা দোক্কা খেলার ঘর

সামনে এগিয়ে যায়। সে যদি বড়ো ঘরে গিয়ে পৌছায় তাহলে সে আবার ১টি গুটি নিয়ে আবার উল্টো দিকে ফিরে আসবে। তারপর এভাবে সে খেলতে থাকে। যদি সে কোনো ঘরের দাগ টাচ বা স্পর্শ করে তাহলে সে বাদ যাবে। এভাবে অপরজন খেলবে।

৯. জলক্রীড়া খেলা

ঠাকুরগাঁও জেলার ভূ-প্রকৃতি সমভূমি হলেও ছোটো ছোটো নদী, পুকুর, খাল বিলের অভাব নেই। বর্ষায় নদী নালা খাল-বিল জলে ভরে গেলে গ্রামগুলোতে এক ধরনের মহোৎসবের সৃষ্টি হয়। মাছ ধরা জমির (আইল) আল দেখতে যাওয়া রাস্তার উপর জলের স্রোত সেই স্রোত ভেসে যাওয়া মাছের দল দেখতে পেয়ে হাঁটু জলে শিশুর পানিতে নেমে যাওয়া হাকা-হাকি ডাকা ডাকির কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে ডাঙ্গার মানুষগুলো। বলতে পারেন ডাঙ্গার মানুষের জীবনে জলহাওয়ার উপস্থিতি দারুনভাবে উপভোগ করার এক ধরনের শিশুসুলভ উচ্ছ্বাস। পুকুর এবং খাল বিলের পানিতে শুরু হয় এক ধরনের প্রতিযোগিতা সেই সঙ্গে রাখালের গরু পারাপারের জলক্রীড়া আর সকল কিশোর কিশোরীর দলবেঁধে মধ্য দুপুরে পুকুরে এবং খাল বিলে জলক্রীড়ায় জীবন্ত ছবি। জলক্রীড়াগুলোর মধ্যে কিছু খেলায় ছেলেমেয়ে উভয়ে একই সঙ্গে অংশ নিলেও কিছু খেলায় আলাদা আলাদাভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

১০. ঢোল ঢোল খেলা

পুকুরে অথবা বিলের (বাড়ি পার্শ্বে) অপেক্ষাকৃত গভীর জলে সদস্য সংখ্যা ৫, ৬, ৭, ৮ হতে পারে। একজন মাঝখানে বাকি সবাই হাত ধরা ধরি করে গোলাকার বৃত্ত তৈরি করে জলে ভাসতে থাকবে আবার কখনও বৃত্ত ছাড়াই অন্যদের থেকে একটু দূরে অবস্থান নিয়ে ঢোল বলে পানিতে ডুব দিবে উঠবে আর অন্যরা তাকে ছোটানোর জন্য চেষ্টা করবে ছুঁইতে পারলে মৃত হবে। আবার অন্য একজন এভাবে ঢোল বলবে। এভাবে পালাক্রমে খেলা চলবে। এ খেলার মধ্যে গ্রাম্য ছেলেরা শরীরের সক্ষমতার সাঁতার কাটার কৌশল এবং দক্ষতা অর্জন করে। জলক্রীড়ার অন্যতম মজা পানিতে ভাসমান অর্থাৎ ভেসে থাকে এমন একটি খেলা।

www.pathagar.com

১১. খোঁচা কাঠির খেলা

প্রথমে ৫-১০ জন পর্যন্ত ছেলেমেয়ে উভয়ে এই খেলায় অংশ নিয়ে থাকে জলের গভীরতা (যেখানে খেলাটি শুরু হবে) গলা পর্যন্ত পানিতে মাঝখানে একজন রেখে ছেলেমেয়ে উভয়ে বৃত্ত তৈরি করবে এবং সকলে পানিতে যথাসম্ভব আঘাত করে ঢেউ এবং ফেনা তৈরি করতে থাকবে এরকম একটি পর্যায়ে ভাসমান কাঠি তৈরিকৃত ঢেউ এবং ফেনার মধ্যে ছেড়ে দিবে এবং আরও বেশি ঢেউ তোলার চেষ্টা করবে কখনও কখনও পানিতে স্রোত থাকে যদি খালে বিলে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। তখন ঐ কাঠিটি ভাসতে ভাসতে যে কোনো দিকেই যেতে পারে। শুরু হয় তীব্র প্রতিযোগিতা কে ঐ কাঠি ধরতে পারে। যে পারে সেই জয়ী হিসেবে কাঠি বৃত্তাকার ঢেউ খেলানো জলে ভাসিয়ে দেবার যোগ্যতা অর্জন করে। এ ধরনের খেলার স্মৃতি নিয়ে রচিত কবির প্রেম বিরহের মধুর কাব্য গাথা।

১২. মার্বেল খেলা

মার্বেল একটি জনপ্রিয় ও বহুমুখী খেলা। মার্বেল দিয়ে অনেক রকমের খেলা খেলা যায়। এদের মধ্যে প্রত্যেকটি খেলাই খুবই মজার ও উম্মাদনা তৈরিকারী। নিচে প্রত্যেকটি খেলা তার নিয়ম অনুযায়ী বর্ণনা করা হলো:

১. দান-দান : মার্বেল শব্দটি বা এই খেলার নাম শোনা মাত্রই সবার প্রথম আসে দান দান খেলাটি। এই খেলায় কমপক্ষে দুই জন খেলোয়াড় লাগবে। তবে দুই এর অধিক হলেও কোনো সমস্যা নেই। একাধিকও খেলতে পারে। প্রথমে ৩-৫ ফুট দুরত্বে সমতল ও মসৃন মাটিতে দুই প্রান্তে দুটি দাগ টানতে হয়। যেদিকে মুখ করে খেলবে ঐ প্রান্তে দাগের ২-৪ ইঞ্চি দূরে একটি মার্বেল সমান গর্ত করতে হয়। ঐ গর্তকে ডিপ বলে। এ খেলায় প্রত্যেকটি মার্বেল কে টিপ বলা হয়। যদি দুইজন বা তিনজন বা তারও অধিক খেলোয়াড় খেলায় অংশগ্রহণ করে তাহলে তাদের দাগের অপরপ্রান্ত থেকে একটি বা দুটি করে মার্বেল ছুড়তে হয় ঐ ডিপের উদ্দেশ্যে যে যত বেশি ঐ ডিপের কাছে থাকবে সে হবে প্রথম। ক্রমান্বয়ে ধরা হবে দ্বিতীয় তৃতীয়, ৪র্থ, ৫ম...। তবে ঐ খেলোয়াড়কে মনে রাখতে হবে সে যেন দাগ পা দিয়ে না স্পর্শ করে। স্পর্শ করলে সে লাষ্ট(সর্বশেষে) বলে বিবেচিত হবে। এরপর যে বিষয়টি আসে তাহলো এবার তাঁরা ইচ্ছেমতো বিনিময় করবে যে তাঁরা কত টিপ করে খেলবে ১টিপ/২টিপ/৩টিপ এটি নিধারিত হবে তাদের ইচ্ছানুযায়ী। এরপর যদি ৩জন ২টিপ করে খেলে তাহলে যে অপরপ্রান্ত থেকে করার উদ্দেশ্যে ৬টি মার্বেল ছুড়বে। যাতে করে কোনোমতো দাগ পার হয়ে মার্বেলগুলো দাগের আশে পার্শ্বেই অবস্থান করবে তার অসুবিধার জন্য। যদি কোনো গুটি বা মার্বেল দাগে এসে থেমে যায় অথবা এর কারণে দাগ পার না হয় তাহলে সেটি জলদি বা চোর বলে গণ্য হবে। ধরে নিলাম প্রতেকটি মার্বেল দাগ অতিক্রম হয়েছে এবার বাকি ২ জন খেলোয়াড় ডিপ অতিক্রম চিন্তে একটিকে দেখিয়ে দেবে। দেখিয়ে দেওয়াকে বাদ দেওয়া বলে। মার্বেল ছুড়েছে সে ঐ বাদ দেওয়া মার্বেলটি বাদ দিয়ে অর্থাৎ বিরত রেখে বাকি ৫টি মার্বেলের উদ্দেশ্যে তার হাত থেকে একটি মার্বেল ছুড়বে যদি কোনো একটিকে লেগে যায়

তাহলে ঐ দান ওখানেই শেষ অর্থাৎ সব মার্বেল সে পেয়ে যাবে। যদি না লাগে অর্থাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তাহলে পর্যায়ক্রমে একজন থেকে আরেকজন খেলতে থাকবে। আর যদি ঐ বাদ দেয়া গুটি বা মার্বেলকে লেগে যায় তাহলে তাকে ফাইন বা জরিমানা দিতে হবে তাদের শর্তানুযায়ী। তবে তাঁরা ফাইন বাদ দিয়েও খেলতে পারে। তবে চোর অথবা জলদি'র ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। এই খেলার মধ্যে অনেক ধরনের বাদ দেয়া আছে। যেমন– ফার্স্ট টিপ (প্রথম) সেকেন্ড টিপ (২য়) থার্ড টিপ (৩য়) ফোর টিপ(৪র্থ) লাস্ট টিপ (সর্বশেষে) মুখী (১ম) জোরখোশ যে কোনো একটিকে লাগলেই হবে অর্থাৎ নিজের খুশি মতো। চুকাই (অর্থাৎ ঐ বাদ দেওয়া মার্বেলটিকে লাগলে ২টি ফাইন) ডবল চুকাই তুষ যতগুলো লাগবে ততগুলোই পাবে ইত্যাদি।

২. শাল –শাল : একটি দাগ টানতে হবে লম্বা করে। সেখান থেকে প্রায় ২০-২৫ মিটার দূরে দেওয়া থাকে ছোট্ট একটি ঘর যেখানে ২-৪ টি মার্বেল থাকে। এখানে থাকবে দুই পক্ষ। টসের মধ্যে যারা জিতবে তাঁরা আগে খেলবে। যারা হেরে যাবে তাদের মার্বেল বসা থাকবে ঐ ঘরের মধ্যে তবে খেলোয়াড় ১ জন হতে পারে আবার অধিকও হতে পারে। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় ঐ ঘরটির ঐ মার্বেলগুলোর উদ্দেশ্যে তার মার্বেলটি/মার্বেলগুলো ছুড়বে যদি সরাসরি লেগে যায় তাহলে ১ টাকর হবে। না লাগলে কোনো টাকর হবে না। এদের টার্গেটেই হলো ঠিক যেমন গু-গু খেলি ঐ ভাবে ঐ ঘরের মার্বেলগুলোকে বের করে দাগ পার করতে হবে। দাগ পার করতে পারলে ১ শাল। যতগুলো পার করবে তত শাল হবে। আর যদি ব্যর্থ হয় তাহলে বিপক্ষ খেলোয়াড় খেলবে একইভাবে।

৩. গু–গু : এই খেলায় একটি গর্ত করতে হয়। এক বা একাধিক খেলোয়াড় খেলতে পারে একইসাথে ২০মিটার দূর থেকে ঐ গর্তের উদ্দেশ্যে ছুড়তে হয় যে যত পাশে থাকে ১ম, ২য়, ৩য় এভাবে ঘোষণা করতে হয়। যে প্রথম হয় সে প্রথমে খেলা শুরু করে। খেলার কোনো সীমা নেই। মূল ১-২০ পর্যন্ত বেশি খেলতে দেখা যায়।

যার আগে ২০ পয়েন্ট হয় সে প্রথম তারপর ক্রম অনুযায়ী ২য়, ৩য়, ৪র্থ... ইত্যাদি হয়। তবে খেলাটি গর্তে ফেলে ১ গুণতে হয়। বুড়ো আঙুল মাটিতে রেখে মধ্যমা ডান/বাম হাত দিয়ে যার যে হাত দিয়ে সুবিধা হয় সজোড়ে আঙুল টেনে লাগাতে হয়। একজনের মার্বেলকে পর পর দুই বার লাগা যায় ও বার বার লাগালে পয়েন্ট ০ (শূন্য) হয়ে যাবে। যে সর্বশেষ হয় সে হয় চোর/ গু খাওয়া তখন সে যদি দূর থেকে গর্তে মার্বেলটি খেলতে এভাবে অর্থাৎ যতবার সে ব্যার্থ হবে ততবার তাকে বলা হবে এভাবে–

১ – ইদুর	৬ – ছুচিয়া
২ – দাঁত	৭ – সালি
৩ – তিল্লি	৮ – আড়ি
৪ – চোর	৯ – নাপিত
৫ – পেচা	১০ – দাম্মর

এভাবে বিশ পর্যন্ত গুণতে হয়। তারপর এভাবে ক্রমাগত ১ মাস... ১০ মাস ১০দিন, তারপর বাচ্চার মা, বুড়ি কবর ও শ্রাদ্ধ (চল্লিশা) পর্যন্ত করা হয়।

www.pathagar.com

৪. গাই–বাছুর : একটি ঘর তৈরি করা হয় মার্বেলের পরিমাণ অনুযায়ী বা সংখ্যা অনুযায়ী। মধ্যে থাকে একটি বাকীগুলো তাকে ঘিরেই থাকে। ঐ ঘর থেকে মার্বেলগুলো বের করার জন্য দুই পক্ষ একসাথে খেলে যদি মধ্যেরটি বের করে আনা যায় এবং বিপক্ষ খেলোয়াড় যদি তার বিপক্ষ খেলোয়াড়ের মার্বেলটি লাগাতে ব্যর্থ হয়। তাহলে সে সব মার্বেল পেয়ে যাবে। আর যদি লাগাতে পারে তাহলে সে সব মার্বেলগুলো পেয়ে যাবে। গাই বাছুর ও দান দান খেলায় খেলোয়াড়ের প্রধান মার্বেলটিকে বলা হয় ডিগোল।

১৩. ফুলোনো খেলা

ঠাকুরগাঁও জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে খেলাটি অতি জনপ্রিয় খেলা। ফুলোনো খেলাটির বিভিন্ন ভাগ রয়েছে। যেমন- বড়ো ফুলোনো, ছোটো ফুলোনো, পাঁচ গুটির ফুলোনো। এ খেলার মূল উপকরণ হলো ছোটো ছোটো পাথর ইটের ছোটো টুকরো কিংবা কোনো ফলের বীজ কাঠাল বীজ জলপাই বীজ। সাধারণত গ্রামীণ মেয়েরাই এ খেলা বেশি খেলে থাকে। খেলোয়াড়ের সংখ্যা ৪ থেকে ৬ জন। মেয়েরা গোল হয়ে বসে একের পর এক খেলতে থাকে। কোনো খেলোয়াড়ের হাত থেকে গুটিচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়লে সে মারা পরবর্তী খেলোয়াড় আবার খেলা শুরু করবে। এভাবে শেষ খেলোয়াড় পর্যন্ত পৌছে। এর মধ্যে যে দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়ে সে জয়ী। জয়ী ব্যক্তিকেই ঠাকুরগাঁওয়ের লোকক্রীড়ার সমাজচিত্রে একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি মনে করা হয়। আর প্রতিভাবান ব্যক্তির সমম্বয় করা হয় দক্ষ ব্যক্তির সাথে। বড়ো ফুলোনো খেলায় খেলোয়াড় যখন গুটি চালে তখন মুখে বলতে থাকে –

ফুলোনো ফুলোনো ফুলোনোটি
একে দো ফুলোনোটি
সুরে শাম সুরে শাম
সুরে শামটি একে দো সুরি শামটি
কদম কদম কদমটি
একে দোল কদমটি
বকুল বকুল একে দোল বকুলটি
তারি ঝাম তারি ঝাম তারি ঝামটি
একে দো ঝাপ ॥

এভাবে ছড়া আবৃত্তি করে গুটি চালতে থাকে। তারপর থুক্কু বলে মুখ বন্ধ করে পরে মুখ খুলে আবার আবৃত্তি করেঃ

হায় হাচ্ছা বাঘের বাচ্চা
হায় হাচ্ছা বাঘের বাচ্চা
লাল টুকাটুক টি
লাল টুকাটুক লাল টুকাটুক (২)
লাল টুকাটুক টি

ছোটো ফুলোনো খেলায় খেলোয়াড় যখন গুটি চালায় তখন মুখে বলতে থাকে-

www.pathagar.com

ফুলোনো ফুলোনো ফুলোনোটি
একেতে দুলোনোটি তেলোনোটি
রিটি রুটি ফিটাটি লঙ্গ বচ এলাচি
ঝাম কাঠালে নারিকেলটি
একটি পয়সার কলা
দুটি পয়সার মলা ধাপ পু দিয়ে তোলা ॥
গোসর মোসর দারগা দোসর
তিন তেলিয়া মেলোরিয়া
বোল্লার চাক হাতত থাকে ॥

১৪. কুকুর–শকুনি খেলা

কুকুর-শকুনি খেলায় একজন কুকুর অন্য সবাই শকুনি। কুকুর মাঠের এক স্থানে মৃত হয়ে শুয়ে থাকে। শকুনেরা সেই আপাত মৃত কুকুরটির চতুর্দিকে আকাশে শকুনেরা উড়ে বেড়ার অভিনয় করতে করতে ঘুরে বেড়াতে থাকে। মুখে ছড়া বলে –

আমরা যত শকুনি মরা দেখি যখনি
উইড়া পালায় তখুনি শোঁ – শোঁ শোঁ।

হঠাৎ কুকুরটি উঠে শকুনিদের তাড়া করে। শকুনেরা পালিয়ে যায়। পালিয়ে যেতে যেতে ও একই ছড়া বলতে থাকে। কুকুর যদি কোনো শকুনিকে স্পর্শ করতে পারে তবে সেই শকুনিটিও কুকুর হয়ে যায়।

ঠাকুরগাঁওয়ের লোকক্রীড়ার সমাজচিত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে শকুনির অনুকরণ করে শকুনি খেলোয়াড়রা উড়ে বেড়াবার অভিনয় করে। এটি আসলে আদিম কোনো টোটেম গোষ্ঠীর জাদুনৃত্য। আদিম মানব সমাজের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রথা হচ্ছে শিকারে বা যুদ্ধে যাবার পূর্বে তাঁরা তাদের টোটেমের মতো করে নিজেদের সাজিয়ে সেই টোটেম পশু বা পাখির অনুকরণে নৃত্য করতো। যারা এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করতো তাদেরই যুদ্ধে ইচ্ছুক বলে ধরে নেওয়া হতো। কৌম সমাজে বেশ কয়েক ধরনের নৃত্য প্রচলিত ছিল, রণনৃত্য তাদের মধ্যে একটি। বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিমার নৃত্য আবার এক একটি গোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পত্তি বলে গণ্য হতো।

কখনো কখনো সভ্য করে এই নৃত্য তাদের শিক্ষা দেওয়া হতো। অস্ট্রেলিয়ায় ক্যাঙ্গারু টোটেম বিশ্বাস মানবগোষ্ঠী শিকারে বা যুদ্ধে যাবার পুর্বে ক্যাঙ্গারুর চামড়ায় শরীর আবৃত করে ক্যাঙ্গারুর বেশে নৃত্য করে। কুকুর–শকুনি ক্রীড়াতে, আসলে শকুনি গোষ্ঠীর মরগোষ্ঠী যুদ্ধের পূর্বে তাদের সেই টোটেম নৃত্য করেছে। যখনি উড়ে পালায় তখনি শোঁ– শোঁ –শোঁ কথার মধ্যে উড্ডীয়মান শকুনির ছবিটি স্পষ্ট ফুটে।

১৫. আগডুম বাগডুম খেলা

ঠাকুরগাঁও জেলায় আগডুম বাগডুম খেলাটি নিরীহ গোছের। শারীরিক শক্তি বা বুদ্ধি বৃত্তি নয়, ঠাকুরগাঁওয়ের এই খেলাটি ছড়া নিছক আনন্দের। সচরাচর বৃষ্টির দিনে বা

www.pathagar.com

কোনো কারণে বাইরে বের হতে না পারলে কয়েকজন মিলে এই খেলা ঘরে বসেই খেলোয়াড়রা করে থাকে। সকলেই গোল হয়ে বসে সামনে হাত ছড়িয়ে ছড়ানি আবৃত্তি করে। ছড়ার ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দলপতি ছড়াটি আবৃত্তি করে ক্রমান্বয়ে, একেকটি আঙ্গুলে স্পর্শ করে। ছড়ার শেষ শব্দটি যে আঙুল এসে শেষ হবে সে আঙুলটি মুড়িয়ে রাখে। এভাবে যার সবগুলো আঙ্গুলে প্রথমে মুড়িয়ে যায় সে জয়ী হয়। সর্বশেষ খেলোয়াড়ের পরাজয় ঘটে। ঠাকুরগাঁওয়ের এই লোকক্রীড়ায় ছেলে মেয়েরা যে ছড়াটি কাটে তা নিচে তুলে ধরা হলো :

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢাক মৃদং ঝাঝর বাজে।
বাজতে বাজতে চললো ডুলি
ডুলি গেলো কমলাপুলি।
কমলাফুলির টিয়ে টা
সূয্যি মামার বিয়ে টা।
আয় বঙ্গ হাটে যাই
গুয়া পান কিনে খাই।

ছড়াটির ভেতর বাঙালির সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের অনেক চিত্র মিলে মিশে আছে। ব্যাখ্যাটা এ রকম প্রাচীন বাংলায় হিন্দু রাজাদের আমলে সামরিক বিভাগে ডোম সৈন্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। 'আগডুম' শব্দের অর্থ অগ্রবর্তী ডোম সৈন্যদল, 'বাগডুম' শার্শ্বরক্ষী ডোম সৈন্যদল এবং 'ঘোড়াডুম' শব্দে অশ্বারোহী ডোম সৈন্যদল বোঝাতো। সুতরাং বলা যেতে পারে খেলাটিতে বাস্তব সমাজ জীবন ও রাজনীতির ছায়া আছে।॥

১৬. আঙুল ভাজা খেলা

ঠাকুরগাঁও জেলার বহুল প্রচলিত যে খেলাটি সেই খেলাটির নাম হলো আঙুল ভাজা। খেলাটি পাঁচ থেকে নয় বৎসরের মধ্যে যাদের বয়স তাদের মধ্যে খেলাটি প্রচলিত। খেলায় অংশগ্রহণকারী দুই বা ততোধিক ছেলে মেয়ে দুহাত মাটিতে বিছিয়ে বসে। একজন আঙুল গুণে গুণে নীচের ছড়া কাটে।

আঙুল ভাজা তাড়াতাড়ি ঝিঙ্গী ভাজে ঝিঙ্গাধরি।
রস বর্ষ শিক্ষার বুলবুলি মস্তক।

ছড়ার শেষ শব্দটি যার যে আঙ্গুলের উপরে পড়ে সে সেই আঙুলটি গুটিয়ে রাখে। এভাবে কয়েক দফা ছড়া কাটার পর যার সকল আঙুল গুটানো হয় সে কাউয়া (কাক) সাজে। অন্য খেলোয়াড়েরা তাকে সাত রকম গাছের পাতা আনতে বলে। সে যথারীতি পাতা যোগাড় করে নিয়ে আসে। তারপর কাউয়ার চোখ বেধে পাতাগুলো লুকিয়ে রাখা হয়। চোখের বাঁধন খুলে দেওয়ার পর কাউয়া পাতা সবুজ পেতে তৎপর হয়। খুঁজে পেলে তার জিত। এভাবে ছড়া কেটে কাউয়া বানিয়ে পুণরায় খেলা শুরু হয়। কাউয়ার

www.pathagar.com

চোখ বেঁধে দেওয়ার সাথে ঠাকুরগাঁওয়ের লোকেরা যে অনুভূতি দ্বারা সমাজের জয় আনয়ন করতে পারে তা এই আঙুল ভাজা খেলাটির মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। দক্ষ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা এই কাজ সম্ভব তার সমাজচিত্র এই লোকক্রীড়ার মধ্যে সুন্দরভাবে উজ্জ্বল ও পরিস্ফুটিত। তীক্ষ্ণ ও মেধাবী মানুষ দ্বারা এই কাজ করা সম্ভব করতে পারে।

১৭. বৌছি খেলা

বৌছি খেলায় ছোটো একটি বৃত্ত থাকে। বৃত্তের মধ্যে বসে থাকে বৌ বা শিশু। এই বৌ বা শিশুকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে হয়। বৌছি খেলায় খেলোয়াড়রা একদল বসে থাকে। অন্য দলের সকলেই সীমানা পাহারা দেয়। বৌছি দলের একজন তার মাথা ছুঁয়ে ছড়ায় সুরে বিভিন্নভাবে আবৃত্তি করে–

১. একটি দুই ছি মরিচের বিচি
মরিচ কাঁন্দে হায় হায় করি ॥

২. খেজুর পাতা দাড়ি পাল্লা
নদীর পানি টলমলা
খোড়া মোর এক ঠ্যাং
ন্যাল ন্যাল ॥

এই খেলার মধ্যে জীবন সংগ্রামের যেমন চিহ্ন আছে তেমনি আছে নারী জীবনের অজানা ইতিহাস। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে নারীকে ভোগ করার বহুরূপী উপায় তৈরি হয়েছে। এগুলোর কোনোটি সমাজ স্বীকৃত কোনোটি অস্বীকৃত। নারীর উপর জুলুম করার প্রথার ও অনেক সময় সমাজ মেনে নিয়েছে। কখনো বা সেই জুলুম সমাজে আবার প্রতিহত হয়েছে। কৌম জীবনে এক একটি গোষ্ঠী ভিন্ন গোষ্ঠীর নারীদের অপহরণ করেছে। উদ্দেশ্য ভোগ আর সংঘের সমাজের সদস্য বৃদ্ধি। নারী অপহরণের এই ঘটনা আদিম যুগ হতে সামন্ত যুগ পর্যন্ত কম বেশি সংঘটিত হয়ছে। এমনকি নারী অপহরণ করে বিয়ে করার রীতিও সমাজ সিদ্ধ ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষে এমন একটি বিবাহ রীতি হলো 'রাক্ষস বিবাহ'। রাক্ষস বিবাহ যা সমাজ স্বীকৃত বিবাহ রীতি ছিল। তাই অনেক ক্রীড়ার মধ্যে সমাজের এই পর্ব প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে আছে। বিশেষ করে বৌছি খেলা অন্তত সেই কথাই বলে। এই খেলার মধ্যে এক গোষ্ঠীর নারীকে অন্য গোষ্ঠীর সদস্যরা হরণ করে নিতে চেষ্টা করে। আর অন্যরা তাদের নারীকে বা বউকে পাহারা দিয়ে রাখে। খেলাটিতে মূলত কামনা ভোগের এই স্মৃতি চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়।

১৮. বুড়িতোলা খেলা

বুড়িতোলা খেলা একটি অতি জনপ্রিয় খেলা। এই খেলা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে খেলতে হয়। বিপক্ষ দলের স্পর্শ বাচিয়ে বুড়িকে নিজস্ব ঘরে তুলে আনাই এই খেলার মূল

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য। ঠাকুরগাঁওয়ের প্রায় সব অঞ্চলেই বুড়িতোলা খেলাটি প্রচলিত। তবে বুড়িতোলা খেলার মধ্যে যে নাট্যধর্মী চিত্র থাকে তা সব অঞ্চলে প্রায় একই রকম। অঞ্চলভেদে শুধু নামগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

বুড়িতোলা খেলায় দেখা যায়, কন্যা অপহরণের পরের দৃশ্য থেকেই খেলাটি শুরু। অর্থাৎ কন্যা অপহরণের পর কন্যাপক্ষ এবং বরপক্ষের মধ্যে আদিমকালের অপহরণমূলক বিবাহের সময় লড়াই সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধ দৃশ্যটিই বহু সহস্র বৎসরের পথ অতিক্রম করে এসে ও টিকে রয়েছে বুড়িতোলা খেলার মধ্যে দিয়ে। কারণ শিশু-কিশোরের কাছে অধিকতর মনোহরী হয়েছে সেটিই এবং ক্রীড়ার মধ্যে সেই অংশটুকু অনুকরণযোগ্য বলে বিবেচিত। লোকক্রীড়ায় রীতি আচারের কোন অংশকে অনুকরণ করতে হবে এবং কোন অংশ বর্জন করতে হবে। তা এভাবেই শিশুর মন দক্ষ সম্পাদকের বুদ্ধি নির্ধারণ করে থাকে নিজের অজ্ঞাতেই।

বর পক্ষের লোকেরা কন্যা পক্ষ থেকে কন্যা অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে নিজেদের দখলে আনতে চেষ্টা করে, বুড়িতোলা খেলাটিতে পরিষ্কার। কন্যা অপহরণের পর বরের অন্যান্য সঙ্গী একে একে ঐ কন্যার উপর নিজ নিজ যৌন অধিকার প্রয়োগ করতো। বরের স্ত্রী সম্ভোগের সুযোগ আসত সবার পরে। মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার এবং পলিনেশিয়ার বেশ কিছু আদিবাসী সমাজে বিবাহিত নারীকে এখনো এই বিশেষ প্রথা মেনে নিতেই হয় সামাজিক অনুশাসন হিসেবে। এমনকি বরদের সঙ্গে নতুন বৌ এর রস রসিকতা রীতিনীতিকেও ঐ প্রথারই ভগ্নাবশেষ বলে ধরা হয়। কন্যাকে অপহরণের ঘটনাটি যে পুরুষের প্রাথমিক উদ্যোগে সংঘটিত হতো সেই যে অপহৃত কন্যার স্বামী। সে কথা অবশ্য সকলকেই স্বীকার করে নিতে হবে।

আবার, অপহৃত কন্যা যদি বরের আওতা থেকে পালিয়ে যায় এবং ঐ পলায়না কন্যাকে যদি অন্য কোনো পুরুষ অধিকার করতে পারে, তবে ঐ কন্যাটি দ্বিতীয় পুরুষেরই স্ত্রী হিসেবে পরিগণিত হবে। কন্যা অপহরণের মাধ্যমে বিবাহের রীতি সেই আদিম যুগে যখন সৃষ্টি হয়েছিল, সে ছিলো তখনকার বিবাহের এবং যৌন অধিকার প্রয়োগের প্রথা ও পদ্ধতি। সুতরাং বুঝতে সমস্যা হয়নি যে, কোন স্বার্থে বৌ সমস্ত পাহারাদার খেলোয়াড় সমান শ্রম স্বীকার করে অপহৃত কন্যাকে পাহারা দেয়। শুধু তাই নয়, বউ যখন নিজেদের বৃত্তে ফিরে যাবার জন্য পলায়ন করে তখনও সমস্ত খেলোয়াড়রা সমান শ্রম স্বীকার করে তাকে ছুঁয়ে দেবার চেষ্টা করে তার স্বার্থ এই যে কন্যাটিকে ছুঁতে পারবে কন্যা তখন তারই স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃত হবে।

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

মানব সমাজ উদ্ভবের সময় থেকেই মানুষ নিজের দেহ বিকারজনিত নানাবিধ রোগ নিরাময়ের জন্য আপন জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে রচনা করেছিল এক চিকিৎসা বিধি। মূলত প্রাক শাস্ত্রীয় নৈসর্গিক ও অতি প্রাকৃত ঘটনার প্রভাবজনিত প্রতিক্রিয়াই এই চিকিৎসার উৎস। তাই বলা যায় অলিখিত ঐতিহ্য নির্ভর চিকিৎসাবিধি বলেই এই চিকিৎসাবিধির নাম লোকচিকিৎসা। মূলত লোকচিকিৎসা পদ্ধতি লোক পরম্পরায় চলে আসা একটি পদ্ধতি। যে পদ্ধতি একজন অন্যজনের কাছ থেকে দেখে দেখে বা শুনে শুনে শিখেছে। এর ধারাবাহিকতা কালান্তরের ঘূর্ণিপাকে আজও প্রবাহমান।

বাংলা লোকচিকিৎসার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Folk medicine. Folk এবং Medicine এর পৃথক সংজ্ঞা প্রদান করতে পারি এভাবে-

Folk শব্দের আবিধানিক অর্থ হলো লোকগণ, জনমানব, গণমানুষ, জনসাধারণ ইত্যাদি। Folk-এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে নৃতাত্ত্বিক অভিধানে বলা হয়েছে "Folk in ethnology is the common people who share a basic store of old tradition."

"লোক" হলো সাধারণ মানুষের বড়ো একটা অংশ যারা গোষ্ঠী চরিত্র নির্ধারণ করে এবং সভ্যতা, প্রথা, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, পুরাণ, চারু ও কারু শিল্পের রূপকে বংশ পরম্পরায় ধরে রাখে।

Folk সম্পর্কে August panyella বলেন- "In the expression folk art is not only the word 'art' that is difficult to understand: the word Folk is equally problematic."

Webster's New collegiate Dictionary, তে 'Folk' এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে "The great portion of the members of a people that determines the group character and that tends to preserve its characteristics from of civilization and its customs, arts and crafts, legends traditions and Superstitions, from generation to generation."

Encyclopaedia of Anthropology গ্রন্থে Folk এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে- "A less ethnocentric and broader definition of folk would be any group of people who share at least one common factor (for example, common occupation.)"

মোট কথা- 'Folk' বা 'লোক' শব্দের অর্থ জনগণ, জনমানব, মানবগোষ্ঠী, গণমানুষ, জনসাধারণ, মনুষ্যসমাজ ইত্যাদি।

Medince এর আভিধানিক অর্থ- ওষুধ- a drug, প্রতিকার- a remedy, চিকিৎসাবিদ্যা- the art of healing a medicinal.

www.pathagar.com

Students' Favourite Dictionary তে Medicine এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- "a drug or a substance taken internally to cure diseases."

Folkmedicine বা লোকচিকিৎসা হচ্ছে- অতিপ্রাচীনকাল হতে চলে আসা সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতি। যে পদ্ধতিতে সাধারণত লতা-পাতা, গাছ-গাছড়া, ফুল-ফল, ছাল-বাকল, শিকড়-বাকড়, আগুন-পানি, তাপ-কয়লা, ছাই-মাটি, দুধ-ঘি, তৈল-চর্বি, কীট-পতঙ্গ, জীব-জন্তু, ধাতব-অধাতব পদার্থ প্রভৃতি ব্যবহার হয়ে থাকে। পাশাপাশি দোয়া-কালাম, ঝাড়-ফুঁক, তন্ত্র-মন্ত্র, তাবিজ-কবচ, যাদু-টোনা, সিন্নি-মানত প্রভৃতি রোগ মুক্তির উদ্দেশ্যে বিশেষ সময়ে লোক ঢংগে ব্যবহৃত চিকিৎসা পদ্ধতিকে প্রকৃতপক্ষে লোকচিকিৎসা বলে।

লোকচিকিৎসার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে জাগ্‌গি লিখেছেন- "Folk Medicine has its own concepts about the causation of disease : Warth of Gods, evil spirits, magic, witchcraft etc. It has is own diagnostic tools and teachniques which lean heavily on divination. Treatment is based upon-removal of the causative factor through the propitiation of Gods, exorcism, counter-magic, use of charms and ameulets, and of course, administration of some harbal preparations-a perfectly rational approach in so far as it in intended to remove the basic cause."

অতিপ্রাচীনকাল থেকে এদেশে চিকিৎসার দুটো পদ্ধতি চলে আসছে। একটি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালব্ধ পদ্ধতি, অন্যটি হলো লোক পরম্পরায় চলে আসা পদ্ধতি, যা দেখে দেখে শেখা এবং শুনে শুনে জানা। লোকবিদ্যার এ শেষোক্ত ধারাই লোক থেকে লোকান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে প্রবাহিত। লোকবিজ্ঞানের অভিধানে এটিই লোকচিকিৎসা নামে পরিচিত।

মোট কথা আদিকাল থেকে পর্যায়ক্রমে গুরু থেকে শিষ্যের মাধ্যমে, এক লোক অন্য লোকের কাছ থেকে দেখে দেখে কিংবা শুনে শুনে বিভিন্ন উদ্ভিজ, খনিজ, প্রাণিজ পদার্থ এবং দোয়া-কালাম, তন্ত্র-মন্ত্র, তাবিজ-কবচ, ঝাড়-ফুঁক প্রভৃতির দ্বারা যে চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচারিত ও প্রসারিত হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাকেই লোকচিকিৎসা বলে।

লোকচিকিৎসার ইতিহাস

অতিপ্রাচীনকাল থেকেই লোকচিকিৎসার পদ্ধতি প্রচলন এদেশে প্রচলিত। লোকচিকিৎসার লিখিত কোনো ইতিহাস নেই। এ বিষয়ে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। লোক পরম্পরায় বা পারিবারিক বা আত্মীয়তার সূত্রে প্রাপ্ত শিক্ষাই লোকচিকিৎসকদের একমাত্র অবলম্বন। যারা এ পেশার সাথে জড়িত, তাদের অধিকাংশই এটিকে মূল পেশা হিসেবে গ্রহণ করতেন না, এখনো করেন না। সমাজে নিজেকে উপস্থাপন করার জন্য কিংবা বাড়তি আয়ের মাধ্যম হিসেবে অন্য কাজের পাশাপাশি এ কাজটিও অনেকে করে থাকেন।

এ পেশার সাথে যারা জড়িত-তাদেরকে সাধারণ কবিরাজ, বৈদ্য, হেকিম, ওঝা, ধন্বতরী প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এ পেশার সাথে পীর-ফকীর, হাজাম-

www.pathagar.com

দরবেশ, দাই, সাধু, সন্ন্যাসী, মসজিদের ইমাম, মোল্লা-মুন্সী, দরগা-মাজারের খাদেম ব্যক্তিগণ সরাসরিভাবে জড়িত। এ শ্রেণীর লোকচিকিৎসকগণ রোগ নিরাময়ের জন্য গাছ-গাছড়া, ভেষজ ওষুধ তথ্যের পাশাপাশি তন্ত্র-মন্ত্র, দোয়া-কালাম, তাবিজ-কবচ, যাদু-টোনা, ঝাড়-ফুঁক, তুক-তাক ইত্যাদি পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকেন।

লোকচিকিৎসার প্রচলন প্রাচীনকাল থেকে শুরু হয়ে বর্তমানকাল পর্যন্ত সমাজের প্রায় সর্বস্তরে প্রচলিত। অতীতে এটি যেমন এদেশে ছিল, বর্তমানে তেমনটি আছে।

বর্তমানকালে যেমন বিদ্যা অর্জনের জন্য বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেকালে চিকিৎসা বিদ্যা অর্জনের জন্য তেমন কোনো স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। তবে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৬) যে শিক্ষানীতি ছিল, তার মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন- "Every boy ought to read books on morals, arithmetic, agrincuture, mensuration, geometry, astronomy, physiology, household matters, the rules of government medicine, logic, the tabii, riyazi, science and history of all which may be gradually acquired."

প্রকৃতপক্ষে লোকচিকিৎসার প্রচলন কখন থেকে কিভাবে শুরু হয়েছে, তা সঠিক করে নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে একথা সত্য যে, মানুষের জন্মলগ্ন থেকেই মানুষ কোনো না কোনোভাবে চিকিৎসা গ্রহণ করতো। জীবন চলার পথে বহু প্রতিকূলতার কারণে নানান দূর্ঘটনার পাশাপাশি বিভিন্ন অসুখ-বিসুখে পতিত হতো। তাই দেহ ও জীবন রক্ষার জন্য মানুষ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দ্রব্যাদির মাধ্যমে রোগ নিরাময়ের ওষুধ গ্রহণ করতো। প্রাণিজগতেও এ নিয়মের প্রতিফলন লক্ষণীয়। আমাদের চেনাজানা অনেক প্রানী জীবন ও দেহ রক্ষার জন্য মাটি, ধাতব অধাতব পদার্থ, গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা, শিকড়-বাকড় প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করতো এবং এখনো গ্রহণ করে। যেমন গরুর অজীর্ণতা হলে লবনাক্ত মাটি চেটে চেটে খেয়ে থাকে। বেজি সাপের দংশন খেয়ে বিষ পানি করার জন্য সর্পগন্ধার শিকড় ব্যবহার করে থাকে। কবুতর এটেল মাটি ভক্ষণ করে খাদ্যের রুচি বৃদ্ধি করে থাকে। এ থেকে বুঝা যায় যে, লোকচিকিৎসা যুগ যুগ ধরে ধর্ম-কাল-স্থান ভেদে এর ব্যবহার বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবহার হয়ে আসছে। বর্তমানকালেও এ চিকিৎসা পদ্ধতির দরবারে পানি পড়ার জন্য, তাবিজ-কবচ করার, ঝাড়-ফুঁক দেয়ার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন মুরীদ-মুরীদানের লাইন ধরে অপেক্ষা করে। হঠাৎ করে শিশু পীর কিংবা মহিলা পীর কিংবা তেলেসমাতি দেখানো প্রত্যাশীদের ভিড় জমে উঠে। সাধু-সন্ন্যাসীদের আস্তানাতেও অনুরূপ অবস্থা লক্ষণীয়।

এছাড়া মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানসহ বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগুরুদের নিকটও তেলপড়া, পানিপড়া, সুতাপড়া, তন্ত্র-মন্ত্র, টোটকা-টোনা, ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচ বড়ো আস্থার সাথে বিশ্বাস করে মানুষ এসব গ্রহণ করে থাকে। প্রাচীনকাল হতে এ অবস্থা চলে আসছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জাতি উপজাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে লোকচিকিৎসার ব্যবহার ও পেশা হিসেবে গ্রহণ লক্ষণীয়। বিশেষ করে বেদে সম্প্রদায় এ পেশার সাথে সরাসরি জড়িত। শ্রেণী বিভাজন অনুসারে এরা এ পেশার সাথে জড়িত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসার ধারক ও বাহক হিসেবে কিছু মানুষ বিভিন্ন নামে ও পদবীতে এ পেশার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরা হলো-কবিরাজ, হেকিম, বৈদ্য, ওঝা, মোল্লা, মুন্সী, ধন্বতরী, সন্ন্যাসী, সাধু, পীর, দরবেশ।

আমরা লোকচিকিৎসার ইতিহাসের কিছু নিদর্শন দেখতে পাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কাব্যদর্পণে। ষোল শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য হিন্দু সমাজের একটি শ্রেণিকে এ পেশার সাথে জড়িত থাকতে দেখি। এদেরকে সমাজে বৈদ্য নামে সম্বোধন করা হতো।

"উঠিয়া প্রভাত কালে উর্দ্ধ ফোটা করি ভালে
বসন মণ্ডিত করি শিরে।
পরিয়া লোহিত ধুতি কাঁদে করি খুঙ্গি পুঁথি
গুজরাটে বৈদ্যজনে ফিরে।"

লোকসমাজে কিছু কিছু অসুখ-বিসুখ রয়েছে, তা নির্ণয় করতে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। কিন্তু এক্ষেত্রে কবিরাজ ও বৈদ্যেরা সফলতা দেখিয়েছে গর্ব করার মতোই। যেমন-ভূত, প্রেত, দেব-দানব, জিন ইত্যাদি দ্বারা অনেক সময় মানুষ আক্রান্ত হয় বলে এক প্রকার লোকবিশ্বাস মানুষের মধ্যে কাজ করে। এ সকল অসুখ সারাতে কবিরাজেরা নানা প্রকার তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, দোয়া-কালাম ও গাছ-গাছড়ার ওষুধপথ্য দিয়ে রোগীকে ক্রমে ক্রমে সারিয়ে তোলেন। এ ধরনের চিকিৎসা করতে গিয়ে কবিরাজরা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত একটানা চিকিৎসা করে থাকেন।

বলা বাহুল্য বহুকালপূর্ব হতে লোকচিকিৎসকগণ দেশীয় গাছ-গাছড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র ও ঝাড়-ফুঁক দ্বারা চিকিৎসা করে আসছেন। তাঁরা বিভিন্ন গাছ গাছড়ার লতা-পাতা, শিকড়-বাকড়, ছাল-বাকল, বীজ-গুল্ম দিয়ে পাঁচন, ক্বাথ, মলম ও বড়ি তৈরি করে ঝোলায় ভরে চিকিৎসা করে বেড়াতেন। রোগ নির্ণয় করে তাঁরা এসব ওষুধ খাওয়ানোর জন্য রোগীকে দিতেন।

লোকচিকিৎসার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গর্ভবতী মহিলার সন্তান প্রসবে, সর্পবিষ সংহরণে, কুকুর ও পোকামাকড়ের দংশন যন্ত্রণা বিনাশে, অশুভ জিন-ভূতের আসর থেকে রক্ষা করতে, ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগাতে, পেটের পীড়া সারাতে, শিশু ও নারীদের বিশেষ বিশেষ রোগ নিরাময়ে ওঝা ও কবিরাজদের ওষুধপথ্য ছিল নির্ভরতার প্রতীক। আজও এ সকল রোগ নিরাময়ে ওঝা ও কবিরাজের প্রভাব বিদ্যমান।

লোকচিকিৎসার শ্রেণিবিভাগ

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে লোকচিকিৎসার উদ্ভব ও প্রসার ঘটেছে। যা আমরা প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বাস করে সেই পদ্ধতিতে চিকিৎসা সেবা নিয়ে বর্তমানের দোড় গোড়ায় এসে পৌঁছেছি। তবুও আধুনিক চিকিৎসার ভিড়ে এই প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি অমলিন অবস্থায় রয়েছে। কেন না এটিকে এলাকার মানুষ বা

www.pathagar.com

কবিরাজরা পেশা হিসেবে নেয় না। শুধুমাত্র মানুষের সেবা করার মানসিকতা থেকেই এই চিকিৎসা করে। এই লোকচিকিৎসাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. গাছ-গাছালি দ্বারা
২. ঝাড়-ফুঁক,
৩. মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদি।

তবে আমরা নবাবগঞ্জের লোকচিকিৎসায় ভিন্নতা লক্ষ্য করি। এখানে জিন চিকিৎসা বা মন্ত্র দ্বারা চিকিৎসার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করি। যা ক্ষেত্র সমীক্ষায় সংগৃহীত তথ্যে দেখানোর চেষ্টা করেছি।

লোকচিকিৎসা মন্ত্র

[মহিলা থনের (স্তনের) ব্যাথা নিরসনে মন্ত্রের সঙ্গে চেরার (কেঁচোর) মাটি স্তনের চারিদিকে লাগিয়ে দিতে হবে। দিনে তিনবার।]

ঠনকো ঠনকো যাবর ঠনকো
কেদর পাল বিষের হাড়ি
আগে গরু পাছে শিষ
মুই ঝারে লাভাছু
কনকান ঠানকোর বিষ।
চেরার মাটি এরা-গেরা
বিষ ঝাড়ে নামাও মুই
কদমতলা।
ধাকে ধা গুরুলের হান্ধারে বিষ
পাতালপুরি যা।
এ কথা হেলাপে ফেলাশো
দুয়াই ইশ্বর মহাদেবের মাথা দুই পা মুছিব।
আকাশে লুচু-পুচু পাতালে ভাসে শিয়া
আইজ হতে ফান্নির ঠনকোর বিষ যহমত
স্বর্গে ধা।
চিরি বিরি বিন্নার থোপ ....।

সতিষ মন্ত্র

কানি মুনি কানি গেল হাট
হাটত যায়া কিনে আনিল ধকর সিংহের খাট,
ধকর সিংরে খাট পায় গড়ায় দিলে গাঁ।
বাসি জল বা ধানের বাড়ি
তাক খায়া বসে রহব তেমাথার উপর
যে মাগি যাবে নেঙ্গিয়া-ডাঙ্গিয়া
তার বাড়ি যাবো নিশ্চয় করিয়া
যে মাগি যাবে খেচিয়া মারিয়া

www.pathagar.com

তার বাড়ি যাবো তুই হাসিয়া খেলিয়া
ফের কানি মুনি কানি গেল হাট
কিনে আনিল ধকর সিংহের খাট
কানি গেল ঘরে ঘরে মনি গেল হাট
আইজ হতে ফান্নির কলনের কান্দান-মন্দনি
চোখবান ঠকরনি বন্ধে ছান্ধে লে যাবতি
স্বর্গত লাগিয়া।
নিরাই চৈতন্যর বেটি, তোর জনমের কথা
মুই দিছু কহিয়া, বাপ হলো ঋষি বুড়া
মা হলো ঋষি আনি–
এই কথা হেলাবো, ফেলাবো, দোহাই
ঋষি–ঋষিয়ানির মাথা খাব।
সনজন চুল মথিরণ দাত, হাত বেকা
পা বেকা বেকা সর্বগা–হাত, নাহি পাও নাহি
শুনবার নাহি ফান আইজ হতে ফান্নি–
দোষ-ছষির বাহান ছাড়িয়া স্বর্গ কয় ধ্যাইয়ান ॥

ক. জিন চিকিৎসা

ক্ষেত্রসমীক্ষায় সংগৃহীত চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে জিন চিকিৎসা অন্যতম। এখানে যে প্রধান বিষয় লক্ষ্য করার মতো তা হলো পুরোপুরি জিন দ্বারা চিকিৎসা, গাছ-পালার ডাল, শিকড় পর্যন্তও জিন এনে দেয়। এতে কবিরাজের কিছু করতে হয় না। এখানে আর একটি বিষয় প্রত্যক্ষ করেছি তা হলো সরাসরি জিন কবিরাজের গায়ে ভর করার কসরত দেখেছি। যা সত্যিই অভাবনীয় এই জিন চিকিৎসা সম্পর্কে নিম্নে বর্নিত হলো-

জিন চিকিৎসা উপকরণ

মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, কুরআন শরীফের আয়াত/সুরা, তাবিজ-কবজ, নিমের ডাল ইত্যাদি।

প্রথম পদ্ধতি

প্রথমে হাত চালিয়ে দেখেন রোগীর গায়ে জিন আছে কিনা? যদি জিন থাকে তবে কবিরাজের হাত রোগীর হাতে পরে যাবে। আর যদি না থাকে তাহলে হাত ডান বা বামে যাবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি

এই পর্যায়ে তিনি ঝাড়-ফুঁক করেন। মন্ত্র পড়ে পানি পরা দেন রোগীকে খাওয়ানোর জন্য অথবা গোসল করানো হয়। এরপরও জিন না নামলে নিমের পাতা দিয়ে রোগীর গায়ে ঝাড়া দেওয়া হয়। আর মন্ত্র পড়া হয়। মন্ত্র সাধারণত তিনবার পড়তে হয়। যদি

www.pathagar.com

তবুও কাজ না হয় এর অধিকবার পড়তে হয় ২০-৩০ মিনিট পর্যন্ত একই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। জিন নামানো বা তাড়ানোর গান নিম্নরূপ-

১. জল শুদ্ধ, ফল শুদ্ধ, ঘিয়ানের শুদ্ধ পানি কপিলারও দুগ্ধে শুদ্ধ রোগীর মস্তখানি এই মন্ত্র ৫০ বার বা তার বেশি বার পড়তে হয়।

২. এক বিলেতে চরেরে পাখি আর এক বিলে যায়
"ঘুরে যাওয়ার সময়রে পাখি ফাঁনদ লাগাবো পায়
যেমন তেমন ফাঁনদ নয়রে লোহার চাহিতে দড়
কোথায় আছে জিনের সর্দার টাইনে করবো জড়ো।"

জিনের গান

অনেক সময় ঝাড়-ফুঁকে কাজ না হলে জিনের গান করার মাধ্যমে জিন নামানো হয় বা তাড়ানো হয়। জিনের গান নিম্নরূপ-

৩. "ফুলে বন্দি, ফুলে বন্দি, ফুলে দিলাম টাঙ্গে।
আয় মা ডাকিনী-
আয় মা জিন গে
আয় মা কালী।"

চার-পাঁচজন মিলে এইসব গান করে থাকেন। একেকটা গান পাঁচ সাত মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আর এ গানটি করা হয় যখন জিন রোগীর সাথে ভর করে বা বিভিন্ন রকম খেলা করে। সেই গানটি নিম্নরূপ-

৪. "চলে আয় আয়রে ছাপা ডাকনের
খেল খেল খেলোরে ডাকিনী-খেল জানো না,
মায় ভালো কইরা করো খেলা, খেলা হলো না।"
আসন ভাইছা করো খেলা, দেখবে দশজনা"

জিন নামানোর শেষ সময়ে বলা হয়।

জিন তাড়ানো মন্ত্র

ওমরি গাছে তুমরিরে, সেহারা গাছে বাসা
মানুষ গরু খাওয়ার করিস আশা?
প্রথমে জন্মিলোরে দৈবকীর উদরে
বাবা মা রাখিলো নাম কানাই কানাই বলে।
কানাই বলে বলাই দাদা বুদ্ধি কেন হার?
সাত সমুদ্দুর পারে আছে গরুল স্মরণ করো
ঝাবড়ি, চণ্ডী, হলি স্বর্গের ঝি
এ মর্তে আইসে করবি কি?
গরিয়া ভরিয়া দিলাম সাগরের কূলে
সাগরের দুই আঙুল জল উথাল পাথাল

www.pathagar.com

ওরে জিন গে আছিস রোগীর অঙ্গে
আমার এই ঝাড়াতে যা
যদি যাইতে এদিক ওদিক করিস
রাম-লক্ষণ দুই ভাইয়ের মাথা কাইটা খা।
দোহাই কামরুক কামরুক্ষ্যা হাড় জিড়াইগ্যা।

ঝাঁড়-ফুক করে জিন আসলে বা জিন হাজির হলে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতে থাকেন যার ধরণ নিম্নরূপ-

প্রশ্ন : ক. তুমি কি আছ?
খ. তোমার মোকাম কোথায়?
গ. আসার কতদিন হলো?
ঘ. তুমি কেন এসেছ?
ঙ. এর কাছে তুমি থাকবে না যাবে?
চ. কেনো এসেছিলে? ইত্যাদি.................।

কবিরাজ এ রকম প্রশ্ন করতে থাকলে জিন তার উত্তর দিতে থাকে এভাবে। যেমন-

ক. ফুলবানু।
খ. বিলের নিচে (চুনাখালি)

তৃতীয় পদ্ধতি

যখন মন্ত্র ও গানে সফলতা আসে না (মন্ত্র ও গান কবিরাজের প্রাথমিক চিকিৎসা) তখন সাতপুরের মাটি একই নদীর সাত ঘাটের পানি এনে মন্ত্রসিদ্ধ করে বাড়ি বন্ধ করে দেয়া হয়। আর পানি ছিটিয়ে দিতে বলা হয়। তবে জিন চলে গেলো কিনা কবিরাজ আবার তা হাত চালিয়ে পরীক্ষা করেন। সাতপুরগুলো যেমন- ১. মহারাজপুর ২. লক্ষীপুর ৩. চকলামপুর ৪. লাহারপুর ৫. রামজীবনপুর ৬. পিয়ারাপুর ৭. রামচন্দ্রপুর।

নিষিদ্ধতা

এই সাত ঘাটের পানি তুলতে কোনো কথা বলা যাবে না। তবে যখন তখন পানি ওঠাতে পারবে।

জিন তাড়ানোর ঘটনা

এক নতুন বউকে জিনে ধরলে এই কবিরাজকে ডাক দেয়। ঐ রোগীকে এই কবিরাজ দুই দিন ধরে দেখেন এবং যখন দেখেন তখন স্বাভাবিক ছিলেন। তখন তিনি ঝাড়-ফুঁক করে জিন হাজির করে জিনের সাথে কথা বলেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর চান। আর এই বর্তমান চিকিৎসা করা হয় ১ ছেলের মা হওয়ার পর। প্রথমে চুনাখালীর মোড়ে স্কুলের পাশে দেখে মেয়েটিকে ভালো লেগে যায় জিনের। অনেক চিকিৎসা করার পরও জিন তাড়ানো যায়নি। যার ফলে শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে ভাব হয়ে যায় এবং স্বামী স্ত্রীর মতো সম্পর্ক হয়ে যায়। স্বামী

www.pathagar.com

বাইরে থাকা অবস্থায় এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বামী আসলে একদিন ছেলেটি দেখে যে তার স্ত্রী ঠিক অবস্থায় নেই আর তখন ছেলেটি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে তোমার এ অবস্থা কেন? কে এসেছিল তোমার কাছে? তখন মেয়েটি বলে তুমিইতো এ কাজ করেছ। এতে করে তাদের মধ্যে দ্বন্দের সৃষ্টি হয়। মেয়েটি বুঝতে পারে কিন্তু, রোধ করতে পারে না। অবশেষে তার স্বামীর কাছে তা স্বীকার করে নেয় যে, তার কাছে জিন আসে যেদিন কবিরাজ দেখে তার ২/৩ মাস পূর্ব থেকে এই কাজগুলো হয়। তারপর কবিরাজ প্রথমেই ডাল দিয়ে মন্ত্র পড়ে ঝাড়-ফুঁক করে জিন নামায়। যখন জিন আসে সেদিন কথোপকথন করে ছেড়ে দেয় এবং দ্বিতীয় দিন জিনকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাড়িয়ে দেয়। এরপর থেকে জিন রোগীর গায়ে আসতে পারে না। কেন না তারপর কবিরাজ রোগীর শরীর বন্ধ করে দিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে জিনের বোন কবিরাজের বাড়ি যাতায়াত করতে থাকে। সেই জিনের বোনের নাম ফুলবানু। এই ফুলবানু কবিরাজের বাড়ি যাতায়াত করলেও তার সঙ্গে কোনো গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। কবিরাজের মতে জিনেরা সকলেই ইসলাম ধর্মের হয়।

সফলতা

জিনের সাথে কবিরাজের কোনো যোগাযোগ নেই। তিনি যে খেলিয়ে জিন তাড়ান সেটি একান্তই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। তবে তিনি এ পর্যন্ত ব্যর্থ হননি। জিনের সাথে তাঁর শত্রুতার সৃষ্টি হয়। প্রথমে তাকে বিরক্ত করলেও তা পেরে ওঠেনি।

আমল

এই কবিরাজের মতে মিথ্যা কথা বলা যাবে না। মিথ্যা কথা বললে মন্ত্র কাজে লাগে না। তিনি বিশ্বাস করেন যে, সত্যের মধ্যে সকল ধর্ম নিহিত। আর প্রতি মাসের অমাবস্যাতে তিনি যে মন্ত্র দিয়ে কাজ সম্পন্ন করেন সেগুলো জাগান বা পাঠ করেন।

মন্ত্র জাগানোর নিয়ম

তিনি গভীর রাতে আগরবাতি, সিঁদুর, মোমবাতি, কিছু ফুল (জবা), কলা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে মন্ত্র জাগানো হয়। তিনি কোনো অটলে সাধনা করেন না। এই সময় কোনো ধর্মীয় ক্রিয়াকরণ করেন না। আর এই মন্ত্রের কারণে ধ্যান করেন না।

কানসাট বাগান বাড়ির কাঁচন বেগমের জিন তাড়ানো পদ্ধতি–

জিন তাড়ানোর উপাদান

তিনি সব রকম চিকিৎসায় কুরআন শরীফের আয়াত বা সুরা দিয়ে কাজ করেন সুরা ইয়াসীন, সুরা বাক্বারাহ্, সুরা রহমান, সুরা জিন অন্যতম। একুশ রকম ফুল, পানি, দুধ লাগে।

চিকিৎসা পদ্ধতি

রোগী আসলে তিনি জিনের মাধ্যমে চিকিৎসা করে থাকেন। কেন না তিনি জিন থেকে রোগী দেখলেই বুঝতে পারেন রোগীর গায়ে জিন ভর করেছে কিনা? তিনি সুরা ইয়াসীন, সুরা বাক্বারাহ্, সুরা রহমান পড়ে ৩ বার ফুঁ দেন দুধে/পানিতে। তাতে একুশ

www.pathagar.com

রকম ফুল প্রয়োজন হয়। যা দিয়ে রোগীকে গোসল করাতে হয়। রোগী কবিরাজের দেয়া দুধ/পানি দিয়ে গোসল করলে ১২ টার সময় রোগীর সাথে জিন দেখা করেন। সর্বোচ্চ ১ মাসের মধ্যে রোগী ভালো হয়ে যায়। রোগী আসলে প্রথমেই তিনি ভালো জিন দিয়ে রোগ সারানোর চেষ্টা করেন। তারপর ব্যর্থ হলে পূর্বের যে সব জিন আশ্রয় নিতে চেয়েছিল তাদের ডেকে নেন। জিনগুলো খারাপ থাকায় বাড়িতে স্থান না পেলেও কবিরাজ ডাক দিলে রোগ সারিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন এবং ফিরেও যায় নিজের ইচ্ছায়। তবে জিন কর্তৃক নির্ধারিত ১ টাকা নিতে হয় এর ১/২ টাকা মানুষকে দান করে দিতে হয়। তবে টাকা নেয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। মানুষ খুশি করে যা দেন তাই নেন। দেখার সময় ১ টাকা করে দিতে হয়।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা

বাগান বাড়িতে গেলে তাকে জিনে ধরে। জিন ধরলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন তবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো তার সাথে যে জিন থাকে গোদাগাড়ি গ্রামে অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়েন। কবিরাজ নামাজ কালাম পড়া ছেড়ে দিলে কু-স্বপ্ন দেখিয়ে সাবধান করে থাকেন। তার বিবাহের পর বড়ো মেয়ের বয়স ১-২ বছর হলে তাকে জ্বালাতে থাকে। জিন হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়েরই আছে। কবিরাজের গায়ে অবস্থিত জিন ভালো বলে অন্য কবিরাজরা তা নিজের শরীরে টানতে থাকে। শরীরে যে ভালো জিন আছে তখন প্রতিবাদ করতে থাকে এতে কবিরাজ ও জিনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। জিন ও অন্য কবিরাজদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে কবিরাজের পরিবারের মানুষদের ক্ষতি করতে চায় কিন্তু জিনদের কারণে তা আর হয়ে ওঠে না। তবে কবিরাজের মধ্যে সব সময় জিন শক্তি কাজ করে। যেখানেই তার কথা বলা হোকনা কেন তা তিনি বলতে পারেন। আর বিপদ আসলেও তিনি বলতে পারেন। রোগীরা যেখানেই থাক রোগীর অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন। জিনরা থাকার ফলে তার সংসারে উন্নতি হয়েছে।

রোগীকে কেন্দ্র করে দুই কবিরাজের দ্বন্দ্ব

রোগীর মামাশ্বশুর আর এক কবিরাজ। এক কবিরাজ তার নিজের বোনের পায়খানা আটকে রাখলে সে মরার মতো হয়ে যায় এবং কবিরাজ কাঁচন বেগমকে ডাকলে সেই কবিরাজ সেখানে যেতে নিষেধ করে। কিন্তু, তারপরেও গেলে এই কবিরাজকে হুমকি দেয়। ঐ কবিরাজের কালি সাধন করা ছিল বলে ভাস/মৌমাছিরূপে এই কবিরাজের বাড়িতে পাঠালে তিনি বুঝতে পারেন এবং এই জিন চলে যায় এরপর কালিকে খড়্গ হস্তে/হাসিয়াসহ পাঠালে আবারও ভয়ে চলে যায়। তারপর তিনি তার স্বামীকে বলে পাঠান যে তোমার বৌমা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তারপর আসলে তিনি সব স্বীকার করে নেন। পরে তিনি জুলুম নামক জিনকে বেঁধে রাখেন। তারপর এই কবিরাজ যেখানে যান তিনি সেখানে যান না।

আমল

তিনি মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। তিনি পরের উপকারে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। ১৭ বছর যাবৎ তিনি চিকিৎসা করে আসছেন।

www.pathagar.com

গোমস্তাপুরের আফাজুর জিন চিকিৎসা পদ্ধতি

উপাদান : কুরআন শরীফের আয়াত, মন্ত্র ইত্যাদি।

পরী ধরা

জিন বা পরী ধরা রোগীদের চিকিৎসা করার জন্য প্রথমে তিনি পরীকে মন্ত্রের মাধ্যমে ডাকেন। মন্ত্রটি এ রকম-

"আমি কবিরাজ জিন, কালি সাধন হইয়া।
অমুকের গায়ের জিন পরীকে ডাকছি
থানছার, মানছার, আর শ্বশান ছাড় জলদি আইসা অমুকের গায়ে ভর কর।
যদি না আসিস ৩০ কোটি দেবতার মুণ্ডু কাইটা খাস
দোহাই থাকল তোকে আল্লাহ্ রসুলের জলদি আইসা ভর কর।"

এরপর পরী আসলে কবিরাজ বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতে থাকেন। প্রশ্নগুলো নিম্নে দেয়া হলো-

১. কেন ধরলে?
২. কোথা থেকে এসেছ?
৩. কোথায় তোমার মোকাম?
৪. তুমি ছেড়ে যাবে কি না? ইত্যাদি।

মন্ত্র পাঠ করেও যদি জিন তাড়ানো না যায় তাহলে তিনি সুরা এখলাস তিনবার ও সুরা জিন পাঠ করে রোগীর গায়ে ফুঁ দিলে কিংবা তাবিজ আকারে দিলে ভালো হয়ে যায়। তবে জিন রাগ করলে কবিরাজের সমস্যা হয়।

নাচোলের বেদরা বেওয়ার চিকিৎসা পদ্ধতি

চিকিৎসার উপাদান : এই কবিরাজের জিন চিকিৎসার পদ্ধতি হলো মন্ত্র ও নিজের নিয়মিত আমল।

চিকিৎসা পদ্ধতি : তিনি মন্ত্র পাঠ করে জিন হাজির করেন।

তাঁর মন্ত্রটি এরকম-

"কোথায় রহিলা কেশবতী
কোথায় রহিলা গোলাপজান সুন্দরী
কোথায় রহিলা মোহন ল্যাংড়া
কোথায় রহিলা শীত বসন্ত
তাড়াতাড়ি মোকাম ছাড়
তাড়াতাড়ি আইসো।"

এছাড়া তিনি আর কিছু করেন না।

আমল

মিথ্যা কথা বলা যাবে না, নামাজ কালাম পড়তে হবে। তিনি দোয়া আমল করতেন **"লাকাত জুকুম রাসূল উম।"** অর্থ্যাৎ আল্লাহী রসূল।

www.pathagar.com

শ্রীরামপুরের ছায়দা বিবির পদ্ধতি

উপকরণ

নতুন গামছা, নতুন হাড়ি, চিনি, কলা, মিষ্টি, সাত রকমের খাবার, কুরআন শরীফের আয়াত, গাছের শিকড়।

চিকিৎসা পদ্ধতি

প্রথমে তিনি হাত চালিয়ে পরীক্ষা করে নিয়ে জিনকে রোগীর গায়ে হাজির করেন। জিন হাজির করার জন্য তিনি সুরা ফাতিহা ৩ বার, সুরা এখলাস, সুরা নাস, সুরা জিন, সুরা রহমান ইত্যাদি পড়েন। এরপর তিনি নতুন গামছা, নতুন হাড়ি, চিনি, কলা, মিষ্টি, সাত রকমের খাবার নৌকা বানিয়ে হাড়িতে করে জিনকে ভাসিয়ে দেন। যদি তুলারাশি মহিলা থাকে তাহলে তার গায়ে লেগে যায়। এরপর তিনি কুরআন শরীফের আয়াত দিয়ে ও গাছ গাছালি দিয়ে তাবিজ দেন।

গোমস্তাপুরের আক্তারা খাতুন এর চিকিৎসা পদ্ধতি

উপকরণ

জিনের মাধ্যমে চিকিৎসা করেন। জিন নিজেই সবকিছুর ওষুধ এনে দেন। আল কুরআন শরীফের আয়াত দিয়ে চিকিৎসা করেন।

চিকিৎসা পদ্ধতি

রোগী আসলে তিনি আসরের নামাজ পড়ে দোয়া করেন। আর তিনি "আয়তুল কুরসী" পড়ে দোয়া করেন। তিনি পুরোপুরি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কাজ করেন। কবিরাজ তুলারাশি। জিন কবিরাজের উপর ভর করে সকল চিকিৎসা পদ্ধতি বলে দেন। জিন বলে দেয় কি পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতে হবে। সে অনুযায়ী তিনি প্রথমে তেল ও পানি পড়ে দেন দিনে ৩ বার মালিশ করার জন্য ও খাবার জন্য এবং নিমের ডাল দিয়ে ঝাড়েন।

কবিরাজের জিনে ভর

ছোটবেলায় শ্যামপুরে নৌকায় করে বেড়াতে গেলে নদীতে শুশুক দেখে ভয় করলে তাকে জিনে ভর করে। ছোটোবেলা থেকে জিনে ধরলেও সেটা কোনো দিন প্রকাশ পায়নি তবে যখন থেকে তাকে জিনে ধরেছিল তখন থেকে তার মাথা ব্যাথা ছিল। বিবাহের পর তা আরও বেড়ে যায়। আর তখন তিনি ধানছুড়া গ্রামের সাইদুর হাজীর বাড়ি যান। তিনি ঝাড়-ফুঁক করলেও কোনো ফল হয় না এবং তা আরো বেড়ে যায় এবং তিনি টানা ৩ মাস পাগল হয়েছিলেন। জিনে ভর করার জন্যই তিনি পাগল হয়েছিলেন। তবে জিনদের দাবি ছিল যে, তাকে চিকিৎসা করতে হবে। এরপর তিনি রোগী দেখতে শুরু করেন। তবে এটা যদি তিনি ছেড়ে দেন তাহলে আবার তাকে আগের অবস্থায় নিয়ে যাবে। তার কাছে হিন্দু ও মুসলিম দুই ধরনের জিনই আছে। কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না আবার তিনিও কারও ক্ষতি করেন না।

www.pathagar.com

সফলতা

রোগীর কাছে নেয়া টাকা থেকে কিছু দান করে দিতে হয়। তিনি কারও কোনো ক্ষতি করেন না। তিনি নিয়মিত নামাজ ও কুরআন শরীফ পড়েন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার জন্য। সফলতা ১০০%।

শিবগঞ্জের মোজাম্মেল হকের চিকিৎসা পদ্ধতি

চিকিৎসার উপকরণ : তেল, পানি, কুরআনের আয়াত, তাবিজ-কবজ ইত্যাদি ব্যবহার করেন।

চিকিৎসা পদ্ধতি

জিন চিকিৎসার শুরুতে তিনি তেল ও পানি পড়ে দেন ব্যবহারের জন্য। তিনি আয়তুল কুরসী ১-৩ সুরা আহাদ নামা থেকে এক আয়াত দিয়ে তাবিজ দিলে জিন চলে যায়। এই তাবিজ কমপক্ষে এক বছর থাকতে হয়। আবার তেল ও পানিতে আয়াতুল কুরসী পড়ে ফুঁ দিয়ে দিলে পানি একবার খাবে বাকীগুলো দিয়ে গোসল করবে। আর তেল রাত্রে মালিশ করে ঘুমাবে। এভাবে ৩/৯ দিন করতে হবে। আবার যদি জিন বেয়াড়া হয় তাহলে সুরা জিন ৩ বার পড়ে রোগীর গায়ে ফুঁ দিলে জিন চলে যায়। তবে এ পর্যন্ত তাকে কোনো জিন আক্রমন করেনি।

কিভাবে তাকে জিনে ধরে

যখন তিনি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়েন তখন থেকে জিন রোগে ভুগছিলেন। তখন তিনি ৬ মাস ল্যাংড়া অবস্থায় ছিলেন। পরে তিনি শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্ (রঃ) এর মাজারের খাদেমের চিকিৎসায় ভালো হয়ে যান।

আমল

তিনি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কাজ করেন। তবে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে পড়েন ও হালকা জিকির কনে। মিথ্যা কথা বলেন না, কারও কোনো রকম ক্ষতি করেন না। তাঁর মতে এসব করলে আমল কেটে যায়। কেননা তিনি একজন মাজারের খাদেম। তিনি মানুষকে কোনো রকম দুঃখ দেন না।

নিষিদ্ধতা : এসব ক্ষেত্রে তিনি কোনো রকম টাকা পয়সা নেন না।

নাচোলের খাদিজা বেগমের চিকিৎসা পদ্ধতি

উপকরণ : জিন চিকিৎসার উপকরণ হিসেবে তিনি কুরআন শরীফের আয়াত ব্যবহার করেন।

জিন নামানো বা হাজির করা চিকিৎসা

রোগী আসলে প্রথমে তিনি পাটিতে বসেন এবং আগরবাতি জ্বালান। পাটিতে বসতে তিনি সুরা আল ইমরানের" ২৮ নম্বর আয়াত ৩ বার পড়েন। এরপর "সুরা জিন" ৭ আয়াত পড়তে পড়তে জিন চলে আসে এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তখন তার কোনো চেতনা থাকে না। জিন রোগীর চিকিৎসা করে দিয়ে চলে যান। আর যাবার সময় **"সুবহানার কুদরত"** বলে যায়।

www.pathagar.com

জিন বশে আনা

জিনকে বশে আনতে হলে অযু করে ওয়াক্ত নামাজ এবং জামাতের নামাজ পড়তে হবে। যোহর ও এশার নামাজের পর "সুরা জিন" পড়তে হবে ৩ বার। ১০ দিন হলুদ, মরিচ খাওয়া যাবে না মিথ্যা কথা বলা যাবে না। নেশা ও নাচ গান করা যাবে না। ৩৯ দিনের রাত্রে এশার নামাজে যাবার সময় গোসল করতে হবে। তারপর নামাজ পড়ে কুরআন শরীফ নিয়ে মাঠে যেতে হবে। মাঠে বসে হাত যতদূর যায় আঙুল না তুলে দাগ কাটতে হবে উল্লেখ্য যে, সে মাঠ থেকে কোনো না কোনো শব্দ শুনতে পাবে। এরপর কুরআন শরীফ থেকে "সুরা জিন" ২১ বার পাঠ করতে হবে। মোমবাতি জ্বালিয়ে দাগ কাটতে হবে শাহদাৎ আঙুল দিয়ে ২১ বার পড়ে শেষ পথে বিভিন্নরূপে জিন পরীক্ষা করবে। জিন সাপ, বাঘ ও বিভিন্নরূপে ভয় দেখাবে। তখন ভয় না পেয়ে ধৈর্য্য ধরে বসে থাকতে হবে। দাগের ভিতর থেকে ১০১ রকমের পরীক্ষা করতে হবে। পরীক্ষা শেষে জিনের বাদশা মুকুট পড়ে থাকবে তখন বলতে হবে আমি তোমার সাগরেদ হতে চাই কিন্তু আমার কথা মতো তোমাকে চলতে হবে। এরপর জিন বশে থাকবে।

কবিরাজের কাছে জিন আসা

কবিরাজের নানীর কাছে জিন ছিল। কবিরাজের বয়স যখন ১.৫ বছর তখন তার মা মারা যায়। তখন তাকে ৭ দিনের জন্য জিন পানির ভিতরে নিয়ে যায়। ছোটোবেলা থেকেই জিন তাকে বিভিন্ন উপায়ে চিকিৎসা করাতেন।

পালনীয় : তিনি শুক্র, শনি, সোম, ও বুধবার রোগী দেখেন। রবিবার তিনি রোগী দেখেন না।

সফলতা : কবিরাজের সফলতা ৯০%।

কসবার মাড়িয়া বেগমের চিকিৎসা পদ্ধতি

উপকরণ : কুরআন শরীফের আয়াত প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেন।

জিনের চিকিৎসা

তিনি রোগীকে সুরা জিন, সুরা এখলাস পড়ে ফুঁ দিলে জিন চলে যায়।

জিন আসে যেভাবে

৪০ বছর ধরে জিন তাঁর সাথে থাকে। ভারতে সদা নদীতে গোসল করতে গেলে জিন তাকে আসর করে। তাঁর গায়ে জিন থাকলে তাঁর কোনো জবান থাকে না। তাঁর কাছে হিন্দু বা মুসলিম দুই ধরনের জিনই থাকে। তবে একটি আসলে অন্যটি আসে না।

আমল : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন নিয়মিত।

সফলতা : কবিরাজের সফলতা ৮০%।

www.pathagar.com

বিশ্বাস পাড়ার ফুরাহা বেগমের চিকিৎসা পদ্ধতি

উপকরণ

গাছের ডাল ও কুরআন শরীফের আয়াত বা সুরা দিয়ে চিকিৎসা করেন।

চিকিৎসা পদ্ধতি

রোগী তাঁর কাছে আসলে জিনের মাধ্যমে সবকিছু বলে দেয়। তিনি সুরা বাকারাহ, সুরা নাস পাঠ করেন।

নাচলের জোসনা বেগমের চিকিৎসা পদ্ধতি

চিকিৎসা পদ্ধতি

প্রথমে তিনি জায়নামাজের উপরে ১০ টাকা এবং ১ গ্লাস পানি নিয়ে বসেন। আর পানিতে সুরা পড়ে ফুঁ দিলে বুঝতে পারেন কি অসুস্থতা তার মধ্যে। সুরা জিন এর ২৪ আয়াত, সুরা আল ইমরানের ১ আয়াত পড়ে পানিতে ৩ বার ফুঁ দেন। এরপর জিনেরা তাঁকে থাইমূল, মীনথর, ক্যাম্পার, জাফরান এসব গাছ দিয়ে সিরাপ তৈরি করে দেন রোগীর সেবনের জন্য।

সফলতা : ২০ বছর যাবৎ চিকিৎসা করেন। কবিরাজের সফলতা ১০০% ।

দাউদপুরের খাদেমুল ইসলামের চিকিৎসা পদ্ধতি

চিকিৎসার উপকরণ

কুরআনের আয়াত, গাছ গাছরা বা ভেষজ চিকিৎসা করেন।

চিকিৎসা পদ্ধতি

কবিরাজ রোগীকে দেখলেই বুঝতে পারেন অর্থাৎ তিনি নিজের দর্শন থেকে বলতে পারেন রোগীকে জিনে ভর করেছে কি না? তার কাছে জিন নেই কিন্তু তিনি জিন নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসেন। জিনের সাথে খেলেন। জিকির করেন, আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখেন এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি মাছ মাংস খান না। তিনি নিজের বাড়িতে বসে থেকে ঝেড়ে দিলে রোগী ভালো হয়ে যায়। তিনি অধ্যাত্মিক মাধ্যমে অনেকটা চিকিৎসা করেন। তিনি নিজেই ওষুধ তৈরি করেন।

আমল

১. তিনি ৪০ দিন যাবৎ যত খুশি তত বার করে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম। ইয়া ওয়াহিদুল বাকীর ওয়ারে কুল্লে শাইয়িন কাদির।"

২. "ইয়া ওয়াহিদুল বাকীর আওয়ালে কুল্লে আখিরীহ।"

রাতে ১১-১২ টার সময় ৪০ দিন এটিও আমল করেছেন। তিনি সোমবার দিবাগত রাত ও বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে আমল করলে সমস্যা হয় না। তিনি সব কাজ দিনে করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ ও রাসুল ছাড়া কোনো কাজ হয় না। তিনি মানুষের সেবায় নিয়োজিত। তাঁর কাছে রোগী আসলে প্রথমে তিনি সুস্থ করে বাড়ি পাঠান। তারপর তিনি ওষুধ দেন। তিনি কখনও নিজেকে ঝামেলায় জড়ান না।

www.pathagar.com

নামুনিমগাছির মোজাম্মেল হক চিকিৎস্যা পদ্ধতি

জিন তাড়ানোর উপাদান : কুরআন শরীফের বিভিন্ন সুরা কিংবা আয়াত ব্যবহার করেন। আজ্জার গাছ, দুধ, চিনি, পানি, তেল ইত্যাদি।

চিকিৎসা পদ্ধতি

জিনে ধরা রোগী তার কাছে আসলে প্রথমে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন এবং বুঝতে পারেন তার কাছে কি ধরনের জিন আছে। সুরা ফাতিহা এবং এখলাস পড়ে রোগীর শরীরে ফুঁ দেন ফলে জিন হাজির হয়। তখন রোগীকে প্রশ্ন করেন। তুমি এ রোগীকে ছাড়বে কি না ? কোথায় থেকে এসেছে? ইত্যাদি। তারপর কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দিয়ে পানি পড়া দেন। তেল পড়ে গায়ে ছিটিয়ে দেন। ফলে রোগী সুস্থ হয়ে যায়।

এই কবিরাজের দেহে যে জিন আছে তা তার নানীর' শরীর থেকে এসেছে ১৯৮০ সালে। তার নানী মারা যাওয়ার পর কবিরাজের শরীরে আসা শুরু করেন। প্রথম সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার ফলে বাড়ি অপবিত্র ছিল । তাই কবিরাজকে ৬ মাসের জন্য পাগল অবস্থায় রাখল। তখন তাকে স্বপ্নে বলে মানুষের উপকার কর তবে ভালো হবি। ৬ মাস পর জিনেরা পাগল থেকে ভালো করে দিল এবং তখন থেকেই মানুষের জিন ধরলে তার চিকিৎসা করান। তার শরীরে ২০টির মতো জিন আছে। এসব জিন হিন্দু এবং মুসলমান।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা

কবিরাজের স্ত্রী গর্ভবতী থাকাকালীন অবস্থায় বলেছে আমার পা ব্যাথ্যা করছে। তখন কবিরাজ তার স্ত্রীকে অজ্ঞাতভাবে বলেছে আমি তোমার পায়ে ফুঁ দিব কিন্তু অন্য সমস্যা হতে পারে। ফুঁ দেওয়ার ফলে তার স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হয় এবং তার স্ত্রী ছেলে সন্তান প্রসব করলেন।

অলৌকিক ঘটনা

প্রথম যেদিন কবিরাজ শ্বশুর বাড়িতে ছিলেন সেদিন রাত ১০ টায় বাড়ির ছাদে একাই শুয়ে ছিলেন। শুয়ে থাকতে আধা ঘুম অবস্থায় দেখলেন উত্তর দিক থেকে একটি রথ ক্রমে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণের দিকে। সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে গেল। হঠাৎ সমুদ্রের পানি দু'ভাগ হয় গেল। তারপর রথসহ নিচের দিকে ঢুকে গেল। গিয়ে দেখলেন যে এই পৃথিবীর মতো অনেক চাকচিক্য ঘরবাড়ি। তখন এক লোক আসলেন তার দাঁত ১/১.৫ হাত লম্বা। সেখানকার পরীরা তাকে মিষ্টি খাওয়ার জন্য অনেক জোর করলেন কিন্তু তিনি খেলেন না। কবিরাজ জানেন সেখানে খাওয়া যাবে না কারণ খাওয়া দাওয়া করলে তাকে আসতে দেবে না। এরপর ফজরের আযানের সময় হতেই তাকে আবার পূর্বের জায়গায় নিয়ে আসল।

www.pathagar.com

পদ্মা জিন ধরলে

আজ্জার গাছ, দুধ, চিনি দিয়ে বেটে রোগীর গায়ে মাখতে হবে। ডাকিনী জিন ধরলে বিনয়ের সুরে কথা বলে জিনকে তাড়াতে হবে।

নামুনিমগাছির মোছা : ফুরেহা বেগম- এর পদ্ধতি

চিকিৎসার প্রয়োজনীয় উপকরন

জবা ফুল, আগরবাতি, কলা, ধুপ, উজান ভাটির পানি, সাত ঘাটের পানি, মিষ্টি, সরিষার তেল। ৭ ধাতুর তাবিজ এছাড়া কুরআনের আয়াত।

চিকিৎসা পদ্ধতি

প্রথম রোগী আসলে কবিরাজ জিনকে ডাকেন। ফলে জিন রোগী সম্পর্কে সব তথ্য বলে দেয়। এই জিন ডাকার গান নিম্নরূপ-

“ওরে জিন জিনের নবী
কোথায় আছে জিনের নবী
শীগগির কইরা আসরে
পরে আইসা মা ফাতেমা ডাকছি আমারে।”

জিন হাজির হলে জিনের দ্বারা রোগীর কি হয়েছে না হয়েছে সব শোনেন। এ সময় জিনকে বলার জন্য গান করেন গানটি নিম্নরুপ-

নাগ নাগিনী ভরা সাপীনিরে
আয়রে ওদের কি কি হইছেরে।
নাগিনী বল না তুমিরে ....
তাদের বাড়ি দলানা দালান
তুমি না বল জবানেরে
এই দুই তিন ও সৈন্য দিলাম
কয়টা বাংলার হরফরে
গেটের দরজা আসিতে সোজা
উত্তরণ দিকতো থেকে তোমরা আসিলেরে
এনা ছেলের কাছে পরী আসেরে
পড়া শুনা মাথায় টেনসান
সত্যিই কিনা বলরে ....।
মাঝে মাঝে পাগলার মতন
হয় কিনা বলরে........।
তোমার উপর রাগ রাগ করে
মেজাজ উগ্র সময় হয় ও রে ....।

www.pathagar.com

আমাদের গ্রুপের সদস্যরা যখন ঐ কবিরাজের কাছে উপস্থিত হয় তখন আমাদের এক সহপাঠীর শরীরে নাকি জিন আছে। তাই গানের বিবরণের মাধ্যমে বার বার জিজ্ঞাসা করছিল কবিরাজ।

কবিরাজের যখন ১০ বছর বয়সে বিয়ে হয়। তখন গায়ে হলুদের দিন বাড়ির বাইরে চৌরাস্তার মোড়ে কলে সাদা পোশাকধারী এক মহিলাকে দেখতে পান। এই মহিলা তার শরীরে ঢুকে যায়। তখন হুজুরের কাছে ফুঁ দিলে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে ইমাম সাহেবের স্মরণাপন্ন হয়েও কোনো ফল হয়নি বরং জিনেরা তাকে কোনো ক্ষতি করে না এবং তাকে মানুষের চিকিৎসা করাতে উৎসাহ দিতেন। তাই তখন থেকেই তিনি জিনে ধরা রোগীসহ অন্যান্য রোগীর চিকিৎসা করেন। ১৯৯৮ সাল থেকে করিরাজি পেশায় নিয়োজিত আছেন। সফলতার হার ৯০ শতাংশ।

আমল

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, মিথ্যা কথা বলেন না, নামাজ না পড়লে শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি করে। ১৩০ টির মতো জিন আছে। এরা বাড়ির আশেপাশেই থাকে। শুধু শিষ দিলেই হাজির হয়। নিয়মিত কুরাআন শরীফ পড়েন।

মাধ্যম জিনে ডাকার গান :

“ওরে জিন কোথায় নাগিন
আ আ আ রে আ আ..........রে।
কোথায় রইলি নাগিন ওরে....
কোথায় রইলি নাগিন রে........।
কিবা জিনসে আইসো নাগিন ই........রে।
ওরে নাগিন ওরে সাপিন।
ওরে নাগিন ওরে সাপিন মোর। আয়রে......।
ও..... ও.....ও.......আয়রে।”

খ. পীর চিকিৎসা

কালে কালে যুগে যুগে মানুষের পথ দেখানোর জন্য মহান আল্লাহ্ তাঁর দূত পাঠিয়েছেন। যাদের প্রত্যেকটি কথাই কাজে পরিণত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেকটিতে সফলতা লাভ করেছেন। তাঁরা এমনই সিদ্ধ ব্যক্তি যাদের মুখের কথাই সমস্ত অসুস্থতা কেটে যায়। তেমনি কারিশমাযুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি হলো পীর চিকিৎসা যা নিম্নে আলোচনা করা হলো–

আল্লাহ মহান। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি যুগে যুগে যখনই মানুষ বিপথগামী হয়েছে তখনই তাদের সুপথে আনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন কোনো না কোনোভাবে তাদের পরিচালিত করার জন্য। তেমনি পীররাও আল্লাহর দূত হিসবে প্রেরিত হয়েছে কালে কালে । আর তাদের দেখানো পথে চলেছে। অন্য মানুষ পীররা এতই আল্লাহ ভক্ত হন যে, তাঁরা যাই বলুক না কেনো তাই সত্যে পরিণত হয় । আর মানুষ ও তাদের মনের আশা পূরণের জন্য সেখানে যায়। তেমনি একটি মাজার শরীফ আছে

www.pathagar.com

ভোলাহাটে। যে মাজারটি শাবু শাহ্ মাজার নামে পরিচিত। কথিত আছে ২০০-৩০০ বছর আগে ইসলাম প্রচারের জন্য ইয়েমেন কিংবা বাগদাদ থেকে তিনি এসেছেন বলে ধারণা করা হয়। মাজারটির চারপাশ ঘেরা থাকলেও সেটি সব সময় তালাবন্ধ থাকে। সেখানে একটি পাথর আছে। যা কেউ চুরি করতে পারে না। এখানে কিছু মারফতের লোক আছে যারা প্রতি পৌষ মাঘ মাসে ওরস করে থাকে যেখানে সিরনি করে সবাইকে বিলিয়ে দেয়া হয়। আর সেই সাথে বেড়ে গেছে তাদের প্রভাব। যেহেতু তাদের সব জায়গাই কাজ হয় তাই আমরা সেটিকে পীর চিকিৎসা হিসেবে অবিহিত করি। এখানে প্রতি বৃহস্পতিবার মানত করা হয়। এখানে মানত অথবা মনের আশা পূরণের জন্য বাইরে থেকে লোকজন, এলাকাবাসীরাই বেশি এসে থাকে। আর এই লোকজন প্রতি বৃহস্পতিবারেই এখানে আসে।

উল্লেখযোগ্য কাহিনি

তিনি প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে বাগদাদ কিংবা ইয়েমেন থেকে এসেছেন। প্রথমে তিনি ভোলা হাটে আসেন। তখন প্রায় সব মানুষই হিন্দু ছিল। তিনি প্রথমে গৃহস্থের বাড়িতে কৃষান হিসেবে কাজ করতেন। একদিন ভোরে ধান সিদ্ধ করতে দিলে গৃহকর্তী দেখেন যে, তিনি তার পা চুলায় দিয়েছেন এবং সেগুলোই জ্বলছে। কোনো বিচালি বা খর ছাড়াই। যে দিন তিনি মারা যান, সেদিন মালদহের অনেক লোক বলেছিল যে, সেখানেও শাবু শাহ পীর কে দেখে এসেছেন। মূলতঃ তিনি বহুরুপী ছিলেন । তিনি একসাথে বহু জায়গায় বর্তমান ছিলেন।

- গোমস্তাপুরে আমীন পীর নামে মাজার রয়েছে, যেখানে বছরে ৩ বার ওরস হয়। বৈশাখের ৫ তারিখ, মাঘ মাসের ৫ তারিখ, আশ্বিন মাসের ২৯ তারিখ। তাছাড়াও প্রতি সপ্তাহে ওরস হয়। এই পীরের অনেক আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। যেকোনো অসুখ-বিসুখে তিনি হাত বুলিয়ে দিলে ভালো হয়ে যেত। এজন্য লোকজন বিভিন্ন স্থান থেকে তার মাজারে আসে মনঃকামনা পুরণ করার জন্য। এই এলাকায় ৪০০ মতো তরীকাপন্থী লোক আছে। এর মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাও কম নয়।
- তিনি নূর সাধন করতেন। মানুষের সেবা করতেন এবং অটলের সাধনা করতেন।
- আমীন পীরের মৃত্যু হয় ১৯৯৮ সালে। তিনি এদেশেরই সন্তান, তিনি ইসলাম প্রচার করতেন, তিনি সাদা কাফন পরে থাকতেন যা পাঁচ গজের ২.৫ গজ করে দুই থান মার্কিন কাপড়। সে কাপড়ে কোনো সেলাই করা থাকত না। তাঁর বড়ো বড়ো চুল ছিল । তার হাতে লোহার লাঠি থাকে। তিনি প্রথমে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন তবে তিনি ঈদের নামাজ পড়তেন না। তিনি কুরবানি করতে দিতেন না । তিনি এরকম বলতেন যে, "আজকে তুফান চলছে ব্যাটা, এটা আল্লাহ্ চাহে না।" তিনি কুরবানির দিন কিছু খান না। তিনি গাছের নিচে দিন রাত ধ্যান করতেন আর এভাবেই তিনি সিদ্ধি লাভ করেছেন। এরপর থেকে তিনি ঘরে বসে ধ্যান করেন। তিনি যেদিন

www.pathagar.com

মারা যান সেদিন বলেন যে, "আমি আজকে চলে যাবো ব্যাটা, বহু লোক নিতে এসেছেন"। তবে তিনি জীবনে কোনো দিন ওষুধ খাননি।

চিকিৎসা পদ্ধতি

কোনো রোগী এসে দোয়া চাইলে তিনি যদি বলেন "বাবা তুই চলে যা কাজ হয়ে যাবে" সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়ে যেত। কারো বন্ধ্যাত্ব হলে কান্নাকাটি করলে বাচ্চা হয়ে যেত। অর্থ্যাৎ তিনি যেটাই মুখ দিয়ে বলতেন আল্লাহ সেটাই কবুল করে নিতেন। লোকজন যে নিয়তে আসতো তাদের সেই সেই নিয়ত পূরণ হয়ে যেত। তার মুখের কথাই কাজ হয়ে যেত।

আমল

তিনি "আল্লাহুম্মা সাল্লিওয়ালা সাইয়াদিনা ওছিলাতে- মোহাম্মদ।" এটি তার আধ্যাত্মিক শক্তি। তিনি এটা পড়ে চিকিৎসা করতেন । পূনর্ভবা নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে তার পাকা মাজার আছে।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা

ঐ এলাকায় সব সময় বন্যা হয়। আর তিনি পানি দেখলেই বুঝতে পারতেন যে বন্যা হবে কি না। তিনি যদি বলেতেন এবার বন্যা হবে না তাহলে বন্যা হতো না। বিভিন্ন সময় বন্যা হলে অন্যান্য এলাকার কোনো চিহ্ন না থাকলেও তাঁর কবর কোনো রকম ভাঙ্গেনি। যদিও তখন কবরটি কাঁচা ছিল।

অলৌকিক ঘটনা

একদিন পূর্ণর্ভবা নদীর তীরে বৃষ্টির জন্য নামাজ পড়া হয়। তখন তিনি বলেন যে সেখানে গিয়ে লাভ নেই। তিনি বলেন, "মাওলানার কি বাপের পানি" তিনি হাত মুঠো করে আরো বলেন আমি পানি আটকে রেখেছি। এরপর তিনি বলেন ৭ দিন পরে আসিস। সাত দিন পর গেলে তিনি বলেন যে, ১-ন্যাকড়া নিয়ে আয় এবং ন্যাকড়া ঘারে নিয়ে বলেন,, "তোঁরা পানি লিবি তো বস আমি আসছি" তারপর তিনি পূনর্ভবা নদীতে ডুব দেন আর তখনই বৃষ্টি শুরু হয়। আর এক মুহূর্তে হাটু পানি হয়ে যায়।

গ. সাপে কাটা চিকিৎসা

মহান আল্লাহ্‌র ১৮,০০০ প্রজাতির সৃষ্টির মধ্যে সাপ প্রজাতি একটি। সাপের একটি অনবদ্য শক্তি হলো তাদের কামড়ে মানুষ মারা যায়। আর এদের কামড় থেকে পারিত্রানের এবং বিষ নামানোর জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতি বের হয়েছে। যা নবাবগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে প্রত্যক্ষ করি। আর সেই পদ্ধতিগুলোই নিম্নে বর্ণিত হলো-

বারঘড়িয়ার শ্রী দয়াল চন্দ্র সিংহের চিকিৎসা পদ্ধতি

উপাদান : গাছের শিকড় ও মন্ত্রের মাধ্যমে সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা করেন।

www.pathagar.com

চিকিৎসা পদ্ধতি

তিনি প্রথমে হাত চালিয়ে দেখেন যে, বিষ আছে কিনা? বিষ যেহেতু উর্ধ্বগামী হয় সেহেতু যতদূর পর্যন্ত বিষ আছে হাত ততদূর পর্যন্ত উঠবে। বিষ নিম্নগামী করার জন্য ঈশ্বর মূলের শিকড় খাওয়ানো হয়। যদি চিবিয়ে খাওয়ার শক্তি না থাকে তাহলে রস দুধের মধ্যে দিয়ে খাওয়ানো হয়। তারপর মন্ত্র পড়ে ঝাড়-ফুঁক করলে বিষ নেমে যায়। আর রোগী ভালো হয়ে যায় তারপর নামানোর মন্ত্র হলো–

মন্ত্র

"সাপ বলে সাপীনিরে শোন গোকূলের কথা।
পঞ্চ অবতার কৃষ্ণ জন্ম হইল কোথা?
জন্ম হইল কংস কারাগারে দৈবকীর উদরে।
বাবা মা রাখিল নাম কানাই কানাই বলে।
কানাই বলে বলাই দাদা বুদ্ধি কোন হার?
সাত সমুদ্রের পারে আছে গরুল স্মরণ কর।
গরুলের গরু কৃষ্ণ পাখায় দিল ভর।
নাচিতে খেলিতে গেলেন কালিদহের উপর।
গরুলের হুংকারে, পাখার ঝাড়নে সাগরের জলজে শুকাইল।
বেনুতে কানু দিল টান ষোলশ গোষ্ঠীনি তাঁরা দিল জোগান।
ওরে কালিয়া নাগ-নাগীনির বিষ যেই সাপের বিষ সেই সাপের কাছে যা।
দোহাই কামরুক কামরুখ্যা হার জিরাইগ্যা।
নাই এই বিষ বিষহরির আজ্ঞা।"

কথিত আছে, সাপের সাথে গরুল পাখি যুদ্ধ করেছিল বহু আগে। সেই থেকে গরুল পাখির নাম শুনলে বিষ নেমে যায় বলে ধারণা করা হয়। বিষ নামানোর আর একটি মন্ত্র হলো-

মন্ত্র

"সোনার সক্ষীনি, গরল মনকীনি
নাগিনার বিষ পাতালে নামাবো"

শিবগঞ্জের শ্রী চৈতন্য হালদার এর চিকিৎসা পদ্ধতি

চিকিৎসা পদ্ধতি

রোগী আসলে প্রথমে তিনি বাঁধন খুলে দেন। তারপর তিনি পানি পড়ে দেন এবং গাছের শিকড় খাইয়ে দেন। তিনি রোগী দেখলে বুঝতে পারেন সাপে কেটেছে কিনা?

সাপে কাটা রোগী মারা গেছে কিনা

সাপে কাটা রোগী ভালো করতে পারেন না। কিন্তু, রোগী মারা গেছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

www.pathagar.com

পদ্ধতি

এক নিঃশ্বাসে সুরা ফাতিহা ১ বার সুরা এখলাস ৩ বার পড়ে উবুদ নেংড়ার গাছে ফুঁ দিয়ে একটানে উপড়িয়ে ফেলিবে। যদি শিকড় ছিড়ে যায় তাহলে মনে করতে হবে রোগী মারা গেছে আর যদি শিকড় না ছিড়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে রোগী বেঁচে আছে।

চিকিৎসা-পদ্ধতি

প্রথমে তিনি রোগী সনাক্ত করেন। হাতে লজ্জাবতীর গাছ দিয়ে হাত চালান দেন। সেই গাছের ডাল, শিকড়, পাতা রোগীকে খাওয়াতে হবে। তবে "বিসমিল্লাহ্" বলে ওষুধ খাওয়ানো যাবে না। লজ্জাবতীর ডাল, পাতা, শিকড়, ৫০ গ্রাম চিনিসহ বেটে আম পাতার সাথে খাওয়াতে হবে।

শর্ত

তবে শর্ত হলো জীবনের বদলে জীবন দিতে হবে। কোনো টাকা নেন না। হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল ইত্যাদি যেকোনো প্রকার পশু দিতে হবে।

সফলতা : তার সফলতা ১০০%।

চিকিৎসা পদ্ধতি

প্রথমে তিনি হাত চালিয়ে দেখেন কতদূর বিষ উঠে গেছে। তিনি দূর্বা ঘাসের মাধ্যমে হাত চালান এবং মন্ত্র পড়েন। মন্ত্রটি নিম্নরূপ-

"হরম তালি করম তালি
চলরে হাত চলতে কালকূ সাপের
বিষ সেখানে চল
যদি হাত ডানে বায়ে যাস
দোহাই আল্লাহ নবীর
তোর বাপের মাথা খাস।"

রোগীকে সাপে কামড়ালে রোগীর নামসহ কবিরাজকে কামড়ানোর স্থান বলতে হয়। সাপে কামড়ালে আই/উরুতে মহিলাদের পেটিকোটের ফিতা দিয়ে বা চুল বাঁধার ফিতা দিয়ে বাঁধতে হয়। যদি বিষধর সাপে কামড়ায় তাহলে এমনও হতে পারে বিষের যন্ত্রনায় কামড়ানোর নিচের জায়গা কেটে যেতে পারে।

আচলি কারার নিয়ম

তিনি মন্ত্র ১ নিঃশ্বাসে পড়ে আঁচলি বা বিষ আটকিয়ে রাখেন।

মন্ত্র

"ছোটো গাছ, লম্বা ফেলে বীল
আইজ আছলি করলাম আমি
বিষ ঝাড়বো কাল।"

www.pathagar.com

তিনবার বলে হাতে ধুলা নিয়ে নিজের অঙ্গ বন্ধ করতে হবে। এতে রোগীর শরীর বন্ধ থাকে। তবে তার সাথে ছটফটি গাছের শিকড় ১টি নিয়ে পিষে ১ ছটাক চিনির সাথে মিশিয়ে ১ গ্লাস পানি দিয়ে খেতে হয়।

সাপ না কামড়ানোর উপায়

রাখাল পান গাছের শিকড় অল্প একটু শরীরের যেকোনো জায়গা কেটে রেখে দিতে হবে এবং পরে সেলাই করে দিতে হবে। তাতে করে আর সাপে কামড়াবে না।

সফলতা : তাঁর সফলতা ৯০%।

নামুনিমগাছির মোজাম্মেল হকের চিকিৎসা পদ্ধতি :

চিকিৎসার উপকরণ : পয়সা, পানি, চন্দ্রমূল, গোল মরিচ ইত্যাদি।

চিকিৎসা পদ্ধতি

তিনি প্রথমে হাত চালিয়ে পরীক্ষা করেন। তারপর পয়সা পানি দিয়ে ভিজিয়ে মুছে নেন এবং গায়ে লাগন। যে জায়গা ঠাণ্ডা থাকে সেখানে বিষ থাকে না আর যে জায়গা গরম থাকে সে জায়গায় বিষ আছে বুঝতে হবে। যে জায়গা পর্যন্ত বিষ আছে সে জায়গা পর্যন্ত বাধতে হবে এবং বিষ স্থানের বিভিন্ন অংশ কেটে বিষ রক্ত বের করে দিতে হবে। তারপর চন্দ্রমূল গাছ খাইয়ে দিতে হবে সোয়াটা গোল মরিচ দিয়ে। যদি গাছ মিষ্টি লাগে তাহলে বিষ থাকবে, সামান্য তিতা লাগলে বিষ নামতে শুরু করবে। আর বেশি তিতা লাগানও বিষ নেমে যায়। চিকিৎসার সময় রোগীকে পানি খাওয়াতে হয় না। যদি খাওয়ানো হয় তাহলে রোগী মারা যায়।

নাচোলের লোকমান হোসেনের চিকিৎসা পদ্ধতি

চিকিৎসার উপকরণ

সাপেকাটা রোগের জন্য গাছ-গাছালির শিকড়, ডালপালা ও কুরআন শরীফের আয়াত ও সুরা।

লক্ষণ

সাপে কাটলে ঐ স্থানসহ অনেকখানি জায়গা ফুলে যাবে।

চিকিৎসা পদ্ধতি

রোগীর গায়ে বিষ আছে কি না কবিরাজ তা দেখার জন্য হাত চালান আর এই হাত চালানোর জন্য সুরা এখলাস বিসমিল্লাহ্‌র সহিত পাঠ করতে হয় অনেকবার। তারপর জিয়ালা/জিগা গাছের ছাল ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিলে যদি ক্ষত স্থান জ্বলে ওঠে তাহলে বিষ আছে মনে করতে হবে। গোমা সাপ কাটলে রক্ত বের করা না গেলে ব্লেড দিয়ে কেটে লবণ লাগিয়ে দিলে রক্ত বের হয়ে যাবে। তবে বিষ নামানোর পর বাধন হঠাৎ খুলে দিলে রোগী মারা যেতে পারে। তাই আস্তে আস্তে বাধন ছেড়ে দিতে হবে। তিনি "সুরা ফাতিহা" ও ঢোল কলমি পাতার রস খাইয়ে বিষ নষ্ট করে দেন।

www.pathagar.com

সাপ ধরা

তাঁর মতে "সুরা ফাতিহা পাঠ করে সাপ ধরা যায়"।

চিকিৎসা পদ্ধতি

ঈশ্বর মূলের পাতা বা শিকড় রোগীকে খাইয়ে দিলে বিষ নষ্ট হয়ে যায়। তবে পাতার রস বেশি উপকার করে। তবে সেই রস রোগীর পেটের ভিতর যেতে হবে। যদি না যায় তা হলে বাঁচানো সম্ভব নয়। তবে সাপে কাটার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত স্থানে বেশ খানিক উপরে বাধন দিতে হবে।

সফলতা : এই কবিরাজের সফলতা ৯৫%।

টংরাপাড়ার শ্রী ঝড়ু রাজুয়ার চিকিৎসা পদ্ধতি

চিকিৎসার উপকরণ

মন্ত্র ও গাছ গাছালি দ্বারা সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা করেন।

চিকিৎসা পদ্ধতি

সবার আগে তিনি নতুন ব্লেড দিয়ে সাপের দাঁত তুলে নেন। দাঁত তুলে কলার পাতায় রেখে দেন। প্রথমেই তিনি বিষ বোঝার জন্য রোগীর গায়ে চিমটি কাটেন। আর তিনি চিমটি কাটলে অবশ হয়ে যায় এবং বিষ আর উপরে ওঠে না। তবে তিনি হাত চালিয়ে দেখেন বিষ কতদূর আছে যতক্ষণ বিষ থাকে ততক্ষন তিনি হাত চালান। হাত চালনোর মন্ত্র নিম্নরূপ :

হাত চালানোর মন্ত্র

"চল চল ব্রহ্ম চল,
কে চালায় গুরু চালায়
বিষ থাকবে তো স্বর্গে উঠবি
না থাকলে তো নরকে ঢুকবি।"

এরপর তিনি বিষ বন্ধ করার মন্ত্র পাঠ করেন। বিষ বন্ধ করার জন্য নিমের ডাল দিয়ে ঝাড়েন ও পানি দেন।

পানি পড়ার মন্ত্র

"আষাঢ় পড়িল মায়ে
মাথায় বাজে নূপুর
ঝনু ঝুনা ঝুন নূপুর বাজে
সদাই সর্বকার
কে ডাকিল, কে শুনিল
সদাই সর্বকার।"

এই মন্ত্র ৩ বার পড়ে পনিতে ফুঁ দেন এবং এই পানি গায়ে ছিটিয়ে দেন ও কিছু অংশ খাইয়ে দেন। আর এই পানি দিয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করেন। বিষ, রক্ত কলার

www.pathagar.com

পাতায় রেখে দেন। বিষ থাকলে রক্ত কালো হয়ে যাবে। এরপর তিনি বিষ কাটানোর জন্য মন্ত্র পাঠ করেন একাধিকবার । সেই সাথে বিষহরি গাছের শিকড়, পাতা খাইয়ে দেন। বিষ কাটানোর মন্ত্র নিম্নরূপ :

বিষ কাটানোর মন্ত্র :

" গুণ কাটো গুণ জাতি কাটো
লোহার চক্র বনে কাটে
কে কাটে গরু কাটে
কামরুক্ষ্যা কামরু গুরুর দোহাই।"

তবে বিষ ঝাড়ার শেষ মুহূর্তে এসে সূঁচ দিয়ে ফুটা করে বিষ রক্ত বের করে কলার পাতায় রাখেন। আর সেই রক্ত দেখলেই বুঝতে পারেন শরীরে বিষ আছে কিনা? বিষ না থাকা পর্যন্ত তিনি হাত চালাতে থাকেন।

পালনীয়

সাপে কাটলে ক্ষত স্থানের বেশ খানিক উপরে বাঁধতে হবে। যদি মাথায় কিংবা গলায় কামড়ায় তাহলে মাথার মধ্যে যে দুটি বাতির মতো আছে তা পড়ে গেছে কিনা দেখতে হবে। আর একটি করণীয় কাজ হলো বিষ ঝাড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাঁধন খোলা যাবে না।

আমল

তাঁর মতে এসব কিছু টিকিয়ে রাখতে গেলে মনসা দেবীকে মানতে হবে। তাঁর পূজা করতে হবে। আর তা না হলে ক্ষতি হবে। শ্রাবণ/ভাদ্র মাসের শেষে এই পূজা করা হয় শ্রাবণ মাসের শেষ দিনে পাতার মুখে শুনা যায় সব ঠিক আছে কিনা? রাত্রে এই পূজা করা হয় এবং সেদিন সারাদিন উপবাস করতে হয়। পূজা শেষে সকালে তা নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। যখন পূজা করেন তখন মনসা তাঁর উপর ভর করে আর তখনই মনসা বলে দেয় কোনো জায়গায় কোনো রকম ভুল হলো কিনা? কবিরাজের জ্ঞান না থাকলে ঐ সময় তার হাত পা ধুয়ে দিতে হয় আর বাকীজন জিজ্ঞাসা করবে সব ঠিক আছে কি না? তাঁকে সবসময় মনসা সঙ্গ দেয়। তিনি রাত্রে পুতুলের বেশ ধরে মনসাকে দেখেছেন। আর স্বপ্নে দেখান তার কোনো উপকরণ পূজায় লাগবে।

পূজার উপকরণ

মাটি দ্বারা একটি ছোটো ঘর তৈরি করেন। সেই ঘরে কলা, দুধ, ধূপ, তুলসী, পানি ইত্যাদি রাখতে হয়। সন্ধ্যায় বাতি দিতে হয় আর শাঁখ বাজাতে হয়। সেখানে মাটির প্রতিমা বসানো থাকে।

চৌহড্ডিটোলার হোসেন আলীর চিকিৎসা পদ্ধতি

উপকরণ : কুরআন শরীফের সুরা দিয়ে সব কাজ করেন।

চিকিৎসা পদ্ধতি

সাপ কাটলে কাটা স্থানে আঙুল ঘুরাতে ঘুরাতে এক নিঃশ্বাসে ৭ বার সুরা শোআরা আয়াত ১৩০ বার পড়ে ফুঁ দিতে হবে। তাহলে বিষ নেমে যাবে। সুরার আয়াত নিম্নরূপ-

www.pathagar.com

"ওয়া ইজা বাতাসতুম বাতাসতুম জব্বারি।"

সফলতা : কবিরাজের সফলতা ৯০%।

চিকিৎসা পদ্ধতি : প্রথমে সুরা এখলাস ৩ বার পড়ে হাত চালান দেন। তারপর একটি সুরার আয়াত ৭ বার পরে ফুঁ দেন। এভাবে যতক্ষণ বিষ না নামে ততক্ষণ ফুঁ দিতে হবে। সে সুরার আয়াতটি নিম্নরূপ-

"ওয়েজান বাতাসতুন বাতাসতুন জাব্বারূন"

সফলতা : এই কবিরাজের সফলতা ১০০%।

রোহনপুরের আয়নাল হকের চিকিৎসা পদ্ধতি

চিকিৎসা পদ্ধতি

তিনি হাত চালিয়ে দেখেন বিষ কত দূরে গেছে তারপর হাতে হাত রাখেন। তিনি হাত দিয়ে বলতে পারেন কোন সাপে কামড়িয়েছে। তিনি রোগীর গায়ে তাবিজের ভিতর নীল সূর্য্যমুখী শিকড় ও জহুড়া ফল কুচি কুচি করে কেটে ভরে দেন। আর রোগীর গায়ে ক্ষত স্থানের উপর বেঁধে দেন। আর যদি বিষ সারা শরীরে যায় তাহলে হাতের ও পায়ের কানি আঙুল বেঁধে দেন। তারপর রোগীর শরীর ও নিজের শরীর কেটে এক সঙ্গে লাগিয়ে দেন। যতক্ষণ রোগীর শরীরে বিষ থাকে ততক্ষণ এই জোড়া খোলে না। আর এভাবেই তিনি রোগীর শরীর থেকে নিজের শরীরে বিষ নিয়ে থাকেন। বিষ নেওয়ার আগে নীল সূর্য্যমুখীর শিকড় নিজে খান ও রোগীকে খাওয়ান। নীল সূর্য্যমূখীর শিকড় দিয়ে তিনি বিষ নামান। ৫ বা ১০ মিনিটের মধ্যেই বিষ নেমে যায়। তবে তিনি জহুরা ফল দিয়ে রোগী জীবিত না মৃত তা পরীক্ষা করেন। এক গ্লাস পানিতে ফল রাখেন, যদি ফল ডুবে যায় তাহলে রোগী মারা গেছে বুঝতে হবে আর যদি খেলা করে তাহলে বুঝতে হবে রোগী বেঁচে আছে।

সাপ ধরার মন্ত্র

তিনি মনসা ও আল্লাহর দোহাই দিয়ে সাপ ধরেন। তিনি সাপ ধরার সময় "আয়াতুল কুরসী" পড়েন। আর সাপ ধরার আগে ও পরে বাংলা মদ খান। অবশ্য তিনি দিন রাত ২৪ ঘন্টা বাংলা মদ খান। তিনি আগে বীণ বাজাতেন কিন্তু অসুস্থ থাকার কারণে আর বাজান না। এই বীনটি পয়সা দিয়ে তৈরি ছিল। তিনি সাপ ধরার সময় কোনো তাবিজ পড়েন না।

বিষ ঘা হলে

সাপ খালি মাঠেও বিষ ছাড়ে। যার ফলে বিভিন্ন সময় বিষ ঘা হয়। বিষ ঘা হলে তিনি মুখ দিয়ে ঘায়ের কষ তুলে নেন এবং নীল সূর্য্যমুখীর পাতা দিয়ে পোকা তুলে দেন। এ জন্য তিনি কোনো মন্ত্র ব্যবহার করেন না।

কবিরাজের সাপ খাওয়া

এই কবিরাজ কাঁচা সাপ খেতেন দিনে অনেকগুলো। এ যাবৎ তার ১ লাখ সাপ খাওয়া হয়ে গেছে। তিনি মাথা থেকে ১ হাত পরিমাণ সাপ খেতেন। তবে খাওয়ার কোনো অংশই তিনি ফেলে দেন না। সাপ খাওয়া তার অভ্যাস। তিনি বলেন সাপ খেতে নাকি

www.pathagar.com

অনেক মজা। ছোটোবেলা থেকেই তিনি সাপ খান। সাধারণত তিনি সাপ ধরার সময় সাপ খেতেন তাকে যদি সাপে কামড়ায় তাহলে সাপই মরে যায়। কবিরাজের গায়ে এতো বিষ যে, তার রোগে কোনো চিকিৎসা করা যায় না। তার বাড়িতে এক সময় ১২০০-১৫০০ সাপ থাকতো কিন্তু এখন নেই। এই সাপ রাখার জন্য তিনি বড়ো বড়ো মাটির পাতিল ব্যবহার করতেন। তার সঙ্গে সবসময় দু ঘাড়ে দুটি সাপ ফনা তুলে থাকত কৃষক মাঠে যেমন গামছায় করে খাবার বেঁধে নিয়ে যেতেন। তাঁর মতে একটি সাপ কমপক্ষে ৩০-৪০ টি বাচ্চা ফুটায়। তিনি সাপকে ডিম, মাছ, দুধ খাওয়াতেন। খাওয়ানো গোসল করানো তাঁর নিত্য দিনের কাজ। তিনি মাতাল হয়ে আসলে যেভাবে শুয়ে থাকেন বিছানায় সাপও সেভাবে থাকে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় সাপ তাঁর নির্দেশ মতো চলা ফেরা করে। যদি না করে বা সাপ রাগ করে তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই সাপটি খেয়ে ফেলেন। তিনি যদি সাপকে হাতে বিষ ছাড়তে বলেন তাহলে হাতেও বিষ ছাড়ে। আর এই বিষ তিনি খেয়ে ফেলেন। তাঁর গায়ে এতই বিষ যে, তিনি যদি কাউকে মারেন তাহলে সেই ব্যাক্তি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি শখের বসে সাপ খেলা দেখাতেন। তবে তিনি খেলা দেখানোর জন্য কোনো পয়সা নিতেন না। তাঁর মতে নীল সূর্য্যমুখীর শিকড়, বীজ বাড়ির চারপাশে পুতে দিলে সাপ ঢুকতে পারে না। তিনি সাপের সাথে কথা বলতে পারেন।

www.pathagar.com

ধাঁধা

লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার মধ্যে ধাঁধা অন্যতম। ঐতিহ্যানুসারী লোকায়ত সমাজের সামগ্রিক কৃতির উৎসভূমি থেকে উৎপন্ন হয়েও লোকসংস্কৃতির এই ধারাটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কারণ লোকসংস্কৃতির অন্যান্য ধারাগুলো যেমন-ছড়া, লোকসংগীত, লোকনাট্য ইত্যাদির উৎপত্তির অন্যান্য কারণ থাকা সত্ত্বেও এগুলোর মূল প্রধানত হৃদয়জাত। অন্য দিকে ধাঁধার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে মানুষের মস্তিষ্ক। ধাঁধা রচনায় যেমন চিন্তা ও কৌশলের প্রয়োজন, তেমনই উত্তর দিতেও প্রয়োজন বুদ্ধির। তাই ব্যবহারিক দিক বাদ দিয়েও ধাঁধাকে প্রাথমিকভাবে মানুষের বুদ্ধ্যাংক (I.Q) মাপার মাধ্যমও বলা যেতে পারে।

সংস্কৃত 'দ্বন্দ্ব' শব্দজাত 'ধন্ধ' থেকে ধাঁধা শব্দের উৎপত্তি। (দ্বন্দ্ব> ধন্দ> ধন্ধ> ধাঁধা)। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় শব্দকোষ 'ধাঁধা' শব্দের অর্থ করেছেন কৌতুককর কূট প্রশ্ন বা হেঁয়ালি (Puzzle)। রাজশেখর বসু চলন্তিকায় ধাঁধা শব্দকে দ্বন্দ্ব শব্দজাত বলে অর্থ করেছেন "কৌতুহলজনক দুরূহ প্রশ্ন"। ইংরেজি ভাষায় ধাঁধাকে বলা হয় Riddle. যার উৎপত্তি অ্যাংলো স্যাকসন শব্দ Readin থেকে। Webster's Seventh New Collegiate Dictionary তে Riddle শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'A mistifying, misleading or purring question possed as a problem to be solved or guessed.' (ড. কৃষ্ণ খা পৃঃ ১৩৪)

ধাঁধা মননশীল রচনা। সি. এফ. পটার ধাঁধাকে 'formulated thought' বা 'গুচ্ছ চিন্তা'র ফল বলেছেন। তিনি বলেন : Contrary to common assumption that they are more word puzzle proposed by punsters at evening parties, riddles rank with myth, fables, folktales and proverbs as one of the earliest and most widespread types of formulated thought. [SDFML, Vol. 11, p.938]

পটারের মতে, ধাঁধাকে সন্ধ্যাকালীন ভোজে কথিত। ধাঁধা কেবল বুদ্ধি বিহ্বলকর শব্দমালা নয় ধাঁধা পুরাকাহিনি, রূপকথা, লোককাহিনি ও প্রবাদের মতো আদিকাল থেকে বহু প্রচলিত নিগূঢ় চিন্তার ফল। জনৈক সমালোচক ধাঁধাকে 'mastery of thought' বা 'কুশলী চিন্তা'র ফল বলেন। তিনি লেখেন, It (riddle) presupposes a command of language, a mastery of thought and a powerful sense of rhythm. [Ibid. p. 038] অর্থাৎ ধাঁধা রচনায় ভাষার উপর দখল, চিন্তার উপর দক্ষতা এবং ছন্দ সম্পর্কে প্রবল চেতনা থাকা দরকার। জার্মান লোকবিজ্ঞানী জে. বি. ফ্রেডরিক (J. B. Friedrich) বলেন, ধাঁধা হলো " an indirect presentation of an unknown object in order that the ingenuity of the hearer of reader may be exercised in finding it out". অর্থাৎ ধাঁধা একটি অজানা বিষয়ের পরোক্ষ উক্তি। এটি এমনভাবে বিবৃত করা হয়, যাতে লোক অথবা পাঠক তা খুঁজে বের করতে

www.pathagar.com

পারেন। এতে চিন্তা চর্চার অবকাশ আছে। তবে কথকের কাছে বিষয়টি অজানা থাকে না, শ্রোতা পাঠকের কাছে অজানা থাকে। শব্দ জালের সূত্র ধরে উত্তরটি বের করতে হয়। জেমস এ কেলসো ধাঁধাকে 'vox populi' (Voice of the people) বলেন। তাঁর মতে, ধাঁধা স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, যা একটি গোত্র বা জনগোষ্ঠীর আত্মার গভীর তলদেশ থেকে উঠে আসে, সে কারণে একে 'সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর' বলা হয়। তিনি লিখেন : A genuine folk-fiddle is a spontaneous expression, coming from the dephts of the soul of a people or a race...Riddle are, therefore, in a real sense the vox populi [james Hastings edited, The Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. X. 1952, p. 967] (লোকসংস্কৃতি খণ্ড ৭, পৃ ১৮)

"....Riddles are essentially metaphors and metaphors are the result of the primary mental process of association, Comparison and the perception of likeness and differencess."

ধাঁধা মূলত রূপক, উপমান ও উপমেয় এর মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হলে হয় রূপক। এই অভেদ কল্পনার মূলে রয়েছে গভীর সামঞ্জস্য অবশ্যই দুটি অসম বিষয়ের মধ্যে। একটিকে দেখে অনুরূপ আর একটি বিষয়ের কথা ভাবা, এর জন্য প্রয়োজন হয় একদিকে কল্পনাশক্তির অন্যদিকে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির।

অন্য একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :

``A Riddle is a tradition verval expression which contains one or more descriptive elements in opposition which may be literal and metaphorical but contain no apparent contradiction."

Roser D. Abrahams ও Alan Dundes মনে করেন মূলত শ্রোতার রসবোধ পরীক্ষা করাই হলো ধাঁধার উদ্দেশ্য-

"Riddles are question that are framed with the purpose of confusing or testing the wits of those who do not know the answer."(ধাঁধা : স্বরূপ সন্ধান, বরুণ কুমার পৃ.১-২)

ধাঁধা সম্পর্কে Dr. Archar Tayler বলেন, ``Riddlers occasionally describe an object as something living and at the same time give so few detail that we cannot know what they suggest an animal or a human being, such invention.''

অর্থাৎ ধাঁধার মাধ্যমে এমন কোনো বিষয় থাকে যাকে কোনো প্রাণী জীবজন্তু বা মানুষের সাথে তুলনা করা যায়। সোজা কথা, একের পরিবর্তে অপর একটি জিনিসকে তুলে ধরা আসল ব্যাপারটি প্রচ্ছন্ন রেখে রূপকাণ্ডারালে তার স্বরূপ বর্ণনা করাই ধাঁধার প্রধান বৈশিষ্ট্য (মনোয়ারা, পৃ.৬৭)।

ধাঁধার আভিধানিক সংজ্ঞাটি হলো - ``A perihrastic presentation of an unmetioned subject the design of which is to excite the reader or heare to the discovery of meaning hidden under a studied obscurity of expression.''

www.pathagar.com

কৌতুহলজনক দুরূহ প্রশ্ন হলো ধাঁধা। প্রজ্ঞামূলক, বুদ্ধিগ্রাহ্য আবেদন ধাঁধায় নিহিত। রূপক, যমক, অনুপ্রাস, স্বভাবোক্তি, অতিশয়োক্তি অলংকারের ছড়াছড়ি রয়েছে ধাঁধার মধ্যে। এটি প্রতীকধর্মী ও চিত্রধর্মীও। ধাঁধা চিত্র স্থির কিন্তু পিনদ্ধ। স্বল্পবাক্য, চিন্তামূলক, জটিল প্রকাশভঙ্গী ও তথ্যানুসন্ধিৎসা ধাঁধায় অনিষ্ট। জীবন নিয়ন্ত্রণ, ধর্মীয় লোকাচার, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক জীবনেও ধাঁধার প্রয়োগ অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত রয়েছে। মানব ও মানব অঙ্গ, প্রাণী অঙ্গ, উদ্ভিদ ও উদ্ভিদ অঙ্গ প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা অনুযায়ী ধাঁধার শ্রেণী বিভাগ করা হয়। এছাড়াও আক্রমণাত্মক, অক্ষর প্রয়োগমূলক, কাহিনিমূলক প্রভৃতি ধাঁধার সন্ধান পাওয়া যায়।

সৃষ্টির আদিমকাল থেকে ধাঁধার প্রচলন হয়ে আসছে। কোনো সময়ে কোনো উষালগ্নে এর জন্ম, কেইবা এর উদ্ভাবক লালন কর্তা তার হদিস পাওয়া কঠিন। কিন্তু জন্ম, উদ্ভাবক, পালনকর্তা যেই হোক না কেন ধাঁধার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। 'দি ইনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা' গ্রন্থে ধাঁধা এরূপ 'What animal is that which goes on four feet in the evening?' The answer is `man'. বাংলাতেও অনুরূপ ধাঁধার সন্ধান মিলে। আবার 'ইডিপাস' নামক গ্রন্থে স্ফিংস নামক রাক্ষসের কঠিন ধাঁধার জবাব দিয়ে রাজকুমার ইডিপাস দেশ ও জাতিকে মহাবিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। বাংলাতে ধাঁধাটি নিম্নরূপ-

ছোট্টকালে চাইর পাও
যুবাকালে দুই পাও
বুইড়া অইলে তিন পাও
ই কোন জীব? (উত্তর- মানুষ)

বাংলা ভাষায় প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদে অসংখ্য ধাঁধা লক্ষ্য করার মতো। কুক্কুরিদের একটি পদ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

দুলি দুহি পীঢ়া ধরণ ন জাই
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই।

এছাড়া, চর্যাপদের পদকর্তাদের পদে অসংখ্য ধাঁধা ও হেঁয়ালির সন্ধান লাভ করা যায়।

চর্যাপদের কথা বাদ দিলেও মধ্যযুগের কাব্যের মধ্যে অসংখ্য ধাঁধা হেঁয়ালি শোলক লক্ষ্য করা যায়। তবে সব ধাঁধা বই পুস্তকে স্থান পায়নি। অথচ মানুষের মুখে মুখে বংশ পরম্পরায় চলে এসেছে।

হেয়াত মামুদ বলে হেঁয়ালি ছন্দ
পুণ্ডিত বুঝিতে নারে মূর্খে লাগে ধন্দ।

আধুনিককালের সাহিত্যেও ধাঁধা লক্ষ্য করা যায়। তবে তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় আধুনিককালের ধাঁধাগুলো সর্বত্রই আধুনিকতার ছাঁচে ঢালাই করা। সুতরাং আর্থিক ও বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে তৎকালীন সময়ের লোক ধাঁধা এবং আজকের রচিত ধাঁধাগুলোর মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। কিন্তু বর্তমান সমাজে যেসব ধাঁধা বা হেঁয়ালি প্রচলিত আছে তার মূল কিন্তু প্রাচীন ধাঁধা। তাইতো ড. আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আমাদের বর্তমান সমাজে যে ধাঁধা বা হেঁয়ালি প্রচলিত আছে তার

www.pathagar.com

বীজ মানুষের 'সর্বপ্রাণবাদ' পর্যায় সমপ্রক্রিয়ার ম্যাজিক পর্যায় এবং অন্যান্য বিভিন্ন আচার–অনুষ্ঠান পর্যায়ে নিহিত ছিল। কাজেই ধাঁধা ও লোকসাহিত্যের একটি প্রাচীনতম অংশ পুরাকাহিনি, রূপকথা ও লোককথার মতোই বহুযুগ পূর্বে এদের উদ্ভব। এছাড়া বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ফোকলোর বিশারদগণ ধাঁধাকে প্রাচীন বলে স্বীকার করেছেন। তাছাড়া আধুনিক সমাজে প্রচলিত ধাঁধাকে প্রাচীন উত্তরসূরী বলে গন্য করেছেন এবং আধুনিক ধাঁধা সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে।(মনোয়ারা, পৃ.৯৯)

ধাঁধাগুলোর উৎপত্তির অন্তরালে আরও কতকগুলো সামাজিক কারণ বিদ্যমান। বহিরাগতের আক্রমণে সেকালে ধনসম্পত্তি লুটপাট হয়ে যেত তাঁরা আক্রমণকারীর নজর এড়াতে নানা গোপন উপায় উদ্ভাবন করতেন। বড়ো বড়ো প্রাসাদে এ ধরনের বহু গোপন কক্ষ বা পথ থাকতো সেখানে পৌঁছবার জন্য সাংকেতিক ভাষা, চিহ্ন বা নকশা রক্ষা করা হতো যার সন্ধান জানতেন অল্প ক'জন ব্যক্তি বা ১/২ জন। বিভিন্ন সময় এভাবে গোপন সংরক্ষণ দ্বারা শুধু ধনরত্ন নয় জ্ঞান বিজ্ঞান শাস্ত্র পুঁথি রক্ষা করা হয়েছে।(চূড়ামণি, পৃ.২৪০)

ধাঁধা লোকসাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গ, ফলতঃ লোকসাহিত্যের ধর্মানুযায়ী ধাঁধাও মৌখিক ঐতিহ্যানুসারী। শুধু তাই নয় ধাঁধা এক বা একাধিক বর্ণনাত্মক উপাদানে সমৃদ্ধ, সেই বর্ণনায় ইচ্ছাকৃতভাবে স্থান দেওয়া হয় বৈপরীত্যমূলক উপাদানকে অথচ আপাতভাবে তাতে স্ববিরোধিতার সন্ধান মিলবে না। এই জন্যই তো ধাঁধার উত্তরদান সহজসাধ্য নয়, শ্রোতা এই কারণেই বিভ্রান্ত হয়, একদিক দিয়ে প্রতারিত হয়।

বৈশিষ্ট্য

বিশিষ্ট ফোকলোরবিদ ওয়াকিল আহমদ ধাঁধার কতক বাহ্যিক লক্ষণ চিহ্নিত করেছেন। যথা-

১. রং/চিহ্ন (Colour/Sign)
২. সংখ্যা/পরিমাণ (number/quantity)
৩. গণিত/গণনা (mathematic/Enumeration)
৪. অক্ষর/শব্দ (orthogrophy)
৫. প্রবর্তনা (Challenge)
৬. তালিকা (series)
৭. সংলাপ (dialogue)
৮. আত্মকথন (solilogy)
৯. ধন্যাত্মক শব্দগুচ্ছ (Onouratoroeia)
১০. পুনরাবৃত্তি (repetition)
১১. বৈপরীত্য (contrast)
১২. ছদ্ম অশ্লীলতা (pseudo obseenity)
১৩. নামায়ন (Onouortics)
১৪. ভনিতা (Cotophon)

www.pathagar.com

১৫. শব্দ/বাকচাতুর্য (Tongue Twister)
১৬. ক্রিয়া (Function)

রং/চিহ্ন (Colour/Sign)

রঙ বা জিনিস ইন্দ্রিয়কে সহজে আকর্ষণ করে। বিশেষ করে তুলনা আরোপের ক্ষেত্রে রঙের সংশক্তি অনায়াসলব্ধ বিষয়। এরপর আকার প্রকার ধর্মগুণ স্বভাব আচরণের কথা আসে।

এত্তুকোনা গাছোত
নাল বউ নাচোৎ-**মরিচ**
আড়াৎ থাকি বাড়াল টিয়া
নাল টোপর মাথাত টিয়্যা- **আনারস**

সংখ্যা/পরিমাণ (number/quantity)

একন্যা শালিকের তিন মাতা
সে খায়া আড়াৎ নতাপাতা- **উনুন**
এক ডালি সুপারি
গইনবা পারে কোনো ব্যাপারী- **তাঁরা**
চাইর ভাই খাটুর খুচুর
দুই ভাই বইসনা ঠাকুর
দুই ভাই তবলা বাজায়
এক ভাই মাছি খ্যাদ্যায়- **গরু**

গণিত/গণনা (mathematic/Enumeration)

কালিদাস পণ্ডিতের ফাঁকি
আড়'শ থেকি ৫ পঞ্চাশ গেইল
কত থাকি বাকি- **কিছুইনা**।

অক্ষর/শব্দ (orthogrophy)

গাছোত নাই পাতাত নাই
ফুলে আছে, ফলে আছে
আর ডালোত আছে- **ল অক্ষর**।

প্রবর্তনা (Challenge)

অক্তে ডুবো ডুবো কাজলের ফোঁটা
একনা কথা সে বলতে পারে
সে মজমদারের বেটা- **কুঁচ**
কাচোৎ তুলতুল পাতাৎ সিঁন্দুর
যাই না কত্তৎ পারবে সে ধেড়ে ইন্দুর- **মাটির হাড়ি**।

www.pathagar.com

তালিকা (series)

বাঘের মতন পারে নাপ
কুকুর হয় বসে
পানিত ঝাপ দিলে
শোলা হয়া বসে-**ব্যাঙ**

আত্মকথন (solilogy)

উত্তম পুরুষ ব্যবহার করে আত্মজবাণীতে এরূপ ধাঁধা রচিত হয়। ধাঁধার রহস্য সৃষ্টির এটাও কৌশল-

জন্ম যখন পাই
আমার নড়াচড়া নাই-**ডিম**।
শুড় দিয়া কাজ করি নই আমি হাতি
পরহিতে খাটি সদা, তবু খাই লাথি- **ঢেঁকি**।

ধন্যাত্মক শব্দগুচ্ছ (Onouratoroeia)

ইরকিচি বিরকিচি
নাই চোচা নাই বিচি-**লবণ**।
ইড়িং বিড়িং তিড়িং ভাই
চোখ দুটো তার মাথা নাই- **কাঁকড়া**।

ধন্যাত্মক শব্দগুচ্ছ (Onouratoroeia)

উঠিতে পটাং পটাং
বসিতে পাহাড়
নক্ষ নক্ষ জীব মারে
না করে আহার-

বৈপরীত্য (contrast)

আও যাও
ঘর আছে তার দুয়ার নাই- **কবর**

হাত আছে তার মাথা নাই
পেট আছে ভুরি নাই- **শার্ট/জামা**

ছদ্ম অশ্লীলতা (pseudo obseenity)

দুই পাশে বাল
মইধ্যেত লাল
ভাতার আছে যতদিন
দিতে হবে ততদিন- **সিঁদুর**।

নামায়ন (Onouortics)

প্রধানত ধাঁধার প্রথম চরণে ধন্যাত্মক শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো ধাঁধার অর্থের দিক থেকে এর যোগসূত্র থাকে না। যেমন-

www.pathagar.com

ক. অন্ত্যর্থক ও নঞর্থক শব্দ বা অব্যয়পদ দ্বারা বৈপরীত্র দেখানো হয়।

খ. এক গাছে তিন তরকারি- **কলাগাছ**।

ভনিতা (Cotophon)

মধ্যযুগের বাংলা কবিতায় ও কাব্যের শেষে কবির নামযুক্ত চরণ যোগ করা একটি বিশেষরীতি ছিল। তার নাম ভনিতা। যেমন-

দশ মুণ্ডু নব দাড়ি
ষোল ঠ্যাংয়ে জাইগ্যা বাড়ি।
কালিদাস পণ্ডিত কয়
আর চার ঠ্যাং উপরে রয়- **পালকিবাহক ও বর কনে**।

শব্দ/বাকচাতুর্য (Tongue Twister)

রহস্যজাল বা বাতাবরণ রচনা করাই ধাঁধার মূল লক্ষ্য। শব্দকে নানা কৌশল প্রয়োগ করে এই রহস্য জাল রচনা করা হয়-

ক. কোন পাতা পাতা না- **বইয়ের পাতা**।

খ. কোন সাগর সাগর না- **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর**।

ক্রিয়া (Function)

ক্রিয়া প্রধানে ধাঁধাও আছে। এরূপ ধাঁধায় এক বা একাধিক কাজের বিবরণ থাকে-

জন্ম যখন পাই
আমার নড়াচড়া নাই- **ডিম**

শ্রেণিকরণ

ধাঁধার শ্রেণিকরণ জটিল বিষয়। ধাঁধার দুটি অংশ প্রশ্ন ও উত্তর। উত্তরটি এক শব্দের। মিশ্র ধাঁধায় একাধিক শব্দ আছে। প্রধানত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুবিষয় প্রাণী নিয়ে ধাঁধা রচিত হয়। ভাববাচক ও ক্রিয়াবাচক ধাঁধাও আছে তবে তার সংখ্যা কম। প্রশ্ন ও উত্তর নিয়েই একটি পূর্ণাঙ্গ ধাঁধা। প্রশ্নটি ব্যক্ত, উত্তরটি অব্যক্ত। উত্তর ধরে শ্রেণিবিন্যাস নিম্নোক্ত ধরনের-

১. জড়বস্তু
২. মানব ও মানবেতর প্রাণী।
৩. গাছপালা
৪. প্রকৃতি ও নিঃসর্গ
৫. ভাব
৬. অক্ষর অঙ্ক
৭. ক্রিয়া

ডন ভি হাট Riddles Filopin : An Anthropological গ্রন্থে মোট ২০টি ভাগ করেছেন। যথা-

১. কৃষি
২. বন্য-গৃহপালিত পশু

www.pathagar.com

৩. মানবদেহ
৪. খাওয়া ও রান্না
৫. আবহাওয়া ও নিঃসর্গ
৬. বাসস্থান ও আসবাবপত্র
৭. ধর্ম জীবন
৮. পোষাক–পরিচ্ছদ
৯. খাদ্যান্বেষণ
১০. বইপত্র নথি
১১. পানীয় দ্রব্য
১২. যানবাহন
১৩. সংখ্যা ও ওজন
১৪. যন্ত্রপাতি
১৫. অলঙ্কার
১৬. খেলা ও খেলনা
১৭. মৃত্যু
১৮. বাদ্যযন্ত্র
১৯. তাঁতযন্ত্র
২০. বিবিধ

ধাঁধা হলো লোকসাহিত্যের জীবন্ত অংশ। ধাঁধার মাধ্যমে যে রসের সৃষ্টি হয় তা সত্যিই উপভোগ্য। গ্রাম ও শহরের ছোটোরা তো বটেই বড়োরাও একে অন্যকে ছড়া কেটে ধাঁধা জিজ্ঞেস করে ঠকায়।

১. লোহার গাই লোহার বাছুর,
দুধ ছেকে তোর মামা শ্বশুর।
উত্তর : টিউবওয়েল।

২. হেত্তি গেনু ওত্তি গেনু,
এমন কইনা দেখে আসনু,
ষোল সারি দাঁত।
উত্তর : মাকাই বা ভুট্টা।

৩. ইল বিল শুকায় গেল,
গাছের আগালত পানি।
উত্তর : ডাব।

৪. দুই চালের এক বাতা।
উত্তর : কলার পাতা।

৫. ইতি খিনা পাথরি নিচা মাছে ভরতি
উঃ- জাম্বুরা (বাদামি)[১]

৬. যাইতে সালাম আসতে সালাম
বলতে না পারলে ওয়ার বাপ গোলাম

www.pathagar.com

উঃ- ঘরের দরজা।

৭. লোহার গাই লোহার বাছুর
দুধ ছেকে তার মামা শ্বশুর।
উত্তর:- টিউবওয়েল

৮. একটা বুড়ি গোটা গতরটায় ফুসড়ি।[২]
উত্তর:- কাঁঠাল।

৯. আল্লাহর কি মেহেরবানি
গাছের আগালত পানি
উত্তর:- ডাব/নারিকেল।[৩]

১০. বাঁশ কাটিনু টুকুর টাকার
বাঁশের উঠিল গাজা
হাতির উপর উঠে ঢোল বাজানু
তাহুনি শুনে রাজা।[৪]
উত্তর:- লাশ।

১১. চামরার ভিতর চামড়া ঢুকে
চামরা পালে সুখ
ঠেলে দিয়া টানে নিলে
মেলে থাকে সুখ।
উত্তর:- চামরার জুতা

১২. মাঠের গরু কাঠের গাই
গালা কাটিয়া দুধ খাই
মাথাডা হবর যবর
নেংরটাই নাই।
উত্তর:- খেজুর গাছ।

১৩. হেকরা কুঁজা খুদে মাটি
দশখান ঠেং তিনখান কটি।
উত্তর:- লাঙ্গল, হালুয়া ও গরু।

১৪. হাত নাই পাও নাই
নই আমি হাতি
পরের উপকার করি
তবু খাই লাথি।
উত্তর:- ঢেঁকি।

১৫. হুরু হুরু হুরু, হুরুর কোমরটা সরু
হুরু যদি মনে করে, গোটা মানুষটা পিঠি করে।
উত্তর:- খরম।

১৬. উত্তরে কাঞ্চল বিলে হুরু হুরু করে
তিন খানা মুখ তার একখানা বলে।[৫]
উত্তর:- হালুয়া

তথ্যনির্দেশ

১. মারিয় (১২), পিতা : মিলন, গ্রাম : ভাঙ্গ বাড়ি, উপজেলা : রানীশংকৈল, জেলা : ঠাকুরগাঁও
২. ঐ।
৩. ঐ।
৪. ঐ।
৫. রাখী রানী (২০), স্বামী : শংকর বিশ্বাস, গ্রাম : গোরকই, উপজেলা : রানীশংকৈল, জেলা : ঠাকুরগাঁও।

www.pathagar.com

প্রবাদ প্রবচন

মানুষের সূক্ষ্মতম অভিজ্ঞতার ফসল প্রবাদ প্রবচন। এর মাধ্যমে মানুষ নিজের চলমান জীবনের প্রয়োজনীয় উপলব্ধি ছড়িয়ে দেয় অন্যকে। মানুষ এগুলো জড়িয়ে নেয় জীবনের সাথে।

১. বসিবা দিলে শুতিবা চাহে।

২. নরম মাটিতে বিলাই হাগে।

৩. হবে ছুয়া কহিবে বাপ,
তে জুড়াবে মনের তাপ।

৪. মাঘ মাসের জারে
ভঁইষের শিং নড়ে।

৫. আমও গেল, ছালাও গেল।

৬. হাজার ধুলেও কয়লার নি যায় রং
সাত ধুয়া দিলেও শুটকির নি যায় গন্।

৭. যত খাউক হলুয়া রুটি
তাহু ওই পচকটা কটি।

৮. কিসের মাঝত কি
তিত কল্লাত ঘি।

৯. নি খাম নি খাম করে বালি,
বালি খায় তিন থালি।

১০. কটিত নাই চাম
হলদি বাড়ি যাম অথবা সেনাপতির নাম।

১১. পেট নষ্ট করে মুড়ি
বাড়ি নষ্ট করে বুড়ি।

১২. শুতিবার সম
মুতিবার ফম।

১৩. ভাত খায় ভাতারের
গীত গায় নাঙ্গের।

১৪. ভাত দিবার ভাতার নাই,
কিল মারা গসাই।

১৫. লাল চোখা পুরুষ ভালো, যদি নি খায় ভাং
মুচকি হাসি নারি ভালো, যদি নি করে নাং।

১৬. রহিমের বেটির গাল চেপ্টি
রহিম কহে মোর ভালোই বেটি।

www.pathagar.com

১৭. যার মা লেলানি
তার বেটি পালানি।
১৮. লেখানি পড়ানি ভদা সরকার
দাও নি, বইসলা নি, আকালু ছেতুয়ার।
১৯. লুচ্চার নাই সরম, চোরের নাই ধরম।
২০. শিকনির দোয়ায় কি গরু মরে ?
২১. সুন্দর আমোত, থক থক পোকা।
২২. হবে বেটা কহিবে বাপ,
তে পালাবে মনের তাপ।
২৩. হাটের চাউল ঘাটের পানি
বসে রান্ধিম মহারানি।
২৪. হায়রে আল্লাহ্ হযরত
মাউগে (স্ত্রী) মালে ভাতারক।
২৫. সব মাছ খিলালো বন্ধু নাই খিলালো টোনা
নিজের ভাতার যেমন-তেমন
পরের ভাতার সোনা।
২৬. যে করে পাপ, সে হয় আঠারো ছুয়ার বাপ।
২৭. মোর মুখোত ধুয়া উড়াছে,
তুই কহছি পিঠায় মিজাছে।
২৮. দিনে বেড়াছে আলে ঢালে,
জোনাকে শুকাছে ধান
আনগে বেটি ছাম-গাহিন,
তোর বাপে কুটুক ধান।
২৯. অতি বড়ো সুন্দরি না পায় বর
অতি বড়ো ঘরনি না পায় ঘর।
৩০. দিন যায় ক্ষম থাকে
ঘা পালায় দাগ থাকে।
৩১. আগুত ভাত পাছুত পানি
ওয়াকে কহে কাথবানি (দুষ্টমতি বউ)
৩২. জল, জঙ্গল, নারী এই তিনজন জানের বৈরী।
৩৩. ডালের মধ্যে ঠাকুরী, কুটুমের মধ্যে শ্বাশুরী।
৩৪. ধান বেচনু পাইকারের লুগুত (নিকট)
বেটা বেচনু বহুর লুগুত।
৩৫. পাছাত নাই চাম, হলদিবাড়ি গ্রাম।
৩৬. ফিকিরে ফন্দি বাড়ে।
৩৭. চোরের মার গালা বড়ো।
৩৮. বাড়ির গরু দুয়ারের ঘাস খায় না।

www.pathagar.com

৩৯. জাতের মেয়ে কালো ভালো
নদীর পানি ঘোলা ভালো।
৪০. জাত নি ছাড়ে জাত পানা
হলদি নি ছাড়ে রং
সাত ধোয়া দিলেও শুটকির নি পালায় গন (গন্ধ)।
৪১. বাপে না পুতে।
চঙ্গা ধরে মুতে।
৪২. উঁরির মুখ দড়ো।
৪৩. কি খাবার খাবো রে মন, বিহা নি হইতে
কেত যাবার যারো রে মন, ছোয়া নি হইতে।
৪৪. হাজারিক না কহি বাজারি
সখক না করি ভয়
খুচরা-খুচরি মহাজন থাকিলে
আগোত দিবা হয়।
৪৫. বড়ো লোকের জুতা বহে খাই
তে গরিবের দুয়ারত নি যাই।
৪৬. কাটা মাড়ায় যদি হয় টান
তাহলে কার্তিকে পারে ধান।
৪৭. বাড়ির বোগলের খাটা আমডাই মিঠা,
(অর্থাৎ বাড়ির কাছের টক্ আম গাছটাই মিষ্টি)
৪৮. ছোয়াক না দেখাইস হাট
বুড়াক না দেখাইস খাট।[১]
৪৯. শাউনের বারো ভাদরের তেরো
যাহে যত লাগাইতে পারো।[২]
৫০. মাঘে জার না মেঘে জার
বহে বাতাশ লাগে জার।[৩]
৫১. উনো বর্ষায় দুনো শীত।[৪]
৫২. অসৎ প্রতিবেশী, ভেজা খড়ি, ঝগরাটে নারী
থাকে তার অশান্তি সংসারে।[৫]
৫৩. ঘোড়ার পিছে, সরকারি কর্মচারীর আগে আগে
বেশি ঘোরাফেরা ভালো নয়।[৬]
৫৪. কাটা মাড়ায় যদি হয় টান
তাহলে কার্তিকে পাবে ধান।[৭]
৫৫. খাবা জানলে চাউল্লাই চুড়া
বসবা জানলে মাটি খানেই পিড়া।[৮]
৫৬. বাড়ির নাই ভাত ধাপত চুলা
ঘর ঘর বেড়াছে ধুতি ঝুলা।[৯]
৫৭. নুন আনতে পানতা ফুরায়।[১০]
৫৮. মুই আসনু ধায়া তুই আছিস উসনা কালাই যায়া।[১১]

www.pathagar.com

৫৯. আম পাকিলে মিঠা বুড়া পাকিলে তিতা।[১২]
৬০. উড়াইলে পিনাহলে বেটি,
নেপলে পুছলে টাটি।[১৩]
৬১. একলা ঘরে একলা নারী খাবার বড়ো সুখ
মারবার আছে ধরাবার এ বড়ো দুঃখ ।[১৪]
৬২. কথায় কথায় রাগে
খাবার পড়ে হাগে, সুখ নাই তার ভাগে।[১৫]
৬৩. কন্যা লাগে দাদা ঐ রকম জল ভাসা সাবান যেমন।[১৬]
৬৪. কপালে যদি থাকে দড়ি না লাগে চুরি আর দারি।[১৭]
৬৫. কপালে যদি থাকে ধন বহে আনে দিবে চৌদ্দ জন।[১৮]
৬৬. কষ্ট করে বেটা পড়ালাম, ষোল কে বলে আট
বউমার জন্য বাড়ি ঘেরলাম বহু করে হাট।[১৯]
৬৭. ধুলায় ধূতি নষ্ট তেলে কাপড় নষ্ট
পুরুষ নষ্ট মাঠে নারী নষ্ট নদীর ঘাটে।[২০]
৬৮. কামনি কাজনি বেটি মুখ বাজায় খাইস
ঝাকানি ঝুকানি বেটি বিচোত সুতপা যাইস।[২১]
৬৯. কেদুর যাবোরে মন বিহা নি হইতে
কি কি খাবোরে মন ছুয়া নি হইতে।
৭০. জায় নি জানে ধান উষ্কাবা (সিদ্ধ করতে)
তায় যাছে পালা রানভা । (পলাও রাঁধতে)
৭১. চোখ টিপ টিপ নেঙ্গটি ঢিল,
তাকে চিনা বড়ো মুশকিল।[২২]
৭২. ছুয়া হাগিলে তরে, বুড়া হাগিলে মরে।
৭৩. ছুয়ার ভোক চখোত, বুড়ার ভোক পেটোত।
৭৪. গেল তে গেল মোর দুপয়সা দামের হাড়িটা তোল[২৩]
কুকুরটাতো রচনা তোল।
৭৫. খুচরা কাজের মুজরাইনি
পন্তা ভাতের নামেইনি।
৭৬. পায়সা দে কিনিম দই
গোয়ালিনী মোর কিসের মই।[২৪]
৭৭. নিজের লবণ ধার দে
ঝিঙ্গা আন্ধে ক্ষার দে।[২৫]
৭৮. নিজের কদু লেলায় বেড়ায়
পরের কদুত ঝিঙ্গ দে বেড়ায়।[২৬]
৭৯. মা মরলে মাউড়িয়া
বাপ মরলে দেউনিয়া।[২৭]
৮০. যার বেহা তার ফম নাই
পাড়া পড়শির ঘুম নাই।[২৮]

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. রুকনুজ্জামান ডলার (৩৪), পিতা : নুরুল ইসলাম, গ্রাম : সহদর, উপজেলা :রানীশংকৈল, জেলা : ঠাকুরগাঁও
২. ঐ।
৩. ঐ।
৪. ঐ।
৫. ঐ।
৬. ঐ।
৭. তাজুল ইসলাম(৪৩), সহকারী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, রানীশংকৈল কলেজ, ঠাকুরগাঁও
৮. ঐ।
৯. ঐ।
১০. ঐ।
১১. ঐ।
১২. রুকনুজ্জামান ডলার(৩৪), পিতা : নুরুল ইসলাম, গ্রাম : সহদর, উপজেলা :রানীশংকৈল, জেলা : ঠাকুরগাঁও
১৩. ঐ।
১৪. ঐ।
১৫ . ঐ।
১৬. এ।
১৭. তাজুল ইসলাম(৪৩), সহকারী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, রানীশংকৈল কলেজ, ঠাকুরগাঁও
১৮ শামীমা আক্তার(২৩), পিতা : আক্তার হোসেন, গ্রাম : সহদর, উপজেলা :রানীশংকৈল, জেলা : ঠাকুরগাঁও
১৯. ঐ।
২০. ঐ।
২১. মোছাঃ সুমী (৪৫), গ্রাম : সহদর, উপজেলা :রানীশংকৈল, জেলা : ঠাকুরগাঁও
২২. ঐ।
২৩. এ।
২৪. সুরুজ আলী(৩৩), পিতা আলী, গ্রাম : সহদর, উপজেলা :রানীশংকৈল, জেলা : ঠাকুরগাঁও
২৫. ঐ।
২৬. ঐ।
২৭. ঐ।
২৮. ঐ।

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস

গ্রামীণ নিরক্ষর লোকসমাজে প্রচলিত সকল আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আচরণাদির মধ্যে মানসিক ক্রিয়াদির মধ্যে বিশ্বাস ও সংস্কার মিশে থাকে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহকেন্দ্রিক বিভিন্ন লোকাচারের মধ্যে লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাস বিদ্যমান। জাদুক্রিয়া, টোটেমবাদ, ট্যাবু, সর্বপ্রাণবাদ এ সবই লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের মধ্যে বিদ্যমান।

'লোকবিশ্বাস', ও 'লোকসংস্কার' শব্দ দু'টির সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। ইংরেজি 'Folk belief' ও 'Superstition' এর প্রতিশব্দ হিসেবে শব্দ দু'টিকে গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বাস মতে, বস্তু বা বিষয়গুণের ধারণা থেকে বিশ্বাসের জন্ম হয়। কিন্তু বিষয়ের কার্যকর সম্পর্কে প্রতীতি যখন সত্য ও বাস্তব ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তখন তার বিশ্বাসের অঙ্গ হয়েও জ্ঞান নামে অভিহিত। কিন্তু কার্যকর সম্পর্কে অজ্ঞাত মন যখন বস্তু, ভাব, বিষয় বা ঘটনার গুণধর্মে অমূলক আস্থা স্থাপন করে এবং তার অলৌকিক ফলাফল সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করে তখনই এক একটি অন্ধ বিশ্বাসের জন্ম হয়। অশিক্ষিত ও কু-শিক্ষিত মনই এরূপ বিশ্বাসের ধারক। মনের আকাশে অনেক বিশ্বাস অদৃশ্য ধূলিকনার ন্যায় ভেসে বেড়ায়, সেগুলো অজ্ঞাতানুসারে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিছু লোকবিশ্বাস মানুষের আচার-আচরণ দ্বারা সমর্থিত হয়ে জীবন যাত্রার পথে স্থায়ী ও প্রথাগত স্বীকৃতি লাভ করে। ক্রমে এগুলো মনের গভীরে স্থান পায়। বিশ্বাস ও সংস্কারের কার্যকরণ সম্পর্কে লোকের ধারণা অস্পষ্ট ও অব্যাখ্যাত হলেও সব কিছুই মূঢ়তাপ্রসূত নয়। অনেক সময় মানব জীবনে অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতি নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়-

(ক) বৎসরের শুরুতে সরিষা বাটা, হলুদ বাটা বা ভালো সাবান দিয়ে গোসল করলে শরীরে খোশ-পাঁচড়া হয় না।

উপর্যুক্ত লোকবিশ্বাসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য পরিলক্ষিত। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে হলুদ শরীরের রোগ প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। ত্বকের লাবণ্য বৃদ্ধিতে এর জুড়ি নেই। এ প্রসঙ্গে সরিষা বাটা ও সাবান দিয়ে গোসল করার প্রসঙ্গ টানা যায়। শরীরের তৈলাক্ততা বৃদ্ধি ও ময়লা পরিষ্কারে খৈল ও সাবান উভয়ই বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এক সময় যখন সাবানের ব্যবহার ছিল না তখন সাবানের বিকল্প হিসেবে সরিষার খৈল ব্যাপক ব্যবহৃত হতো। এখনও গ্রাম বাংলায় এর ব্যবহার লক্ষণীয়। লোকমনের এ বিশ্বাস অস্বাভাবিক নয় কারণ এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা। খনার বচনগুলোতে প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে জ্যোতিষী যে মন্তব্যগুলো করেছে, তার পেছনেও অভিজ্ঞতার ব্যবহারিক তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। অতএব, লোকবিশ্বাসের সবই অজ্ঞাত প্রসূত, তামসাবৃত ও

www.pathagar.com

প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ এ কথা বলা যায় না। অসহায় মনের মধ্যে কুসংস্কারের জন্ম হয়। যেমন-

(খ) সন্ধ্যায় প্যাঁচা ডাকলে গৃহে ঝগড়া লাগে।

উপর্যুক্ত সংস্কারটির কোনো ভিত্তি নেই। আজও এর প্রমাণ মেলেনি কিংবা নিষ্ঠাবহুল কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে লোকসমাজ দীর্ঘকাল ধরে এতে বিশ্বাসী। "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর" গ্রামীণ জীবনের সহজ সরল মানুষের কাছে বিশ্বাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি বা প্রত্যয়। তাদের এই বিশ্বাসের অনেক কিছুই ঐতিহ্যিকভাবে পাওয়া। অনেক কিছুর ক্রমোন্নতির পরে বিশ্বাসগুলো বা নিয়মগুলো যথারীতি মেনে চলা হয়।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা সে নিয়ম বা প্রথাগুলো মানতে না চাইলেও তাদের বাবা মায়ের আদেশ বা পরামর্শের জন্য এরিয়ে যেতে পারে না। অনেক সময় অথবা না মানার ঝুঁকি নেওয়ার পরীক্ষায় অংশ নিতে চায় না।

এজন্য ভালো কি মন্দ ঠিক না বেঠিক সে তর্কে না গিয়ে বলা যেতে পারে বহু দিনের লালিত সংস্কার বিশ্বাস যথা পূর্ব নিয়মে মেনে চলা হয়। যেমন–

১. সকল ধর্মের অনুসারীরাই রবিবারে বাঁশ কাটে না। স্থানীয় অনেক লোকেই বিশ্বাস করে রবিবার অশুভ দিন। সেই সঙ্গে বিশ্বাস করে রবিবার বাঁশ কাটলে ঐ বাঁশের থোপের বংশ বৃদ্ধি হবে না।
২. এই এলাকার লোকেরা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বুধবারে মেয়েকে বাপের বাড়িতে বিদায় দেয় না।
৩. শনিবার এবং মঙ্গলবার কোনো নতুন কাজের আরম্ভ বা কোথাও যাত্রারাম্ভ সাধারণত করে না।
৪. বাড়ি থেকে একবার বের হয়ে গেলে কোনো বিশেষ কারণেও পেছন ফিরে বাড়ি যাওয়াটাকে অশুভ মনে করে।
৫. বাড়ি থেকে বের হওয়ার পরে পেছন দিক থেকে কেউ ডাক দিলে অশুভ ধরা হয়। তবে মায়ের ডাকে মঙ্গল রয়েছে। বিবাহ উপলক্ষ্যে কেউ কোথাও গমন করার প্রাক্কালে কোনো ধরনের হোচট খাওয়া যাত্রা সংগীদের কারো কোনো সমস্যা হলে উক্ত পাত্র বা পাত্রি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাঁধা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
৬. পরীক্ষার হলে যাওয়ার দিন এ অঞ্চলে বাবা মা ডিম দিয়ে ভাত খেতে দিতেন না। কারণ, পরীক্ষার অকৃতকার্য হতে পারে।
৭. জোড়া লাগানো কলা খাওয়া যাবে না। এতে মেয়েদের যমজ বাচ্চা হবে। এ বিশ্বাসে গ্রামের মহিলারা জোড়া কলা এখনও খায় না। অবশ্য সদ্য বিবাহিত এবং অবিবাহিত ছেলে মেয়ে উভয়ে এ নিয়ম মেনে চলে।
৮. বাসি ঘরে অর্থাৎ ঘর ঝাড় না দেওয়া অবস্থায় বাইরে গেলে গৃহের কুমঙ্গল হয়। এ বিশ্বাস এখনও কঠোরভাবে গ্রামীণ জীবনে মেনে চলা হয়।
৯. সকালে ঘর ঝাড়ু দিয়ে স্নান সেরে রান্না ঘরে যাওয়ার রীতি অনুসরণ করা হয়। তবে এক্ষেত্রে কঠোরভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়ম মেনে চলেন গ্রামীণ হিন্দু রমণীরা।

www.pathagar.com

১০. জন্মবারে হাত পায়ের নখ এবং মাথার চুল কাটা যাবে না।
১১. সন্ধ্যায় বাতি জালাবার পরে এবাড়ি ওবাড়ি কোনো জিনিসের লেনদেন হয় না।
১২. মৃত ব্যক্তি অর্থাৎ শবদেহ দেখে কোথাও যাত্রা করা অশুভ বলে বিশ্বাস করা হয়।
১৩. রাতে মোরগের ডাক অশুভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
১৪. রাতে কুকুরের কান্নার আওয়াজ অমঙ্গলের লক্ষণ।
১৫. বাড়িতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে এবং উচ্চস্বরে কাক ডাকা অশুভ লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
১৬. মহরমের চাঁদে এবং ভাদ্র মাসে বিয়ে আয়োজন শুভ নয়।
১৭. কথার মাঝে টিক টিকি ডেকে উঠলে মনে করা হয় কথাটি ঠিক।
১৮. গোরস্থানে শ্মশানে তেঁতুল গাছে বেল গাছে ভূতের আস্থানা থাকে।
১৯. বাড়িতে নতুন গরু কিনে নিয়ে আসার পরে গরুকে কুলার উল্টার দিকে লবণ নিয়ে নতুন গরুর মুখের কাছে দেওয়া হয় এবং গরুর খুড়ায় পানি ঢেলে দেওয়া রীতি এখনও গৃহস্থ মেনে চলেন। গরু বাড়ির লক্ষ্মী এই বিশ্বাস লোকসমাজে প্রচলিত আছে।
২০. কুয়া থেকে পানি তুলতে গিয়ে যদি রশি ছিঁড়ে বা হাত ফসকে বালতি পড়ে যায়, তাহলে অমঙ্গল হয়।
২১. মাথা থেকে চিরুনি পড়ে গেলে মেহমান আসে।
২২. কাক ডাকলে মেহমান আসে, কিন্তু উচ্চ স্বরে অবিরাম ডাকলে দুঃসংবাদ আসে।
২৩. গোরস্থানে, শ্মশানে, তেঁতুল গাছে, বেলগাছে ভূত থাকে।
২৪. রাতে কুকুর ও বিড়ালের কান্না চরম অশুভ লক্ষণ।
২৫. রাতে মোড়গের ডাকও অশুভ।
২৬. রবিবারে বাঁশ কাটা অশুভ।
২৭. বর কনের জন্মবারে বিয়ে দেওয়া যায় না।
২৮. বুধবারে বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি যাওয়ার জন্য মেয়েকে বিদায় দেওয়া যায় না। এমনি অনেক উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়।

সভ্যতার যে লগ্ন থেকে বিবাহ প্রত্যয়টির পত্তন বলা যায়, সে লগ্ন থেকেই এর সঙ্গে বহু বিচিত্র আচার সংস্কারের মিশ্রণ ঘটেছে। টাঙ্গাইল জেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ সম্পর্কিত একটি বিশ্বাস বহুল প্রচলিত। যেমন- পৌষ ও চৈত্র মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ। কারণ এ মাসগুলো মঙ্গলকর নয়।[১]

এ বিশ্বাস শুধু বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলায় নয়, পাশ্চাত্য দেশেও প্রচলিত। পাশ্চাত্যবাসীদের বিশ্বাস- 'মে' মাস বিবাহের পক্ষে মোটেই শুভ নয়। স্কটল্যান্ডের একটি বহু প্রচলিত সংস্কার হলো 'Marry in May, rue for aye'।[২] টাঙ্গাইল অঞ্চলে শ্রাবণ মাস সম্পর্কে একটি সংস্কার রয়েছে। এ অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস শ্রাবণ মাসে বিবাহ হলে কনে বিধবা হবে। অবশ্য এ বিশ্বাসের মূলে একটি পৌরাণিক কাহিনির

www.pathagar.com

উল্লেখ পাওয়া যায়। কাহিনির খণ্ডাংশস্বরূপ- বেহুলা লখিন্দরের বিবাহ হয়েছিল শ্রাবণ মাসে এবং বেহুলা বিধবা হয়েছিলেন। মনে হয় এ কারণেই আমাদের সমাজে লোকবিশ্বাস আজও ক্রিয়াশীল।

মানুষের একান্ত কামনা সন্তান লাভ। সন্তান লাভের জন্য সে চিরদিন আবেগে আপ্লুত। সন্তান ধারণ ও লালন পালন যে মানুষের গভীর মনোবাসনার ফলশ্রুতি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রজন্ম পরম্পরায় সৃষ্টিধারা অক্ষুন্ন ও অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহমান। কেবল আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি নয়, ধনরক্ষা, পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের স্বপ্ন পূরণ এবং আনন্দ লাভের জন্যও সে সন্তান কামনা করে। সন্তানহীন নর-নারী লোকচক্ষে হেয় 'আঁটকুড়ে' পুরুষ ও 'বাঁজা' নারী সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়। এদের মুখ দেখা 'যাত্রানাস্তি'র লক্ষণ বলে লোকসংস্কার আছে। যৌনসম্ভোগ দাম্পত্য জীবনের প্রধান লক্ষ্য হলেও এর চরম সার্থকতা সন্তানকে কেন্দ্র করেই। নর-নারীর মিলন আনন্দঘন হতো না, যদি না আত্মজ এসে মায়ার বন্ধন রচনা করতো।

কেবল ঐহ্যিক প্রয়োজনে নয়, পারত্রিক চিন্তাতেও সন্তানের জন্য মানুষ ব্যাকুল। হিন্দুদের বিশ্বাস সন্তানের হাতের মুখাগ্নিতে পিতামাতা 'পুৎ' নামক নরক থেকে মুক্তি পায়। মুসলমানের বিশ্বাস, ছেলেমেয়ের দোয়া-দরুদ ও দান-খয়রাতে পিতামাতার আত্মার মঙ্গল হয়।

বাস্তবক্ষেত্রে আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার তাগিদই প্রবল। ব্যক্তিজীবন ও সমষ্টি জীবন উভয় ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য। আরণ্যক জীবনে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বন্য পশুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষের জনবল প্রয়োজন ছিল। রাষ্ট্রীয় জীবনে জনগণের শ্রম, শক্তি ও সাধনার দ্বারাই জাতির সকল প্রকার নিরাপত্তা রক্ষা পায়। অতএব মানুষের সন্তান চাই।[৩] তবে সেই সন্তানও যেন সুষ্ঠু স্বাভাবিক দেহ নিয়ে পৃথিবীতে আসে এক্ষেত্রেও কিছু বিশ্বাস লোকসমাজের মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, শুধু বিবাহ নয় বিবাহ পরবর্তী জীবনে সুসন্তান কামনায়ও অনেক লোকবিশ্বাস, সংস্কার আমাদের লোকসমাজে যুগপরম্পরায় লালিত ও প্রচলিত।

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকে। বিশেষ করে ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছাস প্রায় প্রতি বছর লেগেই থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে এ দেশের মানুষ বিভিন্ন বিশ্বাসের দ্বারা তাড়িত হয়ে কিছু আচার-আচরণ করে।

বাংলার মুসলিম সমাজে এ রকম পরিস্থিতিতে আযানের মাধ্যমে আল্লাহর প্রার্থনা করা হয়। আবার প্রবল ঝড়ের সময় উঠানে পিড়ি পেতে দেয়া হয় এবং বলা হয় পবন-বসো, পবন-বসো। এতে ঝড় প্রশমিত হবে বলে লোকমানুষের বিশ্বাস।[৪]

লোকাচার, লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাসকে আপাতদৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন বলে মনে হয়। তবে এসবের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। সংহত জনগোষ্ঠী কর্তৃক পুরুষাণুক্রমে লালিত এই লোকাচার বা Folk Ritual। তবে একই লোকাচার দেশ কাল পাত্র ভেদে অভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ নাও করতে পারে। যেমন- আমাদের সমাজে

www.pathagar.com

জমিতে প্রথম ধান লাগানোর সময় কৃষক তার শরীর পবিত্র করে অদৃশ্য ধান্যদেবতাকে স্মরণ করে। এ সময় গৃহে সবাই নিরামিষ খায়। ড. রিচার্ড এরেন্স এ ধরনের একটি লোকাচারের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ফিলিপিনোদের মধ্যে যারা পৌত্তলিক তাঁরা ধান রোপনের পূর্বে বজ্র-সূর্য-বিদ্যুৎ-চন্দ্র ও বৃষ্টিকে মিনতি জানায়। তাঁরা বিশ্বাস করে যে তাদের পূর্বপুরুষরা ক্ষেত্র দেবতারূপে তাদের শস্যক্ষেত্রে অবস্থান করে। অতএব তাদের সন্তুষ্ট করতে একটি শূকর ও একটি সাদা মোরগ বলি দিয়ে শস্যক্ষেত্র প্রস্তুতির অনুমতি নিতে হয় এবং ধান রোপনের আগে বন্ধু-বান্ধব সবাই মিলে মাছ, মাংস ইত্যাদি ভক্ষণ মাঠে বসেই করতে হয়। এরপর ক্ষেত থেকে ঘরে ফিরে আয়োজিত হয় নাচ গানের আসর। আসর শেষে কৃষক মাঠে গিয়ে যদি দেখে এতটুকু পরিমাণ খাদবস্তু অবশিষ্ট নেই, তবেই তার বিশ্বাস, দেবতা তুষ্ট হয়েছেন এবং এ সময় ধান লাগালে ধান ভালো জন্মাবে, নতুবা নয়। তবে অঞ্চলভেদে ধান রোপনকে কেন্দ্র করে কৃষকেরা বিভিন্ন সংস্কার সৃজন ও লালন করে। যেমন- উত্তরবঙ্গে 'গোচরপনা' নামে ধানরোপন কেন্দ্রিক এক জাতীয় আচার পালন করা হয় এবং টাঙ্গাইল জেলায় জমিতে চারা রোপনের পূর্বে কৃষকেরা পবিত্র শরীরে ভালো খাবার খেয়ে জমিতে যায়। তাদের বিশ্বাস এতে জমিতে ভালো ফলন হয়।

লোকাচার কেবল কৃষিকে ঘিরে জন্ম নেয় না বরং মানব জীবনের সকল দিক নিয়েই তা গড়ে ওঠে। জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই রয়েছে লোকাচারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। যেমন বিয়ে সংগীতে রয়েছে উর্বরতামূলক উপাদানের প্রাচুর্য। বিয়েতে কনের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় পান-সুপারি। প্রেতাত্মার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হাতে দেওয়া হয় বিশেষ কোনো গাছের ডাল বা হাড়। কনেকে বরণ করার সময় মুখে দেওয়া হয় দুধ, আয়োজন করা হয় কড়ি খেলার। এসবই ফার্টিলিটি কাল্টের বিশ্বাস সংবলিত লোকাচারে দৃষ্টান্ত।[৫] হিন্দু সমাজের ন্যায় মুসলিম সমাজেও নানা রকম লোকাচার পালিত হয়। পালিত হয় সমস্ত বিশ্বের লোকসমাজে। বিয়ের অনুষ্টানে নাচের ব্যবস্থাও থাকে সর্বক্ষেত্রে।

অনেক সময় লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার ও লোকাচার আপাতদৃষ্টিতে অমূলক মনে হতে পারে। কিন্তু সংস্কার বিশ্বাস মাত্রই অমূলক নয়। সংস্কার, বিশ্বাস ও লোকাচারের অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও নৃতাত্ত্বিক মূল্য রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। যেমন- 'মাস' কেন্দ্রিক সংস্কারের ক্ষেত্রে পৌষ মাসকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর কারণ অর্থনীতি। কৃষিই আমদের অর্থনীতির মূল উৎস। পৌষ মাসে প্রচুর ধান কৃষকের ঘরে ওঠার ফলে তাঁরা কিছুটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে। তাই পৌষ মাসে হয় লক্ষীর আরাধনা। প্রবাদেও পৌষ মাসকে গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে, 'পৌষ মাস চাষার আশ'।

বিশ্বাস আছে যে, আমাদের পূর্ব পুরুষেরা প্রেতাত্মা হয়ে মর্ত্যে ঘুরে বেড়ান। এই প্রেতাত্মার হাত থেকে রক্ষা পেতে তার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আচার-আচরণ, পূজা-পার্বণ পালন করা হয়। নৃতত্ত্বের পরিভাষায় একে বলে Animism বা আত্মাবাদ। আমাদের

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস, সংস্কার ও লোকাচারগুলোকে নৃতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণের অনেকেই প্রয়াস পেয়েছেন। নৃতত্ত্ব বা নৃবিজ্ঞান হলো জ্ঞানের একটি শৃঙ্খলা আর নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি তারই প্রায়োগিক দিক। নৃতত্ত্ব ধারণ করে মানুষের সার্বিক পরিচয়। অতএব নৃবিজ্ঞান বিশেষ করে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের সঙ্গে মানব সংস্কৃতির সম্পর্ক গভীর। যেমন উল্লেখ করা যেতে পারে বিয়েতে যেসব স্ত্রী আচার অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো কড়ি খেলা ও কনের হাতে ডাল বা হাড় ধরানো। কড়ির আকৃতি ও ডাল বা হাড়ের আকৃতির সঙ্গে যথাক্রমে স্ত্রী ও পুরুষের গোপন অঙ্গের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

উভয়ের যৌন মিলন যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তাই বিয়ে অনুষ্ঠানে পালিত হয় এ লোকাচার । হিন্দু সমাজে বিয়ের লোকাচার পালনকালে শঙ্খের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষণীয়। বর-বধূকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত করা হয় যে বরণ ডালা তাতেও নানা মাঙ্গলিক জিনিসের মধ্যে থাকে শঙ্খ।[৬] কনের হাতে পরিয়ে দেওয়া হয় পলা, পায়ে পরিয়ে দেওয়া হয় আলতা ও মাথায় সিঁদুর। কারণ আমাদের দেহের রক্ত লাল, রক্তবর্ণকে যৌন ভালোবাসার সঙ্গে যুক্ত করে দেখা আদিম সমাজের রীতি। আবার হাতের শাখা হিন্দু রমণীদের কাছে পরম পবিত্র ও মূল্যবান অলংকার বলে গণ্য। স্বামীর মঙ্গল কামনায় স্ত্রীর হাতের শাঁখা তার মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে জড়িত। তাই তা কখনো না খোলার সংস্কার সমাজে প্রচলিত।

অতএব সমাজ সত্যের বহুবিধ উপকরণ লোকসমাজের এইসব বিশ্বাস সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠানে কিংবা ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে। এ কথা সচেতন অনুসন্ধানী দৃষ্টি রাখলেই উপলব্ধি করা যায়।

মাজার

মাজার আরবি শব্দ এর প্রতিশব্দ দরগাহ্ বলে। এর ধাতুগত অর্থ যিয়ারতের স্থান। মাজার বলতে সধারণত আউলিয়া-দরবেশগণের সমাধিস্থলকে বোঝায়। মাজারকে রওযা বা কবরও বলা হয়। এর নিকটবর্তী স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা, মকতব, গোরস্থান ইত্যাদি গড়ে উঠে। মাজারের প্রতি মুসলমানদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় সুফি তরিকাগুলোর প্রভাবের ফলে। সুফিতত্ত্বের অনুসারী মুসলমানরা সুফি দরবেশদের কবরস্থান যিয়ারত করতে পছন্দ করেন। অনেক মাজারে সমাধিস্থ ব্যক্তির উরস অর্থ্যাৎ জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। একে ঈসালে ছওয়াবের মাহফিল বলে। ঐতিহাসিক মাজারগুলো রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য ওয়াকফ সম্পত্তি থাকে এবং খাদিমও থাকেন অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা উত্তরাধিকারসূত্রে অধিষ্ঠ হন। ঠাকুরগাঁও জেলাতে আরব ও ভারত উপমহাদেশে বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে আগত ইসলাম প্রচারক আওলিয়া দরবেশদের মাজারগুলো এখনও বিদ্যমান।

উক্ত থানাতে ৯ তারিখ ও ১০ তারিখ এই দুই দিন তথ্য সংগ্রহ করেছি। এই দুই দিনে যে মাজারের তথ্য সংগ্রহ করেছি তাহলো- নেকমরদ পীরের মাজার, সকিনা

www.pathagar.com

বিবি, ঘোড়া পীর, বুড়া পীর, পাঁচপীর, শিয়ালগাজী, বনপীর এছাড়াও আরও অনেক মাজার ছিল তা সময় সাপেক্ষে তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। সংগৃহীত তথ্যের আলোক চিত্রসহ নিচে দেওয়া হলো।

নেকমরদ পীরের মাজার

ঠাকুরগাঁও জেলার এবং রানীশংকৈল থানার সবচেয়ে নামকরা মাজার বা উচ্চ মাপের পীর হলেন নেকমরদ পীর। এই পীরের মাজারের কথা সব জায়গাতে শোনা যায়। পীরের আসল নাম শেখ নাসির উদ্দীন। নেকমরদ এই জায়গার আগের নাম ছিল ভবানন্দপুর। শেখ নাসির উদ-দীন এই এলকায় আসার পর তাঁর অলৌকিক শক্তির কারণে নেকমরদ উপাধি পান। পরে তাঁর নামেই এলাকাটি নেকমরদ নামে পরিচিত।

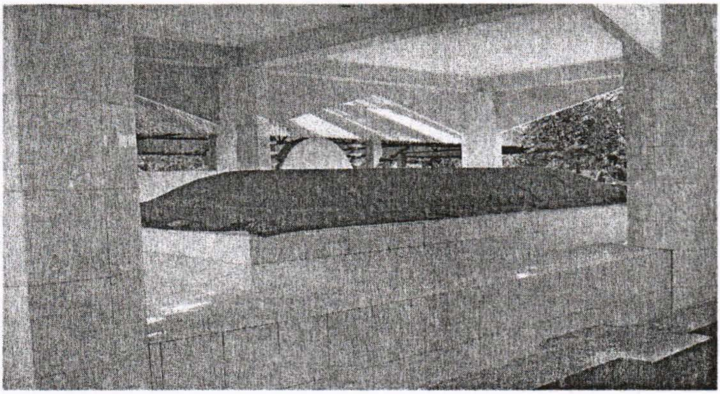

নেকমরদ পীরের মাজার

মাজারের অবস্থা : নেকমরদ পীরের মাজার দেখতে অনেক সুন্দর। মাজার উঁচু এবং পাকা করা। নেকমরদের পাশে ছোটো ছোটো কবর আছে। এই দুটো কবর কার কেউ নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না।

মাজারের অবস্থান : রানীশংকৈল উপজেলা থেকে প্রায় ৯ কি.মি. দূরে নেকমরদ বাজার, নেকমরদ বাজার থেকে ০.৫ কি.মি. পূর্বে যেতে রাস্তার সাথে হাতের বামে মাজারটি। মাজারের সাথে পশ্চিমে মসজিদ আর পূর্বে মাদ্রাসা আছে।

অনুষ্ঠান : মাজারে প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার বিভিন্ন জায়গা হতে মানুষ আসেন, মানত ও অনুষ্ঠান করেন। এছাড়াও প্রতি বছর পীরের মৃত্যু দিন উপলক্ষে মেলা বসে। এই মেলা এক মাস ধরে চলে।

মাজারে মানতের উপকরণ : মাজারে গরু, ছাগল, মুরগি, হাঁস, কবুতর, মিষ্টি, চাল, ডাল, আগরবতি, গোলাপজল, টাকা ইত্যাদি।

মাজার কেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও সংস্কার : মানুষ যখন কোনো কঠিন বিপদে পরে তখন মাজারে এসে পীরের কাছে মানত করে। এ ধরনের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া গেছে।

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস, এই পীরের মাজারে গেলে বিভিন্ন ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

সন্তানহীন নারী পীরের মাজারে এসে পীরের দরবারে মানত করে, যাতে পীরের দোয়ায় সন্তান হয়। এ ধরনের লোকবিশ্বাস এখনও আছে । এর জন্য মানুষ বিভিন্ন জায়গা হতে এই পীরের মাজারে আসেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভবান হওয়ার জন্য এই পীরের মাজারে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ আসে এবং মানত করে। এমন দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়।

কোনো জটিল অসুখ হলে মানুষ বিভিন্ন জায়গা হতে মাজারে ছুটে আসে। পীরের মাজারে মানত করলে পীরের দোয়ায় অসুখ ভালো হয়ে যায়। এ ধরনের লোকবিশ্বাস এখনও মানুষের মধ্যে আছে।

নতুন ঘরবাড়ি নির্মিত করলে ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে পীরের মাজারে সিন্নি দিয়ে থাকে। যাতে ঘরে কোনো বালা মসিবত না আসে। এ ধরনের লোকবিশ্বাস এখনও আছে।

অনেক শিক্ষিত মানুষ মাজারে আসে ভালো চাকরির আশায়, তাদের বিশ্বাস পীরের দোয়ায় ভালো চাকরি পাওয়া যাবে।

অনেক সময় লেখাপড়া শেষ করে বেকার অবস্থায় বসে থাকে, পীরের মাজারে এসে মানত করে যাতে পীরের দোয়ায় খুব দ্রুত চাকরি পাওয়া যায়। এ ধরনের লোকবিশ্বাস এখনও আছে।

নতুন গাড়ি কিনে আনার পর, মাজারে সিন্নি দিয়ে যায়। কারণ পীরের দোয়ায় রাস্তায় গাড়ি ভালো চলবে এবং কোনো বিপদ হবে না।

সকিনা বিবির মাজার

পুরুষদের মধ্যে আল্লাহ্ওয়ালা ও পরহেজগার ব্যক্তিদেরকে বলে পীর তেমনি নারীদেরকে বলে পীরানী। সকিনা বিবি ছিল বড়ো মাপের পীরানী। এলাকার সবাই তাকে সকিনা বিবি বলে ডাকতো। হিন্দু ও মুসলমান সবাই তাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতো। তার আসল পরিচয় বা ইতিহাস সম্পর্কে কেউ সঠিক তথ্য দিতে পারেনি। তবে এলাকার মুরব্বি আমাদের জানায় তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শুনেছে মাজারের কথা। পীরানী ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রায় ৫০০ বছর আগে আসেন। পীরানীর লিখিত কোনো দলিল পাওয়া যায় নি।

মাজারের অবস্থা : প্রথম অবস্থায় সকিনা বিবির মাজার মাটির ঢিপির মতো ছিল, গোরস্থান কর্তৃপক্ষ মাজারটিকে প্রায় ৩৭ বছর আগে পাকা করে। আর মাজারের পাশে একটা বড়ো দিঘি আছে। দিঘির গভীরতা অনেক বেশি কখনো পানি শুকায় না। আশে পাশে কোনো বাড়িঘর নেই। চারিদিকে সবুজ মাঠ এক সময় এই এলাকায় জনবসতি ছিল বলে এলাকার মানুষ জানায়। বর্তমানে এর কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

সকিনা বিবির মাজার

মাজারের অবস্থান : সন্দরাই গ্রামে সকিনা বিবির মাজার অবস্থিত। চাঁদনী রোড থেকে মহনবাড়ি রোড সোজা ২ কি.মি. উত্তরে মাঠের মধ্যে অবস্থিত। মাজারের পাশে একটা বড়ো দিঘি আছে।

ধর্মীয় ব্যবস্থা : সকিনা বিবির মাজারে সকল ধর্মের মানুষ আসে। এই পীরানীকে সকলেই বিশ্বাস করে এবং সকলেই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। সবাই মানত করে এবং মনের বাসনা ব্যক্ত করে।

মাজারে মানতের উপকরণ : সকিনা বিবির মাজারে কোনো গরু মানত হয় না। কারণ হিসেবে বলে এখানে সকল ধর্মের মানুষ আসে। মানত হয় ছাগল, মুরগি, হাঁস, কবুতর, চাল, ডাল, মিষ্টি, আগরবাতি, গোলাপজল, টাকা-পয়সা ইত্যাদি।

অনুষ্ঠান : সকিনা বিবির মাজারে প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার লোকজনের সমাগম হয়। এছাড়া প্রতি বছর ফাল্গুন চৈত্র মাসে ওরশ হয়। নির্দিষ্ট কোনো তারিখ নেই তবে ধানের ফসল কাটার সময় আয়োজন করে। এখানে রংপুর জেলার মানুষ বেশি আসে। অনুষ্ঠানের দিন মানতের জিনিস দিয়ে রান্না করে সবার মাঝে সিন্নি বিতরণ করে। কোরআন ও হাদিসের আলোকে আলোচনা করা হয়।

মাজার কেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও সংস্কার: সকিনা বিবির মাজারে নেক আশা নিয়ে এসে মানত করলে মনের আশা পূরণ হয়। এখনও মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে মাজারে মানত করার জন্য আসে ।

মাজারের পাশে একটা বড়ো বাঁশের ঝাড় আছে সেই ঝাড় থেকে বাঁশ কাটার পূর্বে সকিনা বিবির মাজারে আগরবাতি বা ধূপকাঠি জ্বালাতে হয়। তা না হলে যে বাঁশ

www.pathagar.com

কাটে তার নানা অসুখ হয়। এলাকার মানুষ এ ধরনের আচার-বিশ্বাস এখনও পালন করে ।

কোনো জটিল অসুখ হলে সকিনা বিবির মাজারের মানত করলে অসুখ ব্যাধি ভালো হয়। এখনও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। নিজ এলাকা বা দূর এলাকার মানুষ এই মাজারে আসে।

অনেক সময় কুমারী মেয়েরা ভালো স্বামীর জন্য বিবি সকিনার মাজারে আসে। মানুষের বিশ্বাস বিবি সকিনার দোয়ায় ভালো স্বামী পাওয়া যাবে।

দিঘিটি অনেক বড়ো প্রায় ১৩ বিঘা জমি নিয়ে এর অবস্থান। দিঘিতে অনেক বড়ো বড়ো মাছ আছে। আর এই মাছ ধরার জন্য সকিনা বিবির মাজারে মানত করতে হয়, তা না হলে ঐ মাছ ধরে রান্না করলে সিদ্ধ এবং স্বাদ হয় না, এলাকার মানুষ জানায়। মানুষের মাঝে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়ার কারণে মানুষ মাছ ধরার পূর্বে মাজারে মিলাদ মাহফিল বা মানত করে থাকে। এ ধরনের আচার বিশ্বাস এখনও পালন করে থাকে।

সকিনা বিবি ছিল বড়ো মাপের পীরানী। তার মাজারের পাশে যেতে হলে সব সময় পাক পবিত্র অবস্থায় যেতে হয়। তা না হলে সমস্যা হয়, এলাকার মানুষ জানায়। উদাহরণস্বরূপ তিন মাস আগেকার ঘটনা– পাশের গ্রামের একটি মেয়ে তার ঋতুকালে মাজারের কাছে যায়। এরপর তার জটিল অসুখ হয় এবং কিছু দিন পরে মারা যায়। এছাড়াও এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে বলে জানায় গ্রামবাসি । ফলে মানুষের মনে একটা বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায়, যা এখনও বহাল আছে।

ঘোড়া পীরের মাজার

এই পীর ঘোড়ায় চড়ে আসেন, তাই পীরের নাম হয়েছে ঘোড়া পীর। পীরের আসল নাম কুতুবউদ্দীন। পীরের মাজারের মাটির তৈরি ছোটো ছোটো ঘোড়া দিয়ে মানত করা হয়। তবে এটি প্রতীকী মাজার, এখানে পীর সাহেব সায়িত নেই। মানতকারীর মনের আশা পূরণ হলে, ঘোড়া সরিয়ে দেওয়া হয়। মাজারের খাদেমের মতে পীর এখানে একবার এসেছিলেন। কিন্তু এই পীর কবে এখানে আসেন তা সঠিকভাবে বলতে পারে না। তবে আনুমানিক ৩০০ বছর আগে এখানে আসেন বলে জানান এই মাজারের খাদেম।

মাজারের অবস্থা : এই মাজারের কোনো চিহ্ন নাই। তবে একটি বটগাছ আছে, গাছের সাথে সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে পীরের নাম উল্লেখ করেছেন। আর চারদিকে বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘেরা।

মাজারের অবস্থান : গোগর থেকে দক্ষিণে প্রায় ৮ কি.মি. দূরে বি.ডি.আর. রোড যেতে হাতের ডানে রাস্তার পার্শ্বে কচুল গ্রামে ঘোড়া পীরের মাজার।

www.pathagar.com

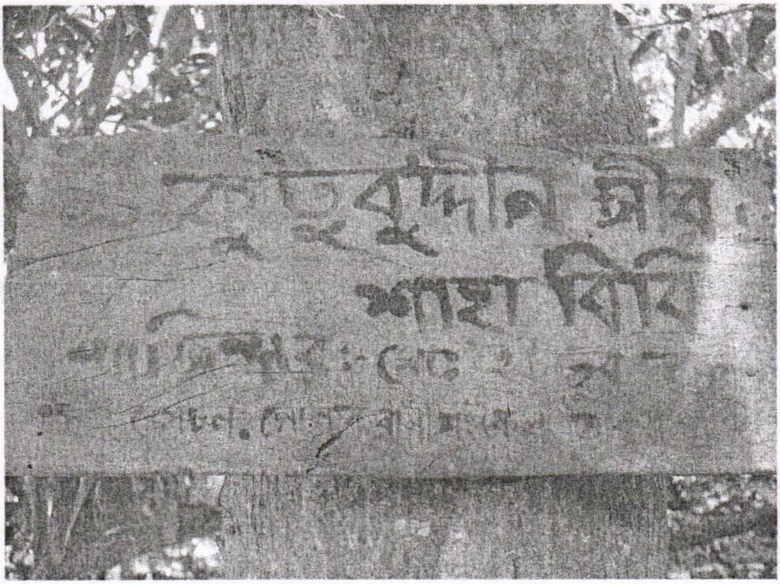

কুতুবুদ্দীন পীর বা ঘোড়া পীরের মাজার ও শাহা বিবির মাজার

মাজারের অবস্থা : এই মাজারের কোনো চিহ্ন নাই। তবে একটি বটগাছ আছে, গাছের সাথে সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে পীরের নাম উল্লেখ করেছেন। আর চারদিকে বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘেরা।

মাজারের অবস্থান : গোগর থেকে দক্ষিণে প্রায় ৮ কি.মি. দূরে বি.ডি.আর. রোড যেতে হাতের ডানে রাস্তার পার্শ্বে কচুল গ্রামে ঘোড়া পীরের মাজার।

ধর্মীয় ব্যবস্থা : পীর সাহেব ছিলেন মূলত মুসলমান। কিন্তু সকল ধর্মের মানুষ পীরের দরবারে এসে বিভিন্ন জিনিস মানত করে। পীর ছিলেন অসম্প্রদায়িক। হিন্দু ও মুসলিম কোনো ভেদাভেদ ছিল না। সবাই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে এবং বিভিন্ন মানত নিয়ে আসে। পীরের দরবারে বিভিন্ন গান বাজানা হয়। গানের মাধ্যমে পীরকে স্মরণ করে। গানের মাধ্যমে মনের সব আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে।

অনুষ্ঠান : ঘোড়া পীরের মাজারে প্রতি বৃহস্পতিবার মানুষ বিভিন্ন মানত নিয়ে আসে। এছাড়াও প্রতি বছরে অগ্রহায়ণ মাসে ১৫ তারিখে অনুষ্ঠান বা ওরশ করে। এই দিন বিভিন্ন জায়গা হতে মানুষ আসে, পীরকে কেন্দ্র করে গান বাজনা করে। মানতের জিনিস দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে সবাই খায়।

মাজারে মানতের উপকরণ : ঘোড়া পীরের মাজারে মানত হিসেবে দেওয়া হয়- ছাগল, মুরগি, হাঁস, কবুতর, চাল, ডাল, মিষ্টি, আগরবাতি, গোলাপজল, টাকা-পয়সা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

মাজার কেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও সংস্কার : পীর বিশ্বাসী মানুষের কোনো অসুখ হলে, এই পীরের মাজারে ছুটে আসে। পীরের কাছে মানত করে। মানুষজন বিশ্বাস করে পীরের দোয়ায় ভালো হয়ে যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভবান হওয়ার জন্য পীরের মাজারে মানত করে। ঘোড়া পীরের মাজারে কোনো গরু মানত হয় না। এটি পীর সাহেবের নিষেধ আছে। খাদেমকে তা স্বপ্নে জানিয়ে দেন। সেই থেকে কোনো গরু মানত হয় না। পীরের ভক্তরা পরকালকে বিশ্বাস করে না। তাদের কথা মানুষ মরে গেলে তার কোনো অস্তিত্ব থাকে না এবং মৃত্যুর পর কোনো হিসাবনিকাশ হয় না। এই পীরের খাদেম আমাদের জানায় বেহেশ্‌ত আর দোজখ দুনিয়ার উপর মেয়েদের মধ্যে। তিনি আরও বলেন কবরের আজাব কখনও চোখে দেখা যায় না, কেন বিশ্বাস করবো। তাদের কথা না দেখে কোনো কিছু বিশ্বাস করা যাবে না।

মনের আশা পুরণের জন্য পীরের মাজারে আসে। পীরের কাছে মানত করে, আর তাদের চিন্তা ভাবনা পীরের কাছে মানত করে কোনো কিছু চাইলে তা পাওয়া যায়। এ ধরনের কার্যক্রম এখনো অটুট আছে।

বুড়া পীরের মাজার

এই পীরের সঠিক নাম কেউ নির্দিষ্টভাবে বলতে পারে না। পীর কবে এসেছেন কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না। পাশের গ্রামের এক হিন্দু বৃদ্ধ ব্যক্তি বয়স প্রায় ৯০ বছর, সে জানায় আমার দাদারাও এই পীরের মাজার দেখেছে তাঁরাও সঠিকভাবে পীর সম্পর্কে বলতে পারেনি। সে বলে এই পীর আনুমানিক ৪০০ বছর আগে এখানে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসেন। বুড়া পীর অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তা লোককাহিনিতে পাওয়া যায়। তাই এই পীরকে সবাই বিশ্বাস করে।

মাজারের অবস্থা : এই মাজার ১০০ বছর আগে জিয়াগাছ দিয়ে চারিদিক ঘেরা ছিল এবং মাজারের স্থানে জঙ্গল ছিল। বর্তমানে একটি ঘর আকারে তৈরি, তার মধ্যে মাজার। মাজারের সাথে গোরস্থান আছে।

ধর্মীয় ব্যবস্থা : পীরের মাজারে সকল ধর্মের মানুষ আসে । সকল ধর্মের মানুষ এসে মানত করে। তাঁরা সবাই ফল পায় বলে এলাকাবাসী আমাদের জানায়। বুড়া পীরের মাজারে কোনো জাতি ভেদাভেদ নেই।

মাজারে মানতের উপকরণ : বুড়াপীরের মাজারে মানত হিসেবে দেওয়া হয়- ছাগল, মুরগি, হাঁস, কবুতর, চাল, ডাল, দুধ, ফল, মিষ্টি, আগরবাতি, গোলাপজল, টাকা-পয়সা ইত্যাদি।

অনুষ্ঠান : বুড়াপীরের মাজারের কোনো গান বাজনা হয় না। প্রতি বৃহস্পতিবার পীরের মাজারে মানুষ এসে মানত করে, মাজার জিয়ারত করে। প্রতি বছরে ১২ জানুয়ারি ওরশ হয়। একই দিনে মুসলমান ও হিন্দু সকলে মিলে এই অনুষ্ঠান করে যাকে বলে ওরশ। এই পীরের মাজারে কোনো গরু মানত হয় না। সেই দিন বিভিন্ন জায়গা হতে মানুষজন আসে। কোরআন ও হাদিসের আলোকে ওয়াজ হয়।

www.pathagar.com

শাহসুফি বুড়া পীরের মাজার

মাজারের অবস্থান : গোগর চৌরাস্তা থেকে দক্ষিণে ১০ কি.মি দূরে মাজারটি কোচল গ্রামে বি.ডি.আর. ক্যাম্পের সাথে অবস্থিত।

মাজার কেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও সংস্কার : কোনো গাভী বাচ্চা দিলে সাত দিনের মধ্যে বুড়া পীরের মাজারে ঐ গাভীর দুধ দেয় এই জন্য যে, পীরের দোয়ায় গাভীর বেশি দুধ হবে এবং মানুষের কোনো কু দৃষ্টি লাগবে না। এই ধরনের লোকবিশ্বাস এখনও মানুষের মধ্যে আছে।

অসুখ হতে মুক্তি লাভের জন্য এলাকার মানুষ বিভিন্ন জিনিস মানত করে। বিশ্বাস করে পীরের মাজারে আসলে ভালো হয়ে যাবে। এ ধরনের আচার এখনও পালন করে।

জমিতে ভালো ফসল হওয়ার জন্য বিভিন্ন এলাকার মানুষ বুড়া পীরের মাজারে এসে মানত করে থাকে। পীরের দোয়ায় জমিতে ভালো ফসল হয় এবং কোনো সমস্যা হয় না। মানুষের এই বিশ্বাস এখনো বহাল আছে।

গাছে ফল বেশি আসার জন্য মানত করে বুড়া পীরের মাজারে। এই ধরনের লোকবিশ্বাস এখনো মানুষের আছে বলে পীরের মাজারে আসে। পীর সাহেব দোয়া করলে গাছে ফল বেশি আসবে বা গাছের ফল নষ্ট হবে না। এই ধরনের আচার-বিশ্বাস এখনো পালন করে এলাকার মানুষ।

পাঁচ পীরের মাজার

পাঁচ পীরের মাজার হলো প্রতীকী মাজার। এ ধরনের মাজারকে থান বলে থাকে। কোচল গ্রামে এই পাঁচ পীরের মাজার কবে থেকে কেউ নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না। গ্রামের বৃদ্ধ ব্যক্তিরা বলেন আনুমানিক ৩০০ বছর আগের এই থান। এখানে মানুষ বিভিন্ন মানত করে থাকে। পাঁচ পীর বলতে যে পাঁচজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে

www.pathagar.com

তাহলো- হযরত মুহম্মদ (সা:), হযরত আলী (রা:), মা ফাতেমা (রা:), ঈমাম হাসান ও ঈমাম হোসেন।

মাজারের অবস্থা : এটি কোনো মাজার না, থান আকারে তৈরি করা। চার বা পাঁচ হাত জায়গা নিয়ে একটু উঁচু করে ছোটো ঘর তৈরি করে মানত করে । মানতকারীরা মানত করার সময় ছোটো ছোটো মাটির তৈরি ঘোড়া ব্যবহার করে।

মাজারের অবস্থান : গোগর চৌরাস্তা থেকে দক্ষিণে ১০ কি.মি দূরে বি.ডি.আর. ক্যাম্প হতে উত্তরে ০.৫ কি.মি. রাস্তার সাথে কোচল গ্রামে পাঁচ পীরের থান অবস্থিত।

ধর্মীয় ব্যবস্থা : এই পীরের থানে সকল ধর্মের মানুষ আসে। সকল মানুষ এসে মানত করে। তাঁরা সবাই ফল পায় বলে আমাকে জানায়।

অনুষ্ঠান : প্রতি বছরে পৌষ মাসের ১৫ তারিখে পাঁচ পীরের থানে অনুষ্ঠান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জায়গার মানুষ মানত নিয়ে আসে। মানতের জিনিস একত্রে রান্না করে সবার মাঝে সিন্নি বিলিয়ে দেওয়া হয়।

মাজারে মানতের উপকরণ : পাঁচ পীরের মাজারে মানত হয়- খাসি, পাঠা, মুরগি, হাঁস, দুধ, কলা, মিষ্টি, আগরবাতি, গোলাপজল, ধূপকাঠি, টাকা ইত্যাদি।

মাজার কেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও সংস্কার : শত্রুকে দমন করার জন্য পীরের থানে মানত করতে সকল ধর্মের মানুষ আসে। পীরের দোয়ায় শত্রু কোনো ক্ষতি করতে পারে না। এই পীরকে নিয়ে মানুষ মনে বিশ্বাস স্থাপন করে নিয়েছে। তার অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে মানুষের ক্ষতিও করতে পারে আবার উপকারও করতে পারে।

বাড়িতে কোনো অসুখ না হওয়ার জন্য, পীরের থানে বিভিন্ন জিনিস মানত করে। পীরের অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা অসুখ ভালো করতে পারে। এ ধরনের বিশ্বাস করে এলাকার মানুষ।

জমিতে বেশি ফসল হওয়ার জন্য পীরের থানে পূজা বা মানত করে। এখনও এই ধরনের বিশ্বাস দেখা যায় বলে গ্রামের মানুষ আমাকে জানায়।

আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য পীরের থানে পূজা বা মানত করে। এই ধরনের বিশ্বাস এখনও বহাল আছে।

শিয়াল গাজীর মাজার

অনেকেই আবার শিয়াল পীরের মাজার বলে ডাকে। এই পীরের মাজারের নামকরণ হওয়ার পিছনে কারণ হলো, এক সময় ঐ এলাকাতে প্রচুর পরিমাণ শিয়াল ছিল, এতে মানুষজন ঐ রাস্তা দিয়ে যেতে পারতো না। শিয়ালের আক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পীরকে আরাধনা করতে থাকে এবং মানুষ পীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এভাবে শিয়াল গাজীর মাজার নামকরণ করা হয়। এলাকার বৃদ্ধ মানুষের কাছ থেকে জানতে পারি। এই পীর কবে এসেছে সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেনি। তবে কেউ কেউ বলে আনুমানিক প্রায় ৪৫০ বছর আগে এই পীর ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছেন।

মাজারের অবস্থা: শিয়ার গাজীর মাজার গোগর গ্রামের গোরস্থানের মধ্যে অনেক লম্বা। মাজারটি ইট দিয়ে পাকা করা। মাজারটি লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা আছে।

www.pathagar.com

মাজারের অবস্থানঃ গোগর চৌরাস্তা থেকে প্রায় ২ কি.মি. দক্ষিণে যেতে রাস্তার ডান পার্শ্বে গোরস্থানের মধ্যে গোগর গ্রামের শেষ প্রান্তে শিয়াল গাজীর মাজার এবং পার্শ্বে বড়ো বটগাছ আছে।

শিয়াল গাজীর মাজার

মাজারের অবস্থাঃ শিয়ার গাজীর মাজার গোগর গ্রামের গোরস্থানের মধ্যে অনেক লম্বা। মাজারটি ইট দিয়ে পাকা করা। মাজারটি লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা আছে।

মাজারের অবস্থানঃ গোগর চৌরাস্তা থেকে প্রায় ২ কি.মি. দক্ষিণে যেতে রাস্তার ডান পার্শ্বে গোরস্থানের মধ্যে গোগর গ্রামের শেষ প্রান্তে শিয়াল গাজীর মাজার এবং পার্শ্বে বড়ো বটগাছ আছে।

ধর্মীয় ব্যবস্থাঃ শিয়াল গাজীর মাজারে মুসলমান ও হিন্দু সকলেই এসে মানত করে। সকলেই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। এই পীরের মাজার অসম্প্রদায়িক এখানে কোনো জাতি ভেদাভেদ নাই।

অনুষ্ঠানঃ প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার এই পীরের মাজারে অনুষ্ঠান হয়। এছাড়াও প্রতি বছরে অনুষ্ঠান বা ওরশ হয় ১২ই অগ্রহায়ণ। এই দিন মানতকারীরা মানত নিয়ে আসে পীরের মাজারে। কোরআন ও হাদিসের আলোকে ওয়াজ হয়। মানতের জিনিস দিয়ে একত্রে রান্না করে সিন্নি সবার মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হয়।

মাজারে মানতের উপকরণ : শিয়াল গাজীর মাজারে মানত হয় গরু, ছাগল, মুরগি, হাঁস, কবুতর, মিষ্টি, চাল, ডাল, গোলপজল, আগরবাতি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

মাজার কেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও সংস্কার : মাজারের সামনে রাস্তা দিয়ে রাতে চলাফেরা করার সময় কেউ যদি ভয় পায়, তাহলে পীরের নাম স্মরণ করলে ভয়ভীতি মন থেকে কেটে যায়। এ ধরনের আচার বিশ্বাস এখনও পালন করে বলে এলাকার মানুষ জানায়। পীর বিশ্বাসী মানুষের পরিবারের কোনো সদস্যের অসুখ বিসুখ হলে, তাঁরা শিয়াল গাজীর মাজারে এসে মানত করে। মানত করে গেলে অসুখ ভালো হয়ে যায়। এলাকার মানুষের বিশ্বাস ও এ ধরনের কার্যক্রম এখনো বিদ্যমান আছে।

শত্রু যেন ক্ষতি করতে না পারে এই জন্য পীরের মাজারে এসে মানত করে যায়। মানুষের বিশ্বাস পীর আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী, তার দ্বারা সব কিছু সম্ভব। এখনো এ ধরনের কার্যক্রম এখনো আছে।

সাপ পোকার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই পীরের মাজারে এসে বিভিন্ন জিনিস মানত করে। পীরের দোয়ায় সাপ পোকার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

অনেক সময় ছোটো ছোটো বাচ্চারা মায়ের বুকের দুধ খায় না। এ সকল সমস্যার জন্যও এই পীরের মাজারে মানত করে, আর সঙ্গে পানি আনে। এই পানি খাওয়ালে বাচ্চার সমস্যা আর থাকে না। এ ধরনের বিশ্বাসও মানুষের মধ্যে আছে।

বনপীরের মাজার

বনপীরের মাজারে বড়ো বড়ো সাপ আছে। তবে এই সাপ মানুষের কোনো ক্ষতি করে না। এলাকার বৃদ্ধ ব্যক্তি ও মাজারের খাদেম আমাদের জানায়। এই সাপ মাজার দেখা শোনার দায়িত্বে আছে বলে মানুষের বিশ্বাস। তাই পীরের মাজারে কাছে এসে কেউ খারাপ আচরণ করে না, ক্ষতি হতে পারে । এ ধরণের বিশ্বাস মানুষের মাঝে এখনও আছে । গরু, ছাগল হারিয়ে গেলে এই পীরের মাজারে এসে মানত করলে তা আবার ফিরিয়ে পাওয়া যায়। এ ধরনের আচার বিশ্বাস এখনও পালন করা হয়। এর অনেক প্রমাণ এখনো বিদ্যমান।

মানুষের কোনো জটিল অসুখ বিসুখ হলে, এই পীরের মাজারে এসে মানত করলে পীরের দোয়ায় আল্লাহর রহমতে তার অসুখ ভালো হয়ে যায়। এ ধরনের বিশ্বাস এখনও মানুষের মধ্যে কাজ করে।

দীর্ঘ দিন যাবত বিয়ে হয়েছে অথচ কোনো বাচ্চা হয় না। এ ধরনের মানুষ পীরের মাজারে এসে বিভিন্ন জিনিস মানত করে। পীর সাহেবের দোয়ায় এ ধরনের সমস্যা দূর হয়ে যায় বলে মানুষের বিশ্বাস। এখনো এ ধরনের সমস্যার জন্য পীরের মাজারে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ আসে।

ছোটো ছোটো বাচ্চা অনেক সময় কান্নাকাটি করে থাকে। মানুষ মনেকরে অপদেবতার নজর লেগেছে, সেই কান্না থামানোর জন্য পীরের মাজারে আসে এবং মানত করে। এই পীরের মাধ্যমে ভালো হয়, এটি এলাকার মানুষের বিশ্বাস।

মনের উত্তম আশা পূরণের জন্য এই পীরের মাজারে আসে বিভিন্ন মানুষ। এলাকার মানুষ এতে ফল পেয়েছে বলে আমাকে জানায়।

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. শ্রী রুম্পা বসাক, স্বামী- বলরাম বসাক, বয়স- ২২, শিক্ষাগত যোগ্যতা- এইচ.এস.সি, গ্রাম- পাথরাইল, থানা- দেলদুয়ার, জেলা- টাঙ্গাইল।
২. লোক বিশ্বাস ও লোকসংস্কার, বরুন কুমার চক্রবর্তী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ-৬৮।
৩. বাংলার লোকসংস্কৃতি, প্রদত্ত, পৃ- ১২০।
৪. শ্রী সম্পা বসাক ঐ।
৫. নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত, বাংলার লোকসাহিত্য, আশিস্ পাল, ভূমিকা অংশ
৬. অত্র শঙ্খশিল্প কথা, সৌগত চট্টোপাধ্যায়, ২০০৪, পৃ-৬৮।

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

বাংলাদেশ একটি গ্রাম নির্ভর দেশ। এদেশে প্রায় ৬৮ হাজার গ্রাম রয়েছে। আর এদেশের জেলার সংখ্যা ৬৪টি। এরই মধ্যে একটি জেলা হচ্ছে ঠাকুরগাঁও জেলা। এই জেলাটিও বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় গ্রাম নির্ভর। আসলে গ্রামই হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাণ। আর এই গ্রামের মানুষগুলো দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করেছে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির। এসব প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁরা তাদের জীবন ব্যবস্থাকে অনেকটা সহজ করে নিয়েছে। জীবনে চলার পথে তাঁরা যখনই কোনো বাধার সম্মুখীন হয়েছে বা কোনো কিছুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে তখনই তাঁরা জন্ম দিয়েছে বিভিন্ন প্রযুক্তির। তাঁরা তাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন- কৃষিতে, মৎস্য শিকারে, যানবাহনে, গৃহ নির্মাণে, বস্ত্র বুননে, খাবার তৈরিতে, দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস তৈরিতে পাত্র তৈরিতে ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির ব্যবহার করেছে। আমি আমার ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ঠাকুরগাঁও জেলার লোকপ্রযুক্তিগুলো নিচে আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

ক. কৃষিতে ব্যবহৃত লোকপ্রযুক্তি

বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ। এই দেশের অর্থনীতি নির্ভর করে কৃষি কাজের উপর। দেশের শতকরা প্রায় ৮০% লোক কৃষি কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। ঠাকুরগাঁও উত্তরবঙ্গের জেলা হওয়ায় এক্ষেত্রে নদ-নদীর পরিমাণ খুব একটা বেশি না থাকায় এখানকার মানুষের প্রধান পেশা হচ্ছে কৃষিকাজ। আর তাদের এই প্রধান কাজকে তাঁরা অনেকটাই সহজ করে নিয়েছে বিভিন্ন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে। নিচে ঠাকুরগাঁও জেলার কৃষিতে ব্যবহৃত লোকপ্রযুক্তিগুলোর পরিচয় তুলে ধরা হলো-

লাউ এর বস

কৃষি কাজের জন্য সর্বপ্রথম যে জিনিসটি দরকার হয় তা হচ্ছে ভালো বীজ। কারণ ভালো বীজ ছাড়া ভালো ফসল ফলানো অসম্ভব। আবার এই বীজ সংরক্ষণ করতে না পারলে নষ্ট হয়ে যায়। তাই ঠাকুরগাঁও জেলার মানুষগুলো বীজ সংরক্ষণের জন্য লাউ এর বস তৈরি করে ব্যবহার করতো।

তৈরি প্রক্রিয়া : এটি তৈরি করা হতো বাগানে যখন লাউ ধরতো সেই লাউকে না কেটে গাছেই রেখে দেওয়া হতো। গাছটি যখন মরে শুকিয়ে যেত ততদিনে লাউটি পেকে শক্ত হয়ে যেত। তখন এর মাথার দিকে একটি ছিদ্র করে এর ভেতরে শুকনো বা পঁচা জিনিসগুলো বের করে ফেলা হতো। অবশ্য এক্ষেত্রে লবণ দিলে তা ভালো হয়। পরে এটি রোদে ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে এর ভেতরের ফাকা অংশটিতে বীজ রাখা হতো।

ব্যবহার : সাধারণত বীজ সংরক্ষণের জন্য এটি ব্যবহার করা হতো।

www.pathagar.com

লাঙল

বাংলাদেশের কৃষকদের কৃষিকাজে ব্যবহৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় একটি হাতিয়ার হচ্ছে লাঙল। বাংলাদেশের প্রায় সব গ্রামের কৃষকেরা কৃষিকাজের জন্য লাঙল ব্যবহার করে থাকে।

তৈরি প্রক্রিয়া : ঠাকুরগাঁও এর কৃষকেরা সাধারণত বাকাম কাঠ ব্যবহার করে লাঙল তৈরি করে থাকে। একটি লাঙলের বেশ কয়েকটি অংশ থাকে। যেমন- ঋষ, ফলা মুঠিয়া, নেংড়ি গাদা ইত্যাদি। লম্বা একটি বাকাম কাঠের মাথার দিকে নেংড়ি যুক্ত থাকে। নেংড়ির মাঝখানে ছিদ্র করে ঋষটি ঢোকানো থাকে। নেংড়ির নিচের দিকে আবার বাকানো থাকে। এই অংশের সাথে লোহার ফলা লাগানো থাকে আর এই বাকানো অংশটিকে বলা হয় গাদা। নেংড়ির উপরে দিকে থাকে মুঠিয়া। হাতকে মুঠাবদ্ধ করে এটি ধরে রাখা হয় বলে এর নাম মুঠিয়া। লাঙলের ঋষটি জোয়ালের সাথে বাঁধা থাকে।

ব্যবহার : জমি কর্ষনের জন্য লাঙল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গরু চলতে থাকলে এর টানে লাঙলটিও চলতে থাকে। আর সেই সাথে লোহার ফলার আঘাতে মাটি খুড়তে থাকে।

জোয়াল

গরুর সাথে জোয়াল শব্দটি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। কারণ গরুকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে হলে অবশ্যই এটি ব্যবহার করতে হবে। যেমন- লাঙল দেয়া, গাড়ি চালানো ইত্যাদি।

তৈরি প্রক্রিয়া : সাধারণত বাকাম কাঠ দিয়েই ঠাকুরগাঁওয়ের কৃষকেরা জোয়াল তৈরি করে থাকে। একখণ্ড লম্বা বাকাম কাঠ হলেই জোয়াল তৈরি করা যায়। তবে বাঁশ দিয়েও অনেকে জোয়াল তৈরি করে থাকেন। জোয়ালের দুই পাশে দুটি কাঠি থাকে। গরুর ঘাড়ে জোয়াল তুলে দেবার পর এই কাঠির সাথেই গরু বাঁধা থাকে।

ব্যবহার : গরুকে দিয়ে লাঙল টানানো বা গাড়ি চালানোর কাজে এটি ব্যবহার করা হয়।

মই

মই আমাদের একটি অতি পরিচিত বিষয়। গ্রামের আশেপাশের শহরেও মই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

তৈরি প্রক্রিয়া : সাধারণত বাঁশ দিয়ে মই তৈরি করা হয়ে থাকে। একটি লম্বা বাঁশকে মাঝ দিয়ে দুই ভাগ করে এটিকে লম্বাভাবে রেখে এর বুকের মাঝখানে কয়েকটি ছিদ্র করে ছোটো ছোটো বাঁশের বাতাকে এই দুই বাঁশের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। যার ফলে এটি অনেকটা সিড়ির মতো হয়ে ওঠে।

ব্যবহার : লাঙল দিয়ে জমি কর্ষনের পর জমি অনেকটা অসমতল হয়ে থাকে। এই অসমতল জমিকে সমতল করার জন্য মই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। লাঙলের পরিবর্তে জোয়ালের সাথে দড়ি দিয়ে মই বেঁধে কৃষক এর উপর দাড়িয়ে থাকে। আর গরু চলতে থাকলে তার টানে এবং কৃষকের শরীরের ভারে জমি সমতল হয়ে যায়।

www.pathagar.com

কুড়িশ

কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি প্রযুক্তি হচ্ছে কুড়িশ। ঠাকুরগাঁও জেলাতে এটিকে কুড়িশ বলা হলেও এটি মুগুর হিসেবেই বহুল পরিচিত।

তৈরি প্রক্রিয়া : কুড়িশ তৈরি প্রক্রিয়া খুবই সহজ। একটি বাঁশের লম্বা ছোটো অংশের মাথায় মোটা একটি কাঠের দণ্ড লাগানো থাকে। কাঠের দণ্ডটির মাঝখানে ছিদ্র করে লাঠিটি ঢোকানো থাকে।

ব্যবহার : সাধারণত মাটির বড়ো অংশ বা ঢিলাকে আঘাত দিয়ে ছোটো করার জন্য কুড়িশ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

জাবি

ধান বা কোনো ফসল যখন জমি থেকে তুলে আনা হয় এরপর গরু দিয়ে মাড়াই করে গাছ থেকে শস্য আলাদা করার সময় গরুর মুখে এটি পরানো হয়।

তৈরি প্রক্রিয়া : বাঁশ থেকে চটা বের করে সেই চটাকে বুনিয়ে এটি তৈরি করা হয়। এটি মূলত একটি খাঁচা।

ব্যবহার : গরু দিয়ে ফসল মাড়াই করার সময় গরুর মুখে এটি পরানো হয় যেন গরু ফসল খেতে না পারে।

পাট্টা

কৃষি সংক্রান্ত প্রযুক্তির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি হচ্ছে পাট্টা। ঠাকুরগাঁওয়ের লোকেরা এটি তাদের ধানের চাতালে ব্যবহার করে থাকে। শস্য শুকানোর সময় নাড়ানোর জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

তৈরি প্রক্রিয়া : যেকোনো একটি কাঠের তক্তা দিয়েই এটি তৈরি করা সম্ভব। কাঠটির দুই মাথায় দুটি ছিদ্র করে সেই প্রান্তে দড়ি বাধা হয়ে থাকে।

ব্যবহার : সাধারণত ফসল রোদ্রে শুকানোর সময় ধান নাড়ানোর জন্য এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দুইজন লোক পাট্টার দুই প্রান্তের দড়ি ধরে টেনে এটি ব্যবহার করে।

ফাউড়ি

পাট্টা যে কাজে ব্যবহার করা হয় ফাউড়ির কাজও প্রায় একই। ফাউড়িও ধান বা গম রোদ্রে শুকানোর সময় নাড়া দেবার কাজে ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য জেলায় এটি হারপাঠ নামে পরিচিত।

তৈরি প্রক্রিয়া : একটি কাঠকে অর্ধ বৃত্তাকার করে কাটা হয়। এরপর যে অংশটি প্রায় গোল সেদিকে মাঝ বরাবর একটি ছিদ্র করে লম্বা একটি বাঁশ তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহার : ধান বা গম রোদ্রে শুকানোর সময় তা নেড়ে উল্টা পাল্টা করার জন্য ফাউড়ি ব্যবহার করা হয়। সাধারণত অল্প পরিমাণ শস্য নাড়ানোর জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

কাঠা

কাঠা সাধারণত সব জায়গাতেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি দেখতে অনেকটা ঝাকার মতো।

www.pathagar.com

তৈরি প্রক্রিয়া : বেতের কচি গাছকে অর্থাৎ ছোটো বেতকে গোল করে পেঁচিয়ে লতা দিয়ে বেঁধে এটি তৈরি করা হয়।

ব্যবহার : এটি শস্য স্থানান্তর এবং ধান পরিমাপের কাজে ব্যবহার করা হয়। এটি পাঁচ বা দশ কেজি পরিমাপের তৈরি করে ব্যবহার করা হয়।

কুলা

বাংলাদেশের প্রায় সব গ্রামেই কুলার সন্ধান পাওয়া যায়। কৃষি সংক্রান্ত কাজ ছাড়াও গৃহস্থালি কাজে কুলা ব্যবহার করা হয়।

তৈরি প্রক্রিয়া : তল্লা বাঁশকে লম্বা লম্বা করে কেটে চটা বা বাতা বের করে নেওয়া হয়। তারপর সেই চটা বা বেতকে পাটির মতো বুনিয়ে কুলা তৈরি করা হয়।

ব্যবহার : এটি মূলত ধান ঝেড়ে ধানের চিটা এবং চালযুক্ত ধান পৃথক করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

ঢেকি

বাংলাদেশের একটি হারানো লোকপ্রযুক্তি হচ্ছে ঢেকি। এটি বাংলাদেশের প্রায় সব গ্রামেই পাওয়া যায় এবং একই নামে পরিচিত।

তৈরি প্রক্রিয়া : ঢেকি তৈরিতে মূলত বাবলা কাঠ ব্যবহার করা হয়। একটি মোটা বাবলা গাছকে কেটে ঢেকির প্রধান অংশ তৈরি করা হয়। এর মাথায় ছিদ্র করে একটি মুগুর জোড়ানো থাকে। এই মুগুরের মাথা মাটির গর্তে থাকে। অপর প্রান্তে দুটি খুটির উপর এটি বসানো থাকে। আর খুটির বাইরে কিছু অংশ থাকে সেখানে পায়ে চাপ দিয়ে চাল ডাল কুটা হয়।

ব্যবহার : এটি সাধারণত ধান থেকে চাল বের করতে বা ডাল বের করতে, চিড়া তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়।

জাঁতা

ঢেকির ন্যায় জাঁতাও বাংলাদেশের একটি বহুল পরিচিত লোকপ্রযুক্তি। এটিও বর্তমানে অনেকটাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

তৈরি প্রক্রিয়া : এটি তৈরি হয় গোলাকার দুটি পাথরে খণ্ড দিয়ে। নিচের পাথরের খণ্ডের মাঝখানে একটি কাঠি থাকে। উপরের পাথরের খণ্ডের মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্র দিয়ে নিচের পাথরের কাঠটি ঢুকিয়ে দেয়া হয়। আর উপরের পাথরের খণ্ডের একপ্রান্তে বাবলা কাঠ দিয়ে হাতল বানানো থাকে। অপর মাথায় থাকে ছিদ্র, ছিদ্র দিয়ে ডাল বা চাল দেয়া হয় আর হাতল ধরে ঘুরানো হয়। এতে দুই পাথরে ঘর্ষণে ও চাপে চাল বা ডাল পিষে যায়।

ব্যবহার : চাল বা ডাল ভাঙ্গা বা আটা তৈরি করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

ডাহুকি বা পুষনি

কৃষি কাজের জন্য বড়ো বাঁধা হচ্ছে আগাছা। আগাছা পরিষ্কার করার জন্য কৃষকেরা বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহার করে তার মধ্যে ডাহুকি বা পুষনি একটি।

www.pathagar.com

তৈরি প্রক্রিয়া : এটি তৈরি করার জন্য প্রয়োজন একটি কাঠের খণ্ড বা মোটা বাঁশের গোড়া। যেটি দিয়ে হাতল তৈরি করা হয়। আর এই হাতলের সাথে লোহার একটি প্লেট লাগানো থাকে।

ব্যবহার : ডাহুকি বা পুষনি সাধারণত জমির আগাছা পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

বেধা

ঠাকুরগাঁও জেলার আগাছা নিড়ানোর জন্য আরেকটি হাতিয়ার হচ্ছে বেধা। এই বেধা অন্যান্য জেলায় নঙ্গুলা বা নিড়ানী নামে পরিচিত।

তৈরি প্রক্রিয়া : এটি তৈরি হয় সাধারণত বাঁশ এবং কাঠ দিয়ে। একটি মোটা চারকোনা কাঠের নিচের দিকে বাঁশ দিয়ে তৈরি কিছু কাটার মতো অংশ লাগানো থাকে। আর কাঠের মাঝখানটা ছিদ্র করে একটি বাঁশের হাতল ঢোকানো থাকে।

ব্যবহার : বেধা সাধারণত জমির আগাছা পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

ছোটো লাঙল

কৃষিক্ষেত্রে লাঙল একটি পরিচিত হাতিয়ার। এটি প্রায় সব গ্রামেই রয়েছে। কিন্তু ছোটো লাঙল সব জায়গায় তেমন দেখা যায় না। এটি ঠাকুরগাঁও জেলায় আর তেমন ব্যবহার করা হয় না।

তৈরি প্রক্রিয়া : ছোটো লাঙল তৈরি করার জন্য প্রথমে একটি কাঠ দিয়ে গাদা তৈরি করা হয় এই গাদার মাথায় একটি লোহার ছোটো ফলা লাগানো থাকে। আর মাঝখানটা ছিদ্র করে একটি বাঁশের হাতল আটকানো থাকে।

ব্যবহার : এটি সাধারণত রসুন বা আলু চাষ করার জন্য জমি কর্ষন করা হয়। অর্থাৎ সারিবদ্ধভাবে বীজ বপনের জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। এটি হাত দিয়ে টানা হয়।

খ. মৎস্য শিকারে লোকপ্রযুক্তি

আমাদের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে আমরা মাছে ভাতে বাঙালি। আর আমাদের পরিচয়ের সাথে মাছের সম্পর্ক রয়েছে অনেক ঘনিষ্ঠ। তাই বাংলাদেশের প্রায় সকল স্থানের মানুষেরা এই মৎস্য শিকারে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার করেছে। ঠিক তেমনি ঠাকুরগাঁও জেলার মানুষেরাও তাদের মৎস্য শিকারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার করেছে।

উত্তরবঙ্গের জেলা হবার কারণে ঠাকুরগাঁও জেলাতে নদ-নদীর সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। কিন্তু তারপরও এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে কিছু বিল রয়েছে। বিল ছাড়াও ছোটো ছোটো কয়েকটি নদীও এই জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে। আর এসব বিল বা নদ-নদীর উপর নির্ভর করেই এই জেলাতে টিকে আছে অনেক জেলে

www.pathagar.com

পরিবার। তাঁরা তাদের এই প্রধান জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবহার করেছে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির। সেসব প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁরা তাদের মৎস্য শিকারকে করেছে আরও অনেক সহজ এবং সুন্দর। এর ব্যবহারের ফলে তাঁরা অনেক সহজেই অধিক পরিমাণ মাছ শিকার করতে পারে। নিচে ঠাকুরগাঁও জেলায় মৎস্য শিকারে লোকপ্রযুক্তির ব্যবহার আলোচনা করা হলো-

ফেকা জাল

মৎস্য শিকারের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে জাল। জাল দিয়ে একসাথে অনেক মাছ ধরা যায়। বিভিন্ন ধরনের জালের মধ্যে একটি হচ্ছে ফেকা জাল। যা অন্যান্য জায়গায় খ্যাপলা বা তোড়্যা জাল নামে পরিচিত।

তৈরি প্রক্রিয়া : বাজার থেকে দুই তাঁরা লাইলোন সুতো কিনে প্রথমে এটিকে এক তাঁরা করা হয়। তারপর সেই লাইলোন সুতোকে মাকুর সাহায্যে বুনিয়ে ফেকা জাল তৈরি করা হয়। আর সুতোর মাথায় লোহার কাঠি লাগানো থাকে। যেন পানিতে তাড়াতাড়ি ডুবে যায়।

ব্যবহার : এটি মাছ ধরার জন্য ব্যবহার করা হয়। হাতের সাহায্যে পানিতে ছোড়া হয় এবং টেনে তোলা হয়। তাতে মাছ আটকা পড়ে।

টানা জাল

মাছ শিকারের জন্য যত ধরনের জাল ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে টানা জাল একটি। এটি বড়ো পুকুর, দিঘি বা নদীতে ব্যবহার করা হয়।

তৈরি প্রক্রিয়া : এটিও লাইলোন সুতো দিয়ে তৈরি।, তবে এতে দুতাঁরা সুতোর ব্যবহার করা হয় যেন ছিড়ে না যায়।

ব্যবহার : পুকুর বা নদীতে এটি এক প্রান্ত থেকে টেনে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যাওয়া হয় এবং দুই মাথা এক স্থানে এনে উঠানো হয়। তবে নদীতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে এটি টানা হয়। এতে অনেক বড়ো মাছ ধরা পড়ে।

ঠেলা জাল

জালের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো জাল হচ্ছে এই ঠেলা জাল। বিল বা শুকনো ডোবাতে এটি দিয়ে মাছ ধরা হয়।

তৈরি প্রক্রিয়া : সাধারণত এই জালে যে নেট ব্যবহার করা হয় তা বাজার থেকে কেনা হয়। আর তিনটি বাশের টুকরা দিয়ে একটি ফ্রেম তৈরি করা হয়। এই ফ্রেমে এটি আটকানো থাকে।

ব্যবহার : বিল বা শুকনো ডোবাতে অর্থাৎ যেখানে কম পানি থাকে সেখানে হাত দিয়ে ঠেলে ব্যবহার করা হয়। এতে ছোটো ছোটো মাছ ধরা পড়ে। যেমন- পুঠি, চ্যাং (টৌকি), গুচি, ট্যাংরা ইত্যাদি।

ঢেক জাল

মৎস্য শিকারে যতগুলো প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষনীয় হচ্ছে এই ঢেক জাল। দক্ষিণবঙ্গে এটি আবার ফেচাঙ্গা নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

তৈরি প্রক্রিয়া : প্রথমে একটি বাঁশের ফ্রেম তৈরি করা হয়। লম্বা দুটি বাশের এক প্রান্ত একসাথে বাঁধা হয় এবং অন্য প্রান্ত বিপরীত দিকে থাকে। এই বিপরীত দিকে থাকা প্রান্তে লাইলোন সুতোর নেট আটকানো থাকে। আর যে প্রান্ত একসাথে সে প্রান্ত পানি থেকে একটু উপরে বাঁশের খুঁটির সাহায্যে রাখা হয়।

ব্যবহার : সাধারণত নদী বা বিলের পানি যে দিকে বয়ে যায় তার বিপরীত দিকে এটি পাতা হয়। বাঁশের যে প্রান্ত বিপরীতমুখী সে প্রান্তটি পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়। আর যে প্রান্ত পানি থেকে উপরে সে প্রান্তে একজন মানুষ দাড়িয়ে থাকে। জালটি ডুবিয়ে রাখার কিছুক্ষণ পর মানুষটি পা দিয়ে ঢেকির মতো করে চাপ দিয়ে ডুবানো প্রান্তটি উপরে তোলে। এতে স্রোতের সাথে যাওয়া মাছগুলো আটকা পড়ে। বড়ো ছোটো দুই ধরনের মাছই আটকা পড়ে।

সরৎ পচকা বা কেচা

আমরা যেটিকে কোঁচ বলে চিনি ঠাকুরগাঁও-এ তাকেই সরৎ পচকা বা কেচা নামে ডাকা হয়। এই জেলায় বেশ কয়েকটি পানির বিল থাকার কারণে এখনও এখানে সরৎ পচকার ব্যবহার বেশ রয়েছে।

তৈরি প্রক্রিয়া : একটি লম্বা বাঁশের মাথায় ১৫ থেকে ২০টি সুঁচালো লম্বা লোহার স্পোক ঢুকিয়ে এটি তৈরি করা হয়।

ব্যবহার : সাধারণত কম পানিতে অর্থাৎ যে পানিতে মাছ চলাচল করতে দেখা যায় সেই পানিতে রাতে এটি ব্যবহার করা হয়। পানিতে টর্চের আলো দিয়ে মাছ খোঁজা হয় আর দেখতে পেলে ছুড়ে মারা হয়। এতে মাছ গেঁথে যায়।

সড়কি

সড়কি দেখতে কেচার মতোই। কিন্তু এটি আকারে বড়ো।

তৈরি প্রক্রিয়া : একটি লম্বা বাঁশের মাথায় সুঁচালো কিন্তু স্পোকের চেয়ে মোটা লোহা গেঁথে এটি তৈরি করা হয়।

ব্যবহার : এটিও কেঁচার মতোই ছুড়ে মারা হয়। তবে এটি বড়ো মাছ ধরার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

ছিপ

বাংলাদেশের মৎস্য শিকারে যেসব লোকপ্রযুক্তির ব্যবহার রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত একটি প্রযুক্তির নাম হচ্ছে ছিপ। বাংলাদেশের প্রায় জায়গাতেই এটি একনামে পরিচিত।

তৈরি প্রক্রিয়া : ছিপ তৈরি প্রক্রিয়া খুবই সহজ। একটি বাঁশের কোনচির মাথায় পরিমাণ মতো লাইলোন সুতো বাঁধা হয়। আর সুতোর মাথায় কালা বা বড়শি বাঁধা থাকে এবং পানির গভীরতা অনুযায়ী সুতোর মাঝে ময়ূরের পাখা বা সোলা দিয়ে ফাতা তৈরি করে বাঁধা থাকে।

www.pathagar.com

ব্যবহার : বড়শিতে আটা বা কেঁচো আটকিয়ে পানিতে ফেলা হয়। আর ফাতা ভাসতে থাকে। মাছ খেলে ফাতা নড়ে আর টান দিলে মাছ ধরা পড়ে।

ডিরই বা ডেহর

মৎস্য শিকারে যে সকল লোকপ্রযুক্তির ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে সবচেয়ে শিল্প সম্মত প্রযুক্তি হচ্ছে ডিরই।

তৈরি প্রক্রিয়া : তল্লা বাঁশকে চিকন চিকন করে কেটে খিল তৈরি করা হয়। এই খিল পরে লাইলোনের সুতো বা লতা দিয়ে খাচার মতো করে ডিরই তৈরি করা হয়। এর নিচের দিকে এমন দরজা থাকে যেদিক দিয়ে মাছ ঢুকতে পারে কিন্তু বের হতে পারে না।

ব্যবহার : এটি ড্রেন, চিকন নালা বা কম পানির বিলের মাঝেও পেতে রাখা হয় পানি যেদিক দিয়ে বয়ে যায় সেখানে। মাছ চলার পথে এতে বাঁধা প্রাপ্ত হয় এবং এক পর্যায়ে এর দরজা দিয়ে ঢুকে যায় কিন্তু বের হতে পারে না।

ফাট্টা

ঠাকুরগাঁও জেলার মৎস্য শিকারে লোকপ্রযুক্তির একটি সহজ এবং ব্যতিক্রমধর্মী প্রযুক্তি হচ্ছে ফাট্টা।

তৈরি প্রক্রিয়া : ফাট্টা তৈরি প্রক্রিয়া খুবই সহজ। একটি বাঁশের এক মাথাকে ফাটিয়ে চিকন চিকন খিলের মতো করা হয় আর অন্য মাথা অক্ষত রাখা হয়।

ব্যবহার : চিকন নালা বা ড্রেনের মুখে ফাটানো দিকটি ছড়িয়ে মুখটি বড়ো করে পেতে রাখা হয়। পানির সাথে চলা মাথা এই মুখ দিয়ে ঢুকে যায় এবং অন্য প্রান্তে যে প্রান্ত অক্ষত থাকে সেখানে আটকে যায়।

চাঁছ

চাঁছ দ্বারা কোনো মাছ ধরা না গেলেও এটি মৎস্য শিকারের লোকপ্রযুক্তির মধ্যে পড়ে।

তৈরি প্রক্রিয়া : বাঁশকে কেটে লম্বা এবং চিকন বাতা তৈরি করা হয়। তারপর লাইলন সুতো দিয়ে পাশাপাশি বেঁধে তৈরি করা হয়।

ব্যবহার : চাঁছ আসলে মাছকে আটকিয়ে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। পুকুর বা বিলের পানি যেদিক দিয়ে বের হয়ে যায় সেখানে এটি সোজা করে পেতে রাখা হয় যেন মাছ ভেসে যেতে না পারে।

খালই

বাংলাদেশে যেটি খলুই হিসেবে পরিচিত ঠাকুরগাঁও-এ সেটি খালই হিসেবে পরিচিত।

তৈরি প্রক্রিয়া : বাঁশকে চিকন চিকন করে কেটে ঝাকা তৈরি করার মতো করে বুনিয়ে খালই তৈরি করা হয়।

ব্যবহার : মাছ ধরার পর মাছ রাখার জন্য খালই ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

গ. মৃৎপাত্র নির্মাণে লোকপ্রযুক্তি

সৃষ্টির প্রথম দিকে মানুষ যে পাত্র তৈরি করেছিল তা মাটি দিয়েই তৈরি। মানুষ বর্বর যুগে যখন বৃষ্টির সময় মাটিতে হেটেছে তখন তাদের পায়ের চাপে মাটিতে গর্ত হয়েছে। সেই গর্ত পরে রোদ্রে শুকিয়ে তাতে পানি জমে থেকেছে। আর এখান থেকেই মানুষ পাত্র তৈরির চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই এখনো অনেক পালদের বাস রয়েছে। যারা পুরুষানুক্রমে এই মাটির পাত্র তৈরি করে চলেছে। ঠাকুরগাঁও জেলাতে পালদের বাস রয়েছে। নানা সংকটের মধ্য দিয়েও তাঁরা এই কাজকে ধরে রেখেছে। আজও তাঁরা ভালোবাসার টানে বংশীয় ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে মৃৎ পাত্র নির্মাণ করে চলেছে ।

তৈরি প্রক্রিয়া : মৃৎ পাত্র নির্মাণের জন্য সর্ব প্রথম যে জিনিসটি দরকার তা হচ্ছে মাটি। আর ঠাকুরগাঁও এর পালেরা এই কাজের জন্য যে মাটির ব্যবহার করে সেটিকে তাঁরা কুমার মাটি বলে ডাকে। প্রথমে তাঁরা বিল থেকে কুমার মাটি সংগ্রহ করে। মাটি সংগ্রহ করার পর তাঁরা সেই মাটিকে কোপ দিয়ে কুচি করে তার সাথে বালি ও পানি মিশিয়ে গাদা করে রেখে দেয়। দুই বা একদিন পরে সেই গাদাকে কোদাল দিয়ে খেচাখেচি করে। গাদার কাদা আঠালো না হওয়া পর্যন্ত এটিকে খেচাখেচি করা হয়। তারপর এটি আঠালো হয়ে গেলে এটি দিয়ে গিলি তৈরি করা হয়। গিলিটাকে পরে বালি মিশিয়ে বেলইতে বেলে রুটির মতো থড়ি তৈরি করা হয়। এই থড়ি দিয়ে তৈরি করা হবে টব, পোনা ইত্যাদি।

তবে হাড়ি বা কলস তৈরি করার জন্য গিলি তৈরি করার পরে আর বেলইতে দিয়ে থড়ি তৈরি করা হয় না। গিলিটাকে সরাসরি নিয়ে যাওয়া হয় চাকে। এই চাক ঘুরিয়ে হাতের নরম স্পর্শে তৈরি করা হয় হাড়ি। হাড়ি তৈরি হয়ে গেলে এটিকে রোদ্রে শুকানো হয়।

হাড়িটি যখন হালকা শুকিয়ে যায় তখন এটিকে চাড়ির উপরে রেখে পেটানো হয়। অতঃপর এটিকে আবার কড়া রোদ্রে শুকানো হয়। কড়া রোদ্রে শুকানোর পর এটিকে পনিতে পোড়ানো হয়। ঠাকুরগাঁও এর মানুষ পাত্র পোড়ানোর চুলাকে পনি বলে।

ব্যবহার : দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে এসব পাত্র ব্যবহার করা হয়।

ঘ. দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস তৈরিতে লোকপ্রযুক্তি

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন বিভিন্ন জিনিসের যেমন- ঝাকা, দড়ি, বসার টুল, খাবার তৈরির বিভিন্ন জিনিস ইত্যাদি। মানুষ তাদের নিজস্ব মেধাকে কাজে লাগিয়ে লোকপ্রযুক্তির মাধ্যমে এসব প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করে। নিচে ঠাকুরগাঁও এর এমন কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো-

ছাম

আমরা যাকে হামান দিস্তা বলে জানি ঠাকুরগাঁও-এ তাকেই ছাম বলা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

তৈরি প্রক্রিয়া : এটি তৈরি করতে প্রয়োজন হয় কাঠের। একটি মোটা কাঠ বা গাছকে প্রথমে একটু লম্বা করে কাটা হয় তারপর এর উপরে দিক থেকে এর মাঝ পর্যন্ত খোদাই করে গর্ত করা হয়। তার সাথে একটি হাতল থাকে।

ব্যবহার : শক্ত কোনো জিনিসকে গুড়ো করতে এটি ব্যবহার করা হয়। তবে ঠাকুরগাঁওয়ের লোকেরা মূলত মসলা করার জন্য এটি ব্যবহার করে।

মুড়ি ঝাড়া

গ্রামের মানুষের অন্যতম একটি খাবার হচ্ছে মুড়ি। অবসর সময়ে এমনকি অতিথি আপ্যায়নেও তাঁরা এই খাবার ব্যবহার করে থাকে। খাবার চাল মাটির পাত্রে বালু দিয়ে ভেজে এই মুড়ি তৈরি করা হয়।

তৈরি প্রক্রিয়া : বাঁশকে কেটে চিকন চিকন করে খিল তৈরি করা হয়। পরে এই খিল এবং চটার সাহায্যে তৈরি করা হয় মুড়ি ঝাড়া।

ব্যবহার : সাধারণত বালি দিয়ে মুড়ি ভাজা হয়ে গেলে বালি থেকে ঝেড়ে মুড়ি আলাদা করার কাজে এটি ব্যবহার করা হয়।

ঢেরা ও গুটুল

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একটি প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে দড়ি। পশু/পালন থেকে শুরু করে গৃহ নির্মাণ পর্যন্ত এই জিনিসটি কাজে আসে। আর এই দড়ি তৈরি করতে ঠাকুরগাঁওয়ের মানুষ ব্যবহার করে ঢেরা এবং গুটুল।

তৈরি প্রক্রিয়া : ঢেরা তৈরি করতে লম্বা দুটি বাঁশের চটার টুকরা বা কাঠের পাতলা লম্বা দুটি ছোটো টুকরা এবং আধা হাত পরিমাণ লোহার মোটা তার প্রয়োজন। কাঠ বা বাঁশের টুকরা দুটিকে ক্রশ চিহ্ন এর মতো করে আটকানো হয় এবং এর মাঝখানটা ছিদ্র করে লোহার গুণা বা তার খাড়াভাবে বসানো থাকে। আর গুটুল হচ্ছে একটি কাঠ বা বাঁশের টুকরা এতে পাট গোল করে জড়ানো থাকে বলে একে গুটুল বলে।

ব্যবহার : এটি দড়ি তৈরিতে ব্যবহার হয়। গুটুল সুতোর মাথাটি ঢেরার খাড়া তারটির সাথে জড়ানো থাকে আর Star fish এর মতো ঢেরাটি ঘুরাতে হয় এতে পাটে পেঁচ খেয়ে দড়ি তৈরি হতে থাকে।

কাগজের দন

মানুষ তাদের সাংসারিক জীবনে অনেক কিছুই ব্যবহার করে, তার মধ্যে কাগজের দন একটি। এটি দেখতে ছোটো ঝাকা বা বাটির মতো।

তৈরি প্রক্রিয়া : এটি তৈরি করতে প্রয়োজন হয় কাগজ এবং ভাতের মাড়। কাগজকে প্রথমে ভিজিয়ে রাখা হয় তারপর এটিকে মণ্ড তৈরি করা হয়। কাগজের মণ্ড তৈরি হয়ে গেলে এটিকে ভাতের মাড়ের সাথে মিশিয়ে ছানা হয়। তারপর এটিকে বাটির মতো আকৃতি দান করা হয়।

ব্যবহার : সাধারণত শুকনা খাবার রাখতে ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

হোকল পাতার পাটি

মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে পাটি। পাটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জিনিস দিয়ে তৈরি হয়। যেমন– খেজুর পাতা দিয়ে, মাইলে পাতা দিয়ে, হোগলা পাতা দিয়ে ইত্যাদি। দক্ষিণবঙ্গে যে পাতাটিকে হোগলা পাতা বলা হয়ে থাকে উত্তরবঙ্গে সেটিকে হোকল নামে পরিচিত। তবে দক্ষিণবঙ্গে এই পাতা দিয়ে পাটি তৈরি করা হয় না বরং এটি বেড়া তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়।

তৈরি প্রক্রিয়া : এটি তৈরি করা হয় সাধারণত হোকল পাতা এবং চিকন দড়ি দিয়ে। পাতাগুলোকে লম্বালম্বিভাবে সাজিয়ে একটি কাঠের তৈরি যন্ত্রের সাহায্যে পাটি বোনা হয়। যন্ত্রটির দ্বারা পাতাগুলোকে চেপে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করা হয় এবং দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়।

ব্যবহার : বসা এবং সোয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়।

ঙ. অস্ত্র তৈরিতে লোকপ্রযুক্তি

মানুষ প্রথম পর্যায়ে যখন বনে-জঙ্গলে বসবাস করতো তখন থেকেই তাঁরা অস্ত্র ব্যবহার করে আসছে। প্রথম দিকে তাঁরা পাথরের অস্ত্র বানিয়ে ব্যবহার করতো। কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে যখন থেকে লোহার ব্যবহার শুরু হয় তখন থেকেই মানুষ লোহার তৈরি বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহার করে আসছে। আধুনিক যুগে অত্যাধুনিক সব অস্ত্রের ব্যবহার থাকলেও মানুষ নিজের প্রয়োজনে নিজেরই মেধা দিয়ে তৈরি করেছে বিভিন্ন অস্ত্র। আর এই কাজ করতে গিয়ে তাঁরা ব্যবহার করেছে নিজস্ব প্রযুক্তির। ঠাকুরগাঁও জেলার লোকেরাও এর ব্যবহার থেকে বিরত থাকেনি।

ভাতি নেহাই সেট

অস্ত্র তৈরির প্রধান কাচামাল হচ্ছে লোহা। কারণ আমাদের দেশে যেসব অস্ত্রের ব্যবহার আজও রয়েছে তার প্রায় সবগুলোতেই লোহার ব্যবহার রয়েছে। আর এই লোহাকে অস্ত্র তৈরির উপযোগী করার জন্য একে আগুনে গলিয়ে অস্ত্রের আকৃতি দিতে হয়। আর এই লোহা গলানোর কাজে ব্যবহার করা হয় ভাতি নেহাই সেট।

তৈরি প্রক্রিয়া : এটি তৈরির জন্য প্রথমে বাজার থেকে রাবারের তৈরি ভাতি কিনে আনতে হয়। এরপর ভাতির দুই পাশে দুটি খুঁটি পুতে তার উপরে একটি বাঁশের হাতল রাখা হয়। যার এক প্রান্তে দড়ির সাথে ভাতির মাথা বাঁধা থাকে। আর এক প্রান্তে দড়ি বাঁধা থাকে সেটি দিয়ে টানতে হয়। এটি ধরে টানলে ভাতি ফুলে উঠে এবং এর মুখে থাকা আগুনে বাতাস দেবার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়। এতে আগুন জোরে জ্বলতে থাকে আর লোহা লাল হয়ে গলতে থাকে।

ব্যবহার : বিভিন্ন অস্ত্র তৈরিতে কামারেরা এই ভাতি নেহাই সেট ব্যবহার করে।

শান মেশিন

মানুষ যে অস্ত্র ব্যবহার করে সেই অস্ত্রে এক সময় ধার নষ্ট হয়ে ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে যায়। তখন আবার এটিকে ধার করতে হয়। এভাবে ধার দেওয়ার জন্য ঠাকুরগাঁও এর লোকেরা এই প্রযুক্তির ব্যবহার করে।

www.pathagar.com

তৈরি প্রক্রিয়া : একটি গোল কাঠের এক প্রান্তে পাথরের গোল একটি চাক্তি লাগানো থাকে। আর এই লম্বা গোল কাঠটি খুটি দিয়ে মাটি থেকে সামান্য উঁচু করা থাকে। পাথরে চাক্তির অপর প্রান্তে দড়ির প্যাঁচ দেয়া থাকে। একজন ব্যক্তি এই দড়ি ধরে টান দিতে থাকে আর প্যাঁচ থাকার কারণে এটি ঘুরতে থাকে। তখন অপর প্রান্তে আরেকজন পাথরের চাক্তিটিতে অস্ত্র ঠেকিয়ে ধার তুলতে থাকে।

ব্যবহার : সাধারণত ক্ষুর, কেচি, চাকু ইত্যাদি হালকা ওজনের অস্ত্র ধার দিতে ব্যবহার করা হয়।

চ. যানবাহনে লোকপ্রযুক্তি

মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবার জন্য বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু যারা গ্রামে বসবাস করে, যেসব এলাকায় আধুনিক রাস্তাঘাট নেই সেসব এলাকার মানুষেরা তাদের প্রয়োজনে নিজেরাই তৈরি করেছে বিভিন্ন যানবাহনের। যার সাহায্যে তাঁরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করছে।

গরুর গাড়ি

বাংলাদেশের অতি পরিচিত একটি প্রাণী হচ্ছে গরু। গরুকে দিয়ে যেমন করানো হয়েছে কৃষিকাজ তেমন এই গরুকে দিয়েও আবার টানানো হয়েছে গাড়ি। যেটি গরুর গাড়ি হিসেবেই পরিচিত। ঠাকুরগাঁও এর মতো বাংলাদেশের প্রায় সকল গ্রামের মানুষেরাই এই গরুর গাড়ির ব্যবহার করে। তবে বর্তমানে আর নেই বললেই চলে।

তৈরি প্রক্রিয়া : গরুর গাড়ি তৈরি করতে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বাবলা কাঠ ও বাঁশ। গরুর গাড়িতে দুটি চাকা থাকে। চাকা দুটি বাবলা বা শাল কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়। চাকার গোল অংশটি কয়েক খণ্ড কাঠ জোড়া দিয়ে তৈরি করা হয়। আর মাঝখানে প্রায় ১২ থেকে ১৪ টি কাঠ খাড়াভাবে দেয়া থাকে। আর চাকার বাইরে অংশে লোহার বেল্ট পরানো থাকে। একটি মোটা লোহার দুই মাথায় চাকা দুটি লাগানো থাকে। আর এই লোহার সাথে চাকার ভেতরে দুটি মোটা কাঠ থাকে যার উপরে বাঁশের তৈরি বডি বসানো থাকে। এই বাঁশের তৈরি বডির মাথায় জোয়াল লাগানো থাকে। জোয়ালের সাথে গরুকে বেঁধে দেয়া হয়। গরু হাটলে গাড়িও চলতে থাকে।

ব্যবহার : পূর্বে এটি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবার কাজে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সব স্থানে আধুনিক যানবাহনের প্রবেশের কারণে এটি এখন শুধু মালামাল বা ফসল টানার কাজে ব্যবহার করা হয়।

নৌকা

নদীমাতৃক দেশ হবার কারণে বাংলাদেশের একটি গরুত্বপূর্ণ বাহন হচ্ছে নৌকা। এক স্থান থেকে আরেক স্থান, বিভিন্ন দ্রব্য আনা-নেয়া এমনকি বিবাহের মতো কাজেও এই নৌকা ব্যবহার করা হতো। কিন্তু বর্তমানে নদী শুকিয়ে যাবার কারণে এর ব্যবহার অনেকটাই কমে গেছে বললেই চলে। আর ঠাকুরগাঁওয়ে বড়ো নদী না থাকার কারণে এখানে নৌকার ব্যবহার অনেকটাই কম।

www.pathagar.com

তৈরি প্রক্রিয়া : নৌকা তৈরির প্রথম কাজ হচ্ছে এর মাপ নির্ধারণ করা। কারণ যে মাপে তৈরি করা হবে সেই মাপেই কাঠ কেটে শুকাতে হবে। সাধারণত নৌকা তৈরিতে শাল কাঠ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নৌকা তৈরি করার জন্য প্রথমে মোটা কাঠ দিয়ে ফ্রেম তৈরি করা হয়। এরপর এই ফ্রেমের সাথে পাতলা কাঠের তক্তাগুলো পেরেক দিয়ে মারা হয়। নৌকা দেখতে অনেকটা পটলের মতো। আর কাঠ দিয়ে নৌকা তৈরি হয়ে গেলে এর মাঝখানে বাঁশের মাচা তৈরি করে রাখা হয় বসার জন্য।

ব্যবহার : নৌকা সাধারণত মাছ ধরা বা বিভিন্ন জিনিস আনা নেয়ার কাজে এবং কোথাও কোথাও যানবাহন হিসেবেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ছ. বস্ত্র বুননে লোকপ্রযুক্তি

সৃষ্টির প্রথম দিকে মানুষ উলঙ্গ অবস্থাতে থাকলেও পরবর্তিতে তাঁরা আস্তে আস্তে তা থেকে বেরিয়ে এসেছে। প্রথমে তাঁরা গাছের ছাল, পশুর চামড়া, বড়ো পাতা ইত্যাদি দিয়ে লজ্জা নিবারণ করলেও পরে তাঁরা কাপড়ের ব্যবহার শুরু করেছে। আর পোশাক তৈরির এই কাপড় তাঁরা নিজেরাই তৈরি করেছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে এক্ষেত্রেও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হবার কারণে সেই প্রযুক্তিও আজ হারিয়ে গেছে। তবে ঠাকুরগাঁওয়ের লোকেরা পোশাক তৈরি না করলেও একই পদ্ধতিতে তাঁরা পাপোষ তৈরি করে থাকে। নিচে তা আলোচনা করা হলো-

খেঁটি

যন্ত্রচালিত কাপড়ের কল আসার আগে মানুষ তাঁত যন্ত্র দিয়ে তাদের কাপড় তৈরি করতো। বর্তমানে এর ব্যবহার অনেকটা হ্রাস পেলেও ঠাকুরগাঁওয়ে এই একই পদ্ধতিতে পাপোষ তৈরি করা হয়ে থাকে।

তৈরি প্রক্রিয়া : প্রথমে রোলার মেশিনের সাহায্যে পাপোষ তৈরির সুতো তৈরি করে নেয়া হয়। এই সুতো দিয়ে খেটির সাহায্যে পাপোষ তৈরি করা হয়। খেঁটি মূলত ৫ থেকে ৬ ফুট লম্বা হয়ে থাকে আর প্রস্থে প্রায় ৩ ফুটের মতো। কাঠ, বাঁশ, দড়ি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয় এই খেটি। এর তৈরি প্রক্রিয়াও অনেকটা তাতের মতো।

ব্যবহার : এটি শুধুমাত্র পা মোছার কাজে ব্যবহার করা হয়।

রোলার মেসিন

সুতো রোল করার জন্য এই রোলার মেশিনের প্রয়োজন। আর সুতো হচ্ছে বস্ত্র তৈরির প্রধান উপকরণ তাই এর প্রক্রিয়াজাতকরণ জরুরি। এটি আসলে চরকার কাজ করে।

তৈরি প্রক্রিয়া : প্রায় সম্পূর্ণটি কাঠের তৈরি। এতে কাঠের তৈরি বড়ো এক চাকা থাকে তাকে রোলার বলে। আর এর সামনে কিছু দূর সুতোর টোটা রাখা হয়। এই চাকা ঘুরালে সুতো এসে এতে পেঁচাতে থাকে। এভাবেই সুতোকে পাপোষ তৈরির জন্য প্রস্তুত করা হয়।

ব্যবহার : তাঁতের চরকার যে কাজ মূলত খেটির রোলারেও সেই কাজ। অর্থাৎ সুতো প্রক্রিয়াজতকরণ।

www.pathagar.com

জ. সরিষা ভাঙার গাছ

কৃষি, মৎস্য, পাত্র নির্মাণ, বস্ত্র বুনন ইত্যাদি ছাড়াও ঠাকুরগাঁওয়ে আরো একটি প্রযুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। নিচে তা উল্লেখ করা হলো-

গাছ

গাছ বলতে সাধারণত আমরা বৃক্ষকেই বুঝে থাকি। কিন্তু ঠাকুরগাঁওয়ে যে লোকপ্রযুক্তি বিলুপ্ত প্রায় একটি প্রযুক্তিকে গাছ বলে ডাকা হয় এটি শুনলে একটু অবাক হবারই কথা। কিন্তু এটি আসলেই সত্য। ঠাকুরগাঁওয়ে গাছ বলতে ঘানিকে বোঝানো হয়ে থাকে। এটি এখানেও অনেকে ঘানি বলেই জানেন কিন্তু ঘানিটি আসলে একটি গাছের খণ্ড দিয়ে তৈরি বলে এখানকার স্থানীয় লোকেরা একে গাছ বলেই ডাকে। আর এর থেকে তৈরি তেলকে গাছে ভাঙ্গা তেল বলে।

তৈরি প্রক্রিয়া

আট বা নয় ফুট লম্বা এবং প্রায় চার-পাঁচ ফুট ব্যাসের কড়াই বা বেল গাছের গুড়ি দিয়ে ঘানির মুল কাঠামো তৈরি করা হয়। এটি মাটিতে পোতা থাকে এবং এর উপরের দিকে খোদাই করা থাকে। এই খোদাই করা গর্তেই রাখা হয় সরিষা, তিষি ইত্যাদি। আর এর মধ্যে রাখা হয় মুগুর। এই মুগুরের সাথে একটি গোলাকার রিং থাকে। এই রিং এর সাথে দড়ি দিয়ে একটি মোটা তক্তা বাঁধা থাকে। এই তক্তার উপরে ভারি পাথর বা ইট রাখা হয়। এই তক্তা গাছের সাথে ঠেকানো থাকে। আর জোয়াল দিয়ে এর সাথে গরু জুড়ে দেয়া হয়। গরু ঘুরতে থাকে এর সাথে মুগুরও ঘুরতে থাকে। আর মুগুরের চাপে সরিষা বা তিষি থেকে তেল বের হয়ে থাকে।

ব্যবহার : এটি মূলত সরিষার তেল তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়।

প্রধান সমন্বয়কারী, সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহক (বাম দিক থেকে)

www.pathagar.com

www.pathagar.com